পিলখানায় হত্যাকাণ্ড

টার্গেট বাংলাদেশ

মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন

আমেরিকায় গিয়েও তিনি সাংবাদিকতা ও শিক্ষকতার পেশায় যোগ দেন। তিনি নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত দ্বি-ভাষিক মাসিক সাময়িকী (বাংলা-ইংরেজি) 'আমেরিকায় মদিনার আলো'– 'লাইট অব দ্য আর্থ ইউএসএ;'-র সহকারী সম্পাদক এবং সাপ্তাহিক 'বাংলা পত্রিকা'র বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছেন। তিনি নিউইয়র্ক সিটি বোর্ড অব এডুকেশন-এর অনিয়মিত শিক্ষক।

আবেদীনের প্রতিটি রচনাই তার স্পষ্টভাষিতা, দুঃসাহসিকতা, যুক্তিনির্ভরতা, সর্বোপরি দালিলিক তথ্য-প্রমাণে সমৃদ্ধ। বাংলাদেশের খুব কম সংখ্যক সাংবাদিকই দেশের জন্য এমন অনন্য কাজ করেছেন। তার রচিত গবেষণাধর্মী গ্রন্থগুলো পাঠান্তে যেকোন পাঠকই বলবেন, দেশ ও জাতির জন্য তিনি অসাধারণ অবদান ইতোমধ্যেই রেখেছেন। মৃত্যুভয় কিংবা বিভিন্ন ধরনের লোভাতুর প্রস্তাব তাকে তার পথ থেকে নড়াতে পারেনি। তার প্রকাশিত 'রাজনীতিতে শ্রেণী সংকট' (১৯৭২), 'জিয়া হত্যার নেপথ্য' (১৯৮৭), 'India Needs Veto Power' (1993), "RAW and Bangladesh' (1995), "পার্বত্য চট্টগ্রাম স্বরূপ সন্ধান", (১৯৯৭) "The Chittagong Hill Tracts: A Victim of Indian Intervention" (2003), "Human Ritghts Violation in CHT" Myth & Reality" (2005), "NAGA- A Cry for Freedom" (2007), "BDR Massacre: Target Bangladesh" (2009) প্রভৃতি কালজয়ী গবেষণাধর্মী গ্রন্থ বাংলাদেশের জন্য অনন্য সম্পদ, যেগুলো যুগ যুগ ধরে দেশী-বিদেশী সাংবাদিক, লেখক-গবেষকদের অনুপ্রেরণা ও তথ্য যোগাবে। তার অনন্য কর্মের স্বীকৃতি হিসেবে ২০০৭ সনে লন্ডন-ভিত্তিক গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান "London Institute of South Asia (LISA)" তাকে আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত করে। বিভিন্ন কারণে তার রচিত 'এক নদী রক্ত', 'একটি নক্ষত্রের পতন', Indian Friendship : An Unbearable Burden সহ বেশ ক'টি গ্রন্থ এখনো মুদ্রণের মুখ দেখেনি। আবেদীন ১৯৬৪ সনে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সাবেক নোয়াখালী, চট্টগ্রামের উত্তরাঞ্চল এবং কুমিল্লা দক্ষিণাংশে ছয় দফা ও ১১-দফা আন্দোলন জোরদারকরণে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। এ কারণে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইন (ডিপিআর) ও সামরিক আইনে যথাক্রমে ১৯৬৮ ও ১৯৬৯ সনে তাকে দীর্ঘদিন আটক রাখা হয়। তিনি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ নোয়াখালী জেলা শাখার সাংস্কৃতিক সম্পাদক (১৯৬৭), নোয়াখালী কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক (১৯৬৮), নোয়াখালী জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক (১৯৬৯) এবং নোয়াখালী জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক (১৯৭২-জাসদপন্থী) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। জাসদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড এবং এর মূল শেকড় কোথায় তা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়ে ১৯৭৩ সনে তিনি রাজনীতি হতে সরে দাঁড়ান। তিনি ১৯৭০ সনে নোয়াখালী সরকারি কলেজ ছাত্র সংসদের নির্বাচিত সভাপতি হিসেবে তিন বছর (১৯৭০-৭২) সততা ও সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

বিবিধ বিষয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী যুক্তি-নির্ভর ও বক্তা হিসেবে আবেদীন নোয়াখালী সরকারি কলেজ বার্ষিক সাহিত্য ও বিতর্ক প্রতিযোগিতায় দুই দুইবার (১৯৬৯-১৯৭২) চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব অর্জন করেন।

www.pathagar.com

পিলখানায় হত্যাকাণ্ড : টার্গেট বাংলাদেশ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পিলখানায় হত্যাকাণ্ড

টার্গেট বাংলাদেশ

মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন

ইস্টার্ন পাবলিকেশন

www.pathagar.com

পিলখানায় হত্যাকাণ্ড : টার্গেট বাংলাদেশ
মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন
প্রকাশক
ইস্টার্ন পাবলিকেশন
১৬ সিলভেষ্টার হাউজ
লন্ডন, ই ওয়ান ২ জেড; ইউ.কে
ই-মেইল:u_goas@yahoo.com

ঢাকাস্থ পরিবেশক
বাঁধন প্রকাশন
৩৮ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

বাংলা প্রথম মুদ্রণ
১৬ ডিসেম্বর ২০০৯

প্রচ্ছদ
আক্কাস খান

কম্পিউটার লিখন
তাজাম্মল আহমেদ

মূল্য : ৩৫০ টাকা US. $ 10

সর্বস্বত্ব গ্রন্থকারের। লেখকের লিখিত পূর্বানুমতি ব্যতিত এ গ্রন্থের মুদ্রণ, বিক্রয়, বাজারজাতকরণ সম্পূর্ণ অনৈতিক ও আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ বিশেষ।

www.pathagar.com

উ ৎ স র্গ

স্বদেশ রক্ষা আন্দোলনের সহযোগী সৈনিক
অকুতোভ কবি-সাংবাদিক ভ্রাতৃপ্রতীম
আব্দুল হাই শিকদার'কে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আমার কথা

বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য যে দেশটি একটি আগ্রাসী অপশক্তির একান্ত প্রতিবেশী, যা বারবার বাংলাদেশের ওপর সুনামীর মতো ভয়াবহ তান্ডব বইয়ে দিচ্ছে। ৭১'এ ১৬ ডিসেম্বরের পরপরই বাংলাদেশ বিশ্ব ইতিহাসে নজির-বিহীন ভারতীয় লুণ্ঠনের শিকার হয়। শেখ মুজিবের অনুসারীদের পরস্পর-বিরোধী শিবিরে বিভক্তিকরণ, বাংলাদেশী কাগুজে মুদ্রা জালকরণ, কল-কারখানার গুদামে অগ্নিসংযোজন, মুজিব-বিরোধী রাজনৈতিক দল ও সশস্ত্র শ্রেণী সংগ্রামের উত্থান, ১৫ আগষ্ট (১৯৭৫) শেখ মুজিবরের দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যু, ৩ নভেম্বরের খালেদ মোশাররফের পাল্টা-অভ্যুত্থান, ৩০ মে (১৯৮১) প্রেসিডেন্ট জিয়াকে হত্যা, শিক্ষাঙ্গনে ও শিল্পাঙ্গনে অস্থিরতা, ধর্মঘট, পরীক্ষা বর্জন, সেশনজট, সড়ক অবরোধ, গুপ্ত হত্যা, রাজনৈতিক হানাহানি, হরতাল, ধর্মঘট, এমনকি ১/১১ তে জারীকৃত জরুরী অবস্থা এবং তৎপরবর্তীকালে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ ব্যবসায়ী, আমলা, শিক্ষক, সাংবাদিক নির্যাতন, কথিত ইসলামী জঙ্গীবাদের উত্থান, ২৮ ডিসেম্বর (২০০৮) এর বিতর্কিত নির্বাচন, ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারী (২০০৯) পিলখানায় বিডিআর সদর দফতরে সেনা কর্মকর্তা নিধন, সীমান্তে প্রতিনিয়ত নিরীহ বাংলাদেশীদের হত্যাসহ পার্বত্য চট্রগ্রামকে বাংলাদেশ হতে বিচ্ছিন্ন করার জন্য চাকমা সন্ত্রাসীদের সার্বিক সহযোগিতা প্রদান ভারত নামক এই প্রতিবেশী দেশটির বাংলাদেশ-বিরোধী হাজারো কার্যক্রমের কিছু দৃষ্টান্ত। এসব কিছুকে ছাড়িয়ে পিলখানায় হৃদয়-বিদারক ঘটনা আমাদেরকে কাঁদিয়েছে। দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তথা অস্তিত্বকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে। উদ্দেশ্য একটাই বাংলাদেশকে নানাভাবে বিব্রত করে এর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, সামাজিক সুস্থিরতা এবং সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যকে বাধাগ্রস্থ ও বিলীন করে পর্যায়ক্রমে এদেশকে অকেজো ব্যর্থ রাষ্ট্র হিসাবে চিহ্নিত করে বিশ্ব মানচিত্র হতে এর অস্তিত্ব বিলুপ্ত করা। একটি দীর্ঘমেয়াদী গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে দেয়ার উদ্ধেশ্যেই এই জঘন্যতম হত্যাকান্ড সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় নীল-নকশা ও প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় সংঘটিত হয়েছে। পিলখানায় দেশ-বিরোধী এই হত্যাকান্ড আমার হৃদয় ও জাত্যাভিমানে চরম আঘাত হানে। তাই এর নেপথ্য শক্তি ও তার স্বদেশী-বিদেশী তাবেদার শ্রেণীকে চিহ্নিত করে এর মুখোশ উন্মোচনার্থে, সর্বোপরি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে সমুদয় বিষয় তুলে ধরার উদ্দেশ্যে 'BDR Massacre :

www.pathagar.com

Target Bangladesh' শীর্ষক গ্রন্থের আবির্ভাব ঘটে। আমি আমার সব চেতনাবোধ, খেদ, ক্ষোভ, সর্বোপরি স্বদেশপ্রেমকে এ গ্রন্থে ঢেলে দিয়েছি। এর মাধ্যমে আমি আমাদের প্রতিপক্ষ, সর্বোপরি, আমার জন্মভূমির জনগণ ও তাদের প্রতিনিধিদের কাছে সুস্পষ্ট বার্তা পৌঁছিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছি। আমার সে ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা, নানা বিচ্যুতি সত্ত্বেও, অনেক বিদগ্ধ জনের কাছে কালজয়ী গ্রন্থ হিসাবে সমাদৃত হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ।

পিলখানা হত্যাকান্ডের প্রাথমিক টার্গেট ছিল সেনাবাহিনী। সেনাবাহিনী নেই তো বাংলাদেশ নেই। ১৯৭২ সন হতে বাংলাদেশকে পেশাদার নিয়মিত সেনাবাহিনীহীন রাখার চক্রান্ত ব্যর্থ হবার পর থেকেই ভারত বাংলাদেশ সেনাবাহিনী-বিরোধী আবহ সৃষ্টিতে তৎপর ছিল। সেনাবাহিনী-বিরোধী জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ভারতমুখী বুদ্ধিজীবী-রাজনীতিকরা নানা ধরনের অপযুক্তি ও কুৎসা রটিয়ে সেনাবাহিনীকে অপ্রয়োজনীয় ব্যয়বহুল সংস্থা হিসেবে তুলে ধরে। অতি সামান্য প্রতিরক্ষা বাজেট বাতিল করে প্রতিরক্ষা বাহিনী তুলে দেয়ার জন্য বহুমূখী প্রচারণা ও চক্রান্ত সে ১৯৭২ সন থেকেই ভারতীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সক্রিয় রয়েছে। বারবার অভ্যুত্থান, পাল্টা-অভ্যুত্থানে সশস্ত্র বাহিনীর বহু সংখ্যক সদস্য ও কর্মকর্তা প্রাণ হারায়। উল্লেখ্য, এসব অভ্যুত্থানের নেপথ্য পৃষ্ঠপোষক ছিল ভারত। এতদসত্ত্বেও বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী জনশক্তিতে, অস্ত্রবলে, প্রশিক্ষণে, সর্বোপরি স্বদেশপ্রেম ও শৃঙ্খলায় ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করে। পার্বত্য চট্টগ্রামে ভারতের লেলিয়ে দেয়া বিচ্ছিন্নতাবাদী চাকমা সন্ত্রাসীদের প্রতিহতকরণে, সর্বোপরি, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী হিসেবে বিশ্বের বিবাদমান জনপদে শান্তি প্রতিষ্ঠায় শ্রেষ্ঠত্বের উদাহরণ স্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্য অনন্য সুনাম এবং প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সক্ষম হওয়ায়, সর্বোপরি আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, তথা বাংলাদেশের, মান-মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারত যুগপৎভাবে উদ্বিগ্ন ও ঈর্ষান্বিত। সেনাবাহিনীকে বিতর্কিত, সর্বোপরি, সেনাবাহিনী ও জনগণকে মুখোমুখি পরস্পরবিরোধী শিবিরে বিভক্ত করে দেশে অস্থিতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টির পরিকল্পনা বহু দিনের। সে পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সেনাবাহিনীর সমর্থিত জরুরী অবস্থার মুখে দেশকে ঠেলে দেয়া হয়। দীর্ঘ দুই বছরে সেনাবাহিনীর ভেতরে সৃষ্ট 'র' 'চর'দের মাধ্যমে বিভিন্নমুখী দেশ ও জনবিরোধী কর্মকান্ডের প্রতিষ্ঠান হিসেবে সেনাবাহিনী বিতর্কিত হয়ে পড়ায় এর জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। সাধারণ মানুষ

www.pathagar.com

বুঝতেই পারেনি সরকার ও সেনাবাহিনী ভারতীয় "চর"দের স্বার্থের গুটি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। দেশ ও সেনাবাহিনীকেই সমূলে ধ্বংস করার পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই জরুরী অবস্থা এসেছে, জরুরী অবস্থাকালীন বাড়াবাড়ি তথা নিবর্তনমূলক কর্মকান্ড চলছে।

নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় আসার পরেও সেনাবাহিনী-বিরোধী চক্রান্ত বন্ধ হয়নি। পিলখানা সেনা কর্মকর্তা নিধন সে চক্রান্তের ধারাবাহিকতা বিশেষ। দুঃখজনক ব্যাপার হলো সেনাবাহিনীতে এমন শূন্যতা সৃষ্টির পরও সেনাবাহিনীকে নিয়ে সরকার যা করছেন তাতে দেশের অস্তিত্বই হুমকির মুখে। ভারত ১৯৭১ সনের আগ থেকেই বাংলাদেশে সেনাবাহিনী না রাখার পরিকল্পনা নিয়ে বসে আছে। কারণ ভারত আমাদেরকে সিকিম ভুটানের পর্যায়ে রাখতে চায়। একটি অন্ধ অনুগত সরকার চায়, পতাকা-সর্বস্ব উন্মুক্ত সীমান্ত-বিশিষ্ট দেশ চায়, যা ভারতের উপগ্রহ হিসেবে ভারতকে কেন্দ্র করে ভারতের নির্দেশেই ঘুরবে। ভারত এদেশে তার সেনাবাহিনী চিরদিরে জন্য মোতায়েন করতে চায়। এদেশের জনগনের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য তথা জাতিসত্তা মুছে দিতে চায়। এদেশের মানুষ দেশে-বিদেশে খাটবে আর দেশ চলবে ভারতের নির্দেশে। দেশে মন্ত্রী পরিষদ থাকবে, সংসদ থাকবে, আমলা বাহিনী থাকবে, সেনাবাহিনী থাকবে। তাদের ব্যয়ভার জাতি বহন করবে। আর তারা ভারতের স্বার্থে ভারতের নির্দেশেই চলবে। ভারতই এদের মাধ্যমে আমাদের শিক্ষানীতি, পররাষ্ট্রনীতি, প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করবে ভারতীয় স্বার্থের নিরিখে। বাংলাদেশের স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা যারা চায় তারা ভারতের প্রতিপক্ষ। তাদেরকে বিভিন্ন কায়দায় ও অজুহাতে সন্ত্রাসী, দেশবিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করে নির্মূল করা হবে। তেমন আলামত যেন ধীরে ধীরে প্রকাশ্য রূপ নিচ্ছে। এদেশে এমন শ্রেণী গড়ে তোলা হচ্ছে, যারা ক্ষমতাপ্রাপ্তি এবং ক্ষমতায় টিকে থাকার চাবি-কাঠি হিসেবে এদেশের মানুষের ওপর নয়, ভারতের কৃপা ও ইচ্ছার ওপর নির্ভর করবে। ভারত যাকে চাইবে সে-ই ক্ষমতায় আসবে, ক্ষমতায় থাকবে। জনগণ যাকেই ভোট দিক না কেন, চূড়ান্ত ফলাফলে ভারতের প্রিয়ভাজনরাই ক্ষমতা পাবে। রাজনীতিক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, সংস্কৃতিসেবী হিসেবে খ্যাতি, সাফল্য অর্জন, জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্তিতে এখন নাকি ভারতের অনুমোদন লাগে। সেলিম সামাদ, শাহরিয়ার কবির, তসলিমা, বারাকাত, নিমচন্দ্র ভৌমিক, গফ্ফার চৌধুরী, রামেন্দু মজুমদার, মুনতাসির মামুনদের মতো অনেকেরই খ্যাতির তুঙ্গে যাবার যোগানদার নাকি ভারত।

www.pathagar.com

আর যারা অতটা নিচে নামতে পারেননি, কিন্তু খ্যাতি ও সাফল্যের কাছে-কিনারে রয়েছেন, তাদেরকে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে ভারত চটে যায় তেমন কর্মকান্ড হতে বিরত থাকতে হচ্ছে। তথাকথিত জাতীয়তাবাদী শিবিরের অনেকেই একই ভূমিকায় থাকছে। এদের অনুকরণে নতুনরাও সে মিছিলে যোগ দিচ্ছে। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এত মাতামাতি, কারণে-অকারণে মূল বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যবিহীন হলেও নাটকে রবীন্দ্রপ্রীতি, ধুতি ও হিন্দু চরিত্রের "অতি" ব্যবহার, মঙ্গল প্রদীপ চর্চা, মুসলিম শব্দাবলী ও সংস্কৃতির ক্রমান্বয় বিদায় প্রভৃতি ভারতপ্রেমের পরিচয় এবং এসব নাটুকে এবং নট-নটিরা কেবল ভারতের আশীর্বাদ প্রাপ্তির বিনিময়ে এবং প্রত্যাশায় নিজস্ব সংস্কৃতি চর্চা ভুলে যাচ্ছে। এরা বাঙালী সংস্কৃতির নামে হিন্দু সংস্কৃতি প্রচার ও প্রসারে নিয়োজিত ।

উল্লেখ্য যে, বাংলাভাষী হিন্দুরা কখনই মুসলমানদেরকে বাঙালী হিসেবে স্বীকার করেনি। তারা সব সময় মুসলিম স্বার্থ ও অস্তিত্বের বিরুদ্ধে লিপ্ত ছিল। মুসলিম স্বার্থকে ঘায়েল করার জন্য হিন্দুরা ব্রিটিশদের স্বার্থবাহীর ভূমিকায় নামে।

ব্রিটিশ সরকার ভারতের ব্রিটিশ স্বার্থবাহী হিসেবেই ১৮৮৫ সনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করে। গান্ধী থেকে শুরু করে কংগ্রেসী হিন্দু নেতারা হয়তো কখনই ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে মাঠে নামতো না, যদি ১৯০৬ সনে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত না হতো। আর মুসলিম লীগই কংগ্রেসকে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে নামতে বাধ্য করে। উপমহাদেশ হয়তো কখনই স্বাধীন হতো না এবং কংগ্রেস কখনই স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনে নামতো না, যদি উপমহাদেশে মুসলমান ও মুসলিম লীগ না থাকতো। ১৭৫৭ সন থেকে ১৯২৮ সনের আগ পর্যন্ত হিন্দুরা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অর্থবহ কোন আন্দোলনই করেনি। এমনকি গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন ছিল মুসলমানদের খিলাফত আন্দোলন নস্যাত করার চক্রান্ত বিশেষ। ১৯০৫ থেকে ১৯১১ সন পর্যন্ত ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন ছিল মুসলিম স্বার্থ প্রতিহত করার জন্য। ক্ষুদিরামের বোমা হামলার মূল প্রেরণা ছিল বঙ্গভঙ্গ রদ, তথা হিন্দু-স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখা। বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে বাংলা প্রদেশ চারভাগে ভাগ হওয়ার পর চার টুকরোকে এক করার জন্য কোন আন্দোলন হয়নি। কারণ চার ভাগ হবার ফলে মুসলমানরা উপকৃত হয়নি। আর দুই টুকরা হওয়ায় পূর্ব-বাংলার মুসলমানরা উপকৃত হয়েছিল বলেই হিন্দুরা ১৯০৫ সনে বঙ্গভঙ্গ মেনে নিতে পারেনি। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সারা ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে

www.pathagar.com

দিল্লিতে সরিয়ে নেয়া হলেও রবি ঠাকুর আর কাঁদেননি– "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি"। ১৯৪৭ সনে চার টুকরো বাংলার এক টুকরোকে আবার দুই ভাগে ভাগ করে পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব পাকিস্তান হওয়ার প্রক্রিয়াকে সমর্থনকারী হিন্দুদের মুখেও সে গান শোনা যায়নি। ১৯৭১ সনে রক্ত দিয়ে খন্ডিত বাংলার একাংশ পূর্ব পাকিস্তানকে বাংলাদেশ নামে স্বাধীন করলে পরাধীন পশ্চিম বাংলার সাথে মিশে যাবার জন্য নতুন শ্লোগান ওঠে "এপার বাংলা ওপার বাংলা এক হও।" কিন্তু প্রশ্ন করা হয়নি – একটি স্বাধীন দেশ এপার বাংলার সাথে পরাধীন ওপার বাংলা (পশ্চিম বঙ্গ) কিভাবে এক হয়? বাংলাকে যদি এক করতেই হয় তবে পশ্চিম বাংলাকে আগে ভারতীয় ইউনিয়ন হতে বেরিয়ে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হতে হবে। পশ্চিম বাংলাকে পরাধীন রেখে বাংলাদেশকে পশ্চিম বাংলার সাথে মিশে যাবার মানে হলো বাংলাদেশকে তার স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব হারিয়ে ভারতের সাথে মিশে যাওয়া। নেহেরু-গান্ধীরা তা-ই চেয়েছিল। তারা প্রকাশ্যে বলেছে পাকিস্তানের সাথে যোগ দেয়া বাংলার খন্ডিত অংশ অচিরেই আবার ভারতের সাথে মিশে যাবে। ভারতের সব চক্রান্ত সে লক্ষ্যার্জনে নিবেদিত।

৬৩ বছর কেটে যাচ্ছে। তাদের সে স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেল। সে স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার (যদিও সে অর্থ বাংলাদেশ থেকেই চোরাচালান ও ব্যবসার নামে তুলে নেয়া হচ্ছে) ব্যয় করে বাংলাদেশে "চর" সৃষ্টি করা হচ্ছে, যারা বাংলাদেশী হয়েও ভারতের হয়ে ভারতের স্বার্থে কাজ করছে।

কিন্তু সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে জয়নাল আবেদীনের মতো অতি সাধারণ জনগণ। ভারত বাংলাদেশ গ্রাসে যতো বেপরোয়া হবে, তাদের "চর"রা যত লজ্জাহীন হবে, দেশ রক্ষায় আমাদের অঙ্গীকার ততো শাণিত ও দৃঢ় হবে।

বাংলাদেশের স্বার্থ, স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা ভারতের হাতে তুলে দেয়ার জন্য স্বার্থান্বেষী বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিকরা তথাকথিত বিশ্বায়নের ধূয়া তোলে। কিন্তু বিশ্বায়নের যুগে বিশ্বের কোথায়ও বৃহৎ প্রতিবেশী ক্ষুদ্র প্রতিবেশীর এমন ক্ষতি করেনা, যা ভারত বাংলাদেশের বিরুদ্ধে করছে। বিশ্বের কোন দেশ তার সীমান্তে প্রতিবেশীকে এমন অকারণে হত্যা করেনা, অভিন্ন আন্তর্জাতিক নদীর পানি আটকিয়ে পানি- শূন্যতা কিংবা বন্যা সৃষ্টি করে প্রতিবেশীর আর্থিক-পরিবেশিক ক্ষতি করেনা, প্রতিবেশী দেশকে অন্য দেশের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যের ট্রানজিট না দিয়ে নিজে ভূমি-বেষ্টিত না হয়েও প্রতিবেশীর বুক চিরে

www.pathagar.com

করিডোর চায় না, বন্দর চায়না, প্রতিবেশীর ভূমি ও সমুদ্র সীমা দখল করেনা, অথবা আর্থিকভাবে পঙ্গু, রাজনৈতিকভাবে অস্থিতিশীল অচল করার জন্য "চর" সৃষ্টি করেনা, কিংবা অন্তর্ঘাতমূলক অপকর্ম চালায়না, প্রতিবেশীকে বিব্রত বিচ্ছিন্ন করে ধবংস করতে চায়না, সর্বোপরি প্রতিবেশীকে ছায়া-রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায়না। এসব বিষয় বিশ্লেষণ করলে বুঝতে কষ্ট হয়না ভারতই বিশ্বায়নের চেতনা কিংবা সৎপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ককে পদদলিত করছে। পিলখানায় সেনা কর্মকর্তা হত্যা সে চেতনা পদদলনের অন্যতম লোমহর্ষক নিন্দনীয় নজির।

এই বিপর্যয়ের দুঃখজনক ব্যর্থতা হলো দেশ রক্ষার মহান দায়িত্বে নিয়োজিত আমাদের সোনার সন্তানদের জীবন রক্ষায় আমরা সামান্যতম ভূমিকা রাখিনি। একটা নির্দেশই হয়তো তাদেরকে রক্ষা করতে পারত। কিন্তু সে নির্দেশ আসেনি। আমরা যেন ইচ্ছে করেই তাদেরকে মরতে দিয়েছি। বারবার উদ্ধারের জন্য সেলফোনে কাকুতি-মিনতি করার পরেও কর্তৃপক্ষের অন্তরে তাদেরকে বাঁচানোর জন্য সামান্যতম অনুভূতি জাগেনি। আমাদের জ্ঞাতসারে আমাদের ঘরের ভিতরে এতগুলো প্রাণ ঝরে গেল। এমন নির্মম দায়িত্বহীনতা ব্যর্থতার দায়ভার কে নেবে? রেল দুর্ঘটনায় ক'জন যাত্রীর প্রাণহানি ঘটায় ভারতের মতো দেশের রেলমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে দেখা গেছে। অথচ আমাদের চোখের সামনে দিন-দুপুরে ৩৩ ঘন্টা ধরে পরিকল্পিতভাবে সব মিলিয়ে ৭৪ জনকে হত্যা করে বিভিন্ন কায়দায় লাশের ওপর অত্যাচার করতঃ গুম করা হলো, পোড়ানো হলো, গণকবরে পুঁতে ফেলা হলো, ময়লা ভর্তি ড্রেন-সুয়ারেজ লাইনে ফেলে দেয়া হল, আর সবশেষে খুনীরা নির্বিঘ্নে নিরাপদে তাদের গন্তেব্যে চলে গেল। অথচ এ ব্যর্থতার দায়ভার আমাদের কর্তাব্যক্তিদের কেউ স্বীকার করেননি। বরং এ নারকীয় হত্যাকান্ডের দায়ভার বিরোধী দলের ওপর চাপিয়ে দিয়ে তারা নিজেদের দায়মুক্ত করার চেষ্টায় লিপ্ত।

সরকারের এ অভিযোগ মেনে নেয়ার পরেও প্রশ্ন ওঠে বিরোধী দলের লেলিয়ে দেয়া ঘাতকদের কেন ধরা হয়নি? কেন পিলখানার চারপাশে কারফিউ জারী করা হয়নি? কেন ডিএডি তৌহিদসহ ১৪ জন ঘাতকদের আটক করা হয়নি? বিরোধী দল কি এসব পদক্ষেপ না নেয়ার জন্য সরকারকে বাধ্য করেছে?

এই হত্যাকান্ড সরকার সর্মথক বহু কর্তাব্যক্তির জন্য অসম্ভব ধরনের মিডিয়া কভারেজের সুযোগ এনে দিয়েছে। জাতি বিস্ময়-বিহ্বল চিত্তে তাদের দৌড়-

www.pathagar.com

ঝাপ টিভি পর্দায় দেখেছে। কিন্তু এসবের শেষকথা হলো ৭৪ টি তাজা প্রাণের অপমৃত্যু।

বিশ্ব ইতিহাসে এমন নজির এই প্রথম যে ঘাতকরা দেশের মূল অভিভাবক ও রক্ষক প্রধানমন্ত্রীর (যিনি প্রতিরক্ষা মন্ত্রীও) বাসভবনে দুই ঘন্টারও বেশী সময় অবস্থান করে। কোন বিবেচনায় তাদেরকে তৎক্ষণাৎ আটক করা হয়নি। বরং তাদেরকে ভিভিআইপি'র মর্যাদা দিয়ে পিলখানায় পৌছিয়ে দেয়া হয়েছে। এর চাইতে নির্মম কৌতুক আর কি হতে পারে?

সরকার ইচ্ছে করলেই বিনা রক্তপাতে একবোরে প্রারম্ভেই এই নির্মমতা বন্ধ করতে পারত। বিডিআর বিদ্রোহের হোতারা সরকারের ঘনিষ্ঠজনদের সাথে একাধিকবার দেন-দরবার করেছে। সুতরাং সরকার বিষয়টি সম্পর্কে কিছুই জানেনা – এমন যুক্তি সমর্থনযোগ্য নয়। সর্বোপরি, হতভাগ্য সেনা কর্মকর্তারা প্রধানমন্ত্রী, সেনাবাহিনী প্রধান এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদেরকে সেলফোনের মাধ্যমে তাদেরকে উদ্ধারের জন্য অনুরোধ জানানো সত্বেও সরকারের নীরবতা কিসের ইঙ্গিত বহন করে? আমি আমাকে প্রশ্ন করি কিভাবে এবং কেন প্রধানমন্ত্রী ও সেনাবাহিনী প্রধানসহ অন্যান্যরা এমন নির্মম হত্যাকান্ড মেনে নিলেন? প্রতিরক্ষামন্ত্রী তথা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনার কি কোন দায়-দায়িত্ব ছিল না? সরকার নানা কায়দায় যুক্তি দেখিয়ে ব্যর্থতা স্বীকার না করে যাদের ওপর দায়-ভার চাপানোর চেষ্টা করছেন আসলে তারাই কি এ হত্যাকান্ডের জন্য সত্যই দায়ী? এটা কোন গোপন হত্যাকান্ড ছিলনা। ৩৩ ঘন্টা ধরে চলা হত্যাভিযান। এই লম্বা সময়ে সরকার কি করেছে? এমন প্রশ্নের কোন গ্রহণযোগ্য উত্তর আছে কি?

সরকারের ব্যর্থতা এখানেই শেষ নয়। ক্ষত-বিক্ষত সেনাবাহিনীর বিশাল শূন্যতা পূরণ কিংবা উদ্বিগ্নতা দূরীকরণের উদ্যোগ না নিয়ে সরকার আরো শতাধিক সেনা কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক অকাল অবসরে পাঠালেন? কাউকে কাউকে বিভিন্ন অভিযোগে গ্রেফতার করলেন। প্রশ্ন উঠেছে, পুরো সেনাবাহিনীই কি আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়াতে যাচ্ছে? সেনাবাহিনী পুরোপরি অনিশ্চয়তা, উদ্বিগ্নতা ও স্নায়ুর চাপে ভুগছে। কখন কি হবে, এ নিয়ে তারা শংকিত। তারা জানেনা কে কখন কিভাবে কোন অভিযোগে অভিযুক্ত হতে যাচ্ছে? চরম অনিশ্চয়তা ও আতংক তাদেরকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। একটি স্বাধীন শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সেনাবাহিনীর এমন করুণ দশা সত্যিই নজিরবিহীন। সেনাবাহিনীতে আসাটাই যেন তাদের অপরাধ, তাদের পাপ।

www.pathagar.com

তা না হলে এমনটি হবে কেন? এর শেষ পরিণতি দেশের অস্তিত্বের জন্য চরম বিপদ ডেকে আনতে পারে।

অনেক সমালোচকদের মতে ব্যাপক সংখ্যক হতভাগ্য সেনা কর্মকর্তাদের চাকুরীচ্যুতি পিলখানা হত্যাকান্ডের অসমাপ্তাংশের বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা বিশেষ, তা না হলে সেনাবাহিনীকে নিয়ে এমন টানা-হেঁচড়া কেন?

এমন নির্মম হত্যাকান্ডের খুনী এবং তাদের সহযোগীরা ৭৪টি পরিবারের স্বজনহারা সদস্যদেরকে কেবল শোক-সাগরে নিক্ষেপই করেনি, দেশের প্রতিরক্ষা তথা অস্তিত্বের ওপর চরম আঘাত হেনেছে। পিলখানা হত্যাকান্ড এবং তৎপরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ দেশের অস্তিত্বের জন্য অশনি সংকেত বিশেষ।

এ ক্ষতি মোকাবেলার জন্য সর্বিশেষ প্রয়োজন যথাযথ তদন্তের মাধ্যমে খুনী, তাদের স্থানীয় সহযোগী, সর্বোপরি, নেপথ্য রূপকারদের সরকারী উদ্যোগে চিহ্নিতকরণ এবং সর্বক্ষেত্রে সর্বপর্যায়ে জাতীয় ঐক্য ও ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলো অজ্ঞাত কারণে সরকার সে উদ্যোগ নেয়নি। বরং সরকার উল্টো পথে হাঁটছেন।

ফলে বাংলাদেশের অতি নগণ্য নাগরিকও সরকারের উদ্দেশ্য ও স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। মানুষের আবেগ, মন-মানসিকতা, আশা-আকাঙ্খাকে মনে হয় সরকার মোটেই তোয়াক্কা করেনা, যা একটা গণতান্ত্রিক সরকারের দায়িত্ব ও বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী। সরকার যেন নিজ থেকেই নানা অজুহাতে সমস্যার পর সমস্যা সৃষ্টি করে চলেছেন, যা কোনভাবেই দেশের জন্য সুখকর নয়। এ সবকিছু নিয়ে 'বিডিআর ম্যাসাকার : টার্গেট বাংলাদেশ' শীর্ষক গ্রন্থটি প্রকাশের পরপরই বাংলাদেশ তো বটেই ব্রিটেন, আমেরিকা, কানাডা প্রবাসী বাংলাদেশীদের পক্ষ থেকে প্রায় প্রতিদিনই গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদের অনুরোধ এসেছে। আমেরিকায় নানা ব্যস্ততা ও সীমাবদ্ধতার মধ্যে এর ভাবানুবাদে যথাযথ সময় ও মনোযোগ দেয়া সম্ভব হয়নি। বানান বিভ্রাটসহ অন্যান্য ভুল-ত্রুটি দূরীকরণার্থে একাধিকবার ভুল সংশোধনের সময় ও সুযোগ ছিল না। নতুন কোন তথ্যও আমি এর সাথে সংযোজন করিনি। হয়তো একান্তভাবেই অনেকটা মনের অনুরোধে দু'একটি বাক্য সংযোজিত হয়েছে। একমাত্র ব্যতিক্রম হলো মরহুম এম আর আখতার মুকুলের অনবদ্য গ্রন্থের (কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণী) এক পৃষ্ঠার সংযোজন। অন্যথায় বর্তমান গ্রন্থ পুরোপুরি ইংরেজি গ্রন্থের ভাবানুবাদ। এমনকি মূল গ্রন্থে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী ডঃ অধ্যাপক মাহাবুব উল্লাহ'র লেখা সারগর্ভ ভূমিকা

www.pathagar.com

সরাসরি বর্তমান গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে। চিন্তাবিদ ডঃ মাহাবুব উল্ল্যাহ যে মনন ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভূমিকা লিখেছেন ভাবানুবাদে তার সে চেতনা হয়তো যথাযথভাবে নাও আসতে পারে – এমন বাস্তবতার কারণে আমি তাতে হাত দেইনি।

একইভাবে যে আবেগ, দুঃখবোধ, পরিবেশ-পরিস্থিতিগত আত্মিক তাড়নাবোধ থেকে এই গ্রন্থ রচনায় আমি উদ্বুদ্ধ হয়েছি মূল গ্রন্থে আমার জবানবন্দীতে তা কিছুটা হলেও প্রতিফলিত হয়েছে। ভাবানুবাদে তা ক্ষুণ্ন হোক তাও আমি চাইনি। এই কারণেই ইংরেজি গ্রন্থের আমার বক্তব্যটিও বর্তমান গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে।

সময়, অর্থসহ নানাবিধ সীমাবদ্ধতা সত্বেও গ্রন্থটির বাংলা সংস্করণ আমার সুহৃদ পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের চাপ-সূচক একান্ত অনুরোধের ফসল। প্রিয়ভাজন কবি ও সাংবাদিক আবদুল হাই শিকদারের সাথে ফোনে কথা বলতে গেলেই প্রথম কথাই ছিল বাংলা অনুবাদটি কবে বের হবে, কেন হচ্ছে না ইত্যাদি প্রশ্ন। আর নিজ স্বার্থে কিংবা জীবন রক্ষার জন্য দেশের এমন দুর্দিনে আমেরিকায় চলে গিয়েছি এমন অভিযোগতো তার এবং আমার হাজার হাজার চেনাজনদের কাছ থেকে প্রতিনিয়তই শুনছি। তাদের মতে আমার অনুপস্থিতি দেশ ও জাতির জন্য ক্ষতি হচ্ছে। তাদের ভাষায় "জাতির এই দুর্দিনে আমি দেশে নেই" তাদের এমন অভিযোগের বিরুদ্ধে আমার কোন প্রতিবাদ নেই। আমিও মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি, সত্যিই আমার দেশে থাকা জরুরী। আমার দেহ থাকে আমেরিকায়, হৃদয়-মন থাকে বাংলাদেশে। আমার অভাব যারা অনুভব করছেন তাদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। স্বদেশে-বিদেশে অবস্থানকারী এসব শুভাকাঙ্খী-সুহৃদদের সংখ্যা এতো ব্যাপক যে তাদের নাম লিপিবদ্ধ করতেই একটি পৃথক গ্রন্থের প্রয়োজন। তথাপি লন্ডনের সর্বজনাব গয়াস উদ্দিন, জগলুল হোসেন; নিউ ইয়র্কের ডঃ শওকত আলী, ডঃ মোহাম্মদ আবুল কাশেম, মাসুম মোঃ মহসিন, ফাতেমা শাহাব রুমা, আবুল বাসার; কানাডার আহম্মদ ইমতিয়াজ; জার্মানীর নূর আহমদ (ছদ্মনাম); সুইডেন'এর সুফিয়া চৌধুরীর নাম উল্লেখ করতেই হয়। এ গ্রন্থে উল্লেখিত সব গবেষক, লেখক, সাংবাদিক, বিশেষজ্ঞ, বিশ্লেষক সর্বোপরি ডঃ মোহাম্মদ উল্লাহ'র কাছে আমি ঋণী। আর বিশিষ্ট সাংবাদিক মোঃ নূরুল আমিন'এর প্রেরণা ও পরামর্শতো স্বীকার করতেই হয়।

www.pathagar.com

সময় ও সুযোগ অত্যন্ত সীমিত থাকায় নানা ধরনের ভুল-ভ্রান্তির জন্য আমি দুঃখিত। একই কারণে পরিবর্তিত পরিস্থিতিগত কিছুই ইচ্ছাকৃতভাবেই সংযোজন করা হয়নি। সব সীমাবদ্ধতাই আমার নিজস্ব। তথাপি আমি মহান আল্লাহর দরবারে শোকর করছি, যিনি আমাকে জাতির এমন বেদনাদায়ক বিষয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দলিল-সম এ গ্রন্থটি উপস্থাপনে অদৃশ্য প্রেরণা, শক্তি ও সাহস যুগিয়েছেন।

আমার সময়, শ্রম, মেধা ও অর্থ ব্যয় তখনই সফল হবে যদি সরকার তথা নীতি-নির্ধারকরা এ গ্রন্থের মূল চেতনা অনুধাবন করে অতীত ভুল শুধরিয়ে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, আঞ্চলিক অখন্ডতা, সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় শত্রু-বন্ধু চেনেন, যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং বুদ্ধিজীবী-সাংবাদিকরা জাতিকে শত্রুর মোকাবেলায় অনুপ্রেরণা যোগাতে সাহসী কলম চালান। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে দেশ রক্ষার এ অবিরাম লড়াইয়ে সাহস দিন। আমিন।

১৬ ডিসেম্বর, ২০০৯
বিজয় দিবস

মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন
মিরপুর, ঢাকা।

www.pathagar.com

Foreword

It gives me immense pleasure to write foreword for the book *BDR Massacre: Target Bangladesh* authored by MR. Mohammad Zainal Abedin. The author has taken severe pains to chronicle one of he most tragic events of our contemporary history, the massacre of 57 army officers of our army on the 25th and 26th February this year in a heinous plot to give a mortal blow to our independence and sovereignty of our country. The author has presented the massacre in the backdrop of Indo-Bangladesh relations, which has not been savory so to speak, though the expectations were that the two neighbours would be very friendly in the interest of welfare of the people of both the countries.

One need not agree with everything that the author wrote in the book. But his efforts to record the events of this massacre are commendable. Every sentence of the book is an explosion of his emotion that rocked his mind by the tragic incident. Naturally any emotional outburst cannot be fully objective. For his write-up he has depended entirely on newspaper and internet sources, which often verge on mere speculation and conjecture. As source materials for history these are useful, but not entirely dependable. I appreciate the reasons for this limitation, as he could not access the classified documents, nor could he personally interview relevant persons. Yet the value of the book lies in putting together whatever he could gather in so short a time. In a genuinely open society a book written on such a grave incident of contemporary nature is usually more incisive and thoroughgoing. Ours is not an open society, nor our State strong. I do not therefore expect Abedin to achieve the heights attained by Thomas L. Friedman, Adrian Levy and Catherine Scott-Clark or others in the west.

In this book the author has pointed his fingers at India. Many in our country would agree with Abedin. That is one thing, but it is difficult to establish this conclusion with aid of hard evidence. Cunning and crafty operators hardly leave any evidence for a weak and gullible suffer. How could a weak and powerless country dare to speak against a powerful one with immense capacity to create troubles? That explains why the terms of

www.pathagar.com

reference of the enquiry committees did not contain instruction to unearth involvement of foreign powers. However, irreparable damage has been done to the very foundation of our country. We had not been vigilant. Now we pay the price. Let us bring an end to the blame game and concentrate our energies and commitment to protect the honour and dignity of our State. To find the involvement of foreign powers in this case would be just like seeing the reflections in a mirror without ever being able to catch them.

Writing contemporary history irrespective of size and depth is always very difficult. R. Palme Dutt in the preface to his book, 'Problems of Contemporary History' has written, "Contemporary history is a dangerous subject to handle. It is full of explosive material. Much essential information will not be known until many years later, as documents are released and memoirs published. Passions and partisanship can obscure objective judgment. Anyone who attempts to write contemporary history in a more durable form than a current journalistic article is laying his heed on the block for the executioner. Nevertheless, contemporary history is the most important history of all to handle. It is the events of our day which need to be studied and assessed, not only in current polemical treatment, but with an attempt at serious understanding of how they have arisen and where they leading." The reader is thus amply forewarned despite the pitfalls I recommend that the book should be read with interest by all those who are interested in the affairs of Bangladesh.

June 30, 2009

Mahbub Ullah
Dhaka.

www.pathagar.com

Author's Explanation

Bangladesh survived yet another debacle that extremely stunned and aggrieved the Bangladeshis living in home and abroad. Bangladeshis have no room to mourn the brutal murder of the 57 brilliant officers of our beloved and glorious Army, the vanguard of our independence, sovereignty and territorial integrity who were the victims of the abrupt and unimaginable BDR (Bangladesh Rifles) mutiny inside its headquarters in Dhaka on February 25 and 26 (2009). We express our heartfelt solidarity with and sympathy to the members of those bereaved families that lost their beloved ones.

The shocking holocaust that occurred at Peelkhana has little precedence in the contemporary history. Even the horrible atrocities of the Serbian beasts against the Muslims, destruction of Khyazom by Changish Khan, ruination of Baghdad by Halaku Khan, etc. were not so abrupt and selective. It cannot be compared even to the annihilation of the Jews by Hitler. The bloodstained BDR massacre was added to scar of 1971 that all along pained the nation caused by our adversaries.

In 1971 the mastermind of the massacre was open and we knew our enemies. We were fighting for a cause — to liberate our country. But it is somewhat difficult to identify the enemies of the Peelkhna incident. Some media reports mentioned that some killers came from a neghbouring country and sneaked to that country after the massacre. Bangladesh neighboured by India and Myanmar in three sides in the West, North and East and Bay of Bengal in the South. Bangladesh follows a universally accepted foreign policy – friendship with all, enmity to none. Being a peace-loving country Bangladesh was supposed not be disturbed by its neighbhours. There is no record that Bangladesh ever intruded into its neighbours' territory using any excuse. We neither design to interfere in other's internal affairs nor will we allow others to play this ugly game in our affairs. Still we are the victims of many hegemonic designs.

Since its inception Bangladesh faces overt and covert sabotage and subversive attacks let loose by our neighbours, particularly

www.pathagar.com

India. To keep Bangladesh fragile in all sectors, India pulls us from behind our back so that we cannot stand on our own feet and proceed towards stability and economic prosperity. With this end in view, mercenaries were created from amongst us who are let loose to commit various overt and covert subversive activities. Two parallel and rival groups were created among the freedom fighters to compel the interim exile government to sign uneven treaty to make Bangladesh a subservient country. After December 16, 1971 Bangladesh was plundered, counterfeit paper currencies were printed to create unmanageable inflation that led to unprecedented famine; goodowns and mills and factories were set on fire to make Bangladesh a monopoly market of India and capture its international market, armed groups and so-called communist cells like Purbabangla Sharbahara Party, Gano Bahini, Jano-judda Lal Pataka, etc., and Islamic extremist groups like JMB and others were floated that caused reign of terror in the country. Uneasy non-academic was created situation in the educational institutions to arrange the migration of the Bangladeshi students to Indian schools and colleges. Bangladesh was kept politically destabilized and disunited. Two Presidents were killed who were India's eyesores for their patriotic role and the Armed Forces were weakened and made controversial by staging coups and countercoups. To ruin economy and local industries hartal (general strike), blockade and sit-in programmes, etc. were fueled and staged so that Bangladesh totally depends on India. It is difficult for us to get out from such curses.

There lies a real dilemma for Bangladesh in forging some form of much needed unity to stand concrete against constant onslaught of Indian hegemony. Indian policy makers are well aware that the traditional method of occupying a country by force is neither appreciable nor acceptable in the current world scenario. Today, to run over a country, an aggressor psychologically cripples civil the force of a nation and reduces its economy to shambles and creates such a situation that its citizens no longer possess mental strength and inspiration to be self-reliant. Indian spy agency RAW (Research and Analysis Wing) persistently is attempting to create such a situation in Bangladesh. It is known to all that Indian intelligence agencies are engaged in disruptive activities to create

www.pathagar.com

such an unbearable awkward crisis in Bangladesh so that demand for Indian intervention in Bangladesh is raised from within. In fact, India has a condemnable history of forcibly swallowing many regions like Hyderabad, Manvadhar, Goa, Dumn, Deue and Kashmir and of course not forgetting the illegal and conspiratorial annexation of Sikkim, a tiny and rocky mountainous kingdom of the Himalayas. Even India's annexation of seven States of Eastern Asia what India terms as northeastern India, was not based on people's sentiment, hope and aspiration. It is to be mentioned that the entire region was never within Indian Empire before the East India Company hatching conspiracy captured and annexed it to the British Empire in between in 1826-30. Recalling all these it would be quite naive to believe that India is serious capture a strategically important country like Bangladesh as this annexation seems necessary for it to suppress the on-going liberation struggles in North-Eastern Indian States bordering Bangladesh. Such annexation is also imperative to implement its dream of so-called 'Akhand Bharat' theory.

With that end in view, India undertakes various notorious and uncivlised cruel steps. The latest one is the debacle in BDR Headquarters. To implement its multi-pronged intrigues, India fueled the BDR carnage to ruin the two main defense wings of the country. India desires that Bangladesh should not have a strong and viable Army in Bangladesh, its border should remain open and unprotected, and above all, the Bangladeshis should remain poor, chaotic and disunited.

The plan and pattern of the mutiny and its unprecedented havoc within the shortest period of time, uncovers one truth that the mutiny was preplanned having deep-rooted conspiracy of destroying not only our Army, but also the country. Massacre in BDR Headquarters rocked the foundation of our country and endangered its existence. "Whoever staged this debacle, it is clear that it was masterminded by alien power that designs to weaken the Army and bring the people and the Army face to face ----." (Mokkarom Hosen: Naya Diganta: March 7, 2009). It was not done whimsically. Besides, a section of BDR jawans revolted in 34 BDR units of the country. Such a large operation could not be carried out so efficiently without prior motivation, preparation and

www.pathagar.com

financial support. It was designed by the adversaries of Bangladesh so that the nation is divided into two groups --- Army versus BDR, ---- which would lead to a civil war.

So-called Bangladeshi terrorists or militants do not have the ability to ever stage such lengthy havoc at the headquarters of a front-ranking defence agency. No terrorist would ever dare to launch tempest inside the highly sophisticated BDR Headquarters, if they are not highly trained with strong support behind. None of the so-called mutineers were killed or injured or arrested during the massacre. It means, all the killers knew one another and nobody countered or challenged them. Above all, they knew whom they would kill – the Army officers only. Terrorist or militant attacks generally occur on civilian targets, and in rare cases, at best on vehicles of security forces, which are very short-lived. The extent of cruelty, ferocity, intensity, dreadfulness, etc., clearly indicate that it was a longstanding well-devised blueprint orchestrated by neighbouring India, as Bangladesh has no other enemy in the world. Indian intelligence agencies motivated and derailed the BDR jawans using BSF and smugglers who had chances to come in contact with them (BDR) in the border areas. India and its Bangladeshi tentacles, in a bid to conceal India's ugly face put forward various theories to ascribe the responsibility of Peelkhana massacre on the so-called Islamic terrorist groups, or local political parties and persons. Video footages, pictures and reports flashed in the print media, confessional statements of the arrestees, unequivocally point the arrow of suspicion to India that planned and implemented this debacle to liquidate BDR and Bangladesh Army and turn Bangladesh to India's subservient State. On the other hand, India's voluntary and undesirable proposals to Bangladesh that included providing money for BRD, assistance of any type, even sending so-called peace mission, war preparation, reinforcing air force adjoining Bangladesh border, readiness to reconstruct BDR and above all, to intervene in Bangladesh to rescue Sheikh Hasina government, etc., uncover Indian involvement in the debacle.

To prepare a ground for foreign intervention intrigues are in progress so that Bangladesh is branded as a failed and dysfunctional State. The debacle of February 25-26 (2009) was

www.pathagar.com

the continuation of that conspiracy what was directed to ruin the two main defense forces at a time. There is no minimum scope to think that the murdering of so many Army officers at a time miraculously coincided with the so-called rebellion of a portion of BDR jawans.

Only the fools will believe that those who shot and killed the Army officers, buried them in mass graves, threw them in drains and sewerage lines, looted BDR arms and residents of the BDR officers, set fire on their residences and burnt some officers and raped women — did commit all those crimes and fled away safely at their own without enjoying others' help. The killers and criminals surely enjoyed the support of some powers that ensured their personal safety. We silently observed massacres, one after another and consume our pains and agonies. Being perplexed and distressed due to inhuman and cruel death of our sons we don't even dare to name the killers. We don't have the moral courage even to express our agony saying "Alas".

Our adversaries killed two birds at one stone at Peelkhana. They killed our talented Army officials and made BDR almost leaderless that shattered our border security in one hand, and made the entire BDR establishment – our symbol of pride and heroism – controversial and brought it to the dock of the accused on the other. What could be greater loss than it for our defense management? This killing operation reduced our defense strength and ability, inflicted heavy blow our Army, and above all, shattered our defense preparedness. Brig. Gen. Mainul Islam, who was appointed as the new DG of BDR immediately after the massacre accurately opined, this holocaust was launched to make our country defenseless.

It is heart-rending that 57 out of the 133 Army officers, who came to BDR Headquarters on the occasion of its Annual BDR Week, were killed under a well-thought blueprint. They were deputed at Peelkhana, BDR units, battalions and sectors throughout the country. It was neither a mutiny, nor outburst of the deprived and agitated common BDR jawans. Under that situation one or two Army officers who were really responsible for the alleged deprivation, corruption, disparity or torture could be the victims of wrath of the derailed BDR members, but not the 57 officers with

www.pathagar.com

whom the BDR jawans worked for a long time could not be killed by them. In that case other BDR jawans would have resisted the attackers from killing their bosses. Since it was an integrated alien conspiracy, only the derailed, motivated and purchased BDR jawans and their alien accomplices participated and committed the massacre that pained the entire nation.

One can console oneself if anyone of our soldiers dies fighting his enemies in the battlefield. But one cannot be, but terrified and aggrieved when a soldier is killed by his perverted fellow-subordinates or colleagues or unidentified enemies. Question arises, if the officers of the border guards cannot ensure the security of their lives how the border would remain secured. If the government fails to secure the lives of the Army officers how it will secure the country from foreign invasion. How the common people will feel secured in their own land?

The incident terrifies the entire nation as it signals many more such debacle ahead. Such huge blood might not have quenched the thirst of the hyenas. They will not remain idle. Our foes will not refrain from causing further debacle. I can't guess for how many decades we will have to weep, for how many times our fathers will have to carry the dead bodies of their sons to the graveyards. I can't predict in what form such debacles will reappear and what loss we shall have to incur further. The most uneasy aspect of the tragedy is that our enemies are not officially identified that extremely fails us to face its conspiracies.

Though it is imperative, yet for unknown reasons, the nation was not duly informed who orchestrated this fateful incident against Bangladesh, created crisis for the people and for the existence of the government and above all, for the sovereignty and independence of the country. The incident at Peelkhana was not mere a mutiny of a number of so-called BDR jawans, rather there were far-reaching and well-thought designs behind it.

Ruling and opposition party leaders, even the Prime Minister herself, were of the same conclusion that there was a deep-rooted conspiracy behind the Peelkhana massacre. But for unknown reason government is not so active to uncover and identify the masterminds of the massacre. Print media and participants in 'talk shows' of electronic media alleged that neither of the three probe

www.pathagar.com

committees were allowed to work independently and investigate and identify the hidden power, rather their spheres of investigation were made limited imposing preconditions. Nevertheless any sensible individual can identify this power if he tries to get the answers of some questions: who are the enemies of Bangladesh, who do not believe in the separate existence of Bangladesh, who are the beneficiaries of BDR debacle, who are the people that relentlessly try to turn Bangladesh to a 'dysfunctional' or 'failed State'. People of all strata of life — right from the Prime Minister to the village 'chokidar' — accurately guessed who masterminded the BDR massacre, but the probe committees were not allowed to unveil their ugly faces. Government made the role of the probe committees controversial, as if the government was serious to hide and protect the mastermind of the debacle and its real accomplices.

We are to reach to the bottom of this diabolic conspiracy against the country's sovereignty and must come out of the partisan closet in order to uphold the necessity of preserving the nation's sovereignty at any cost. That spirit to get to the truth is needed more now than anytime before. George Orwell once said, "In a time of universal deceit, telling the truth is a revolutionary act." Since the nation passes through many deceitful power plays being orchestrated by forces within and without, telling the truth may be the only recourse to save our sovereignty and independence from many more impending catastrophes like Peelkhana tragedy.

Since neither of the probe committees that completed investigations reports so far, due to preconditions and limitations, could name or identify the mastermind or its local toadies who were involved in the BDR debacle, I strongly believe efforts should be made from intellectual level to uncover its ugly face. This spirit, despite my limitations, urged me to work on the issue of BDR debacle, so that our people could identify their foes. I believe what I have done using my limited knowledge and raw language, is incomplete that should be more informative, comprehensive and documentary. I strongly believe, the issue needs further research and hope other patriotic personalities will come forward to document this tragic part of our history so that

www.pathagar.com

our coming generations cannot blame us, but get accurate information about it.

A section of the Bangladeshi intellectuals, bureaucrats, journalists, cultural activists, leaders of different political parties and their student fronts directly and indirectly let the people know that they have warm relations either with America, European or Middle Eastern countries, China, Russia, or even with India or Pakistan. Dependence on others is suicidal not only for the country, but also for them. They seldom think that these countries maintain warm relations with them only for their respective interest. For this reason, most of the heavyweights in or outside power, are subservient to some foreign powers mainly to assume power or to remain in power. Foreign powers use our policymakers and leaders to meet their own strategy and interest. Sometimes they create problems for our country. The problem multiplies in case of India, as it is a newly emerged expansionist bully in the South Asian region and feels pride in exposing and exhibiting it as so-called superpower that it projects by creating unrest and instability in its neighbouring countries and scaring their people. Pro-foreign politics and India-phobia deter our government from uncovering the mastermind of the BDR massacre.

The whole nation is terribly scared seeing the awful cruelty in the BDR debacle. Even most of the nationalist intellectuals, university teachers, military analysts, journalists, leaders of political parties seriously suffer from insecurity. Some of them even claimed that they are the targets of Indian RAW and may face the fate of Dr. Aftab Ahmed, a patriot and scholar who vehemently opposed India's hegemonic design and murdered at his Dhaka University residence. Many of them, out of fear, expressed their inability in writing a preamble for this tiny book apprehending the unpredictable gruesome consequence. Being my sincere well-wishers they suggested me not to play with fire and refrain from writing on this issue right now. It uncovers one reality that India succeeded in intimidating most of our people. They are psychologically frightened and scared of India.

Nonetheless, I saw a ray of hope at the rear end of the tunnel when I called on DR. Mahbub Ullah, a courageous patriot of our time, who really made me optimistic that India's hegemonic bid will not

www.pathagar.com

go unchallenged. He without any hesitation readily agreed to make his effort to write the preamble, which is fiery, unique and inspiring and according to my assessment is the main attraction of this book. I owe to him for his uncompromising support to this tiny work what is entirely dedicated to the cause of our nation. His daring cooperation is an eye-opener for us all. We have no room to suffer from timidity or cowardice or India-phobia.

I sincerely express my gratitude to Major (Retd.) Ashrafuzzamn, Lt. Abu Rushd Editor of 'The Bangladesh Defence Journal', A S M Goyas Uddin the proprietor of the London-based publishing house Eastern Publications who contributed in various ways to present this tiny work to the nation. Besides, a good number of journalists, intellectuals, cultural activists, particularly Poet Abdul Hye Sikder, Syed Golam Kibria Dipu, Munmun, etc., helped me selflessly in writing this book.

I should admit that for easy understanding of the common readers some issues were repeatedly mentioned in this work, which may irk irritation. I humbly seek pardon from my valued readers for such unintentional limitation. I humbly admit that due to my heavy schedules and shortage of time, readers will face various types of errors and omissions, information gaps, even ambiguities, which will be removed, if Allah blesses me, in the next edition.

My humble efforts will get its genuine recognition if our policymakers, intellectuals, journalists, business communities and bureaucrats, etc. get minimum message to identify our foes and work courageously to face its design. Let all of us stand for our own country for which our sons repeatedly shed their blood. We must not let their blood go in vain. May Allah bless us all and make us real patriots and crusaders to save our country and secure its independence and sovereignty. Long live Bangladesh.

July 1, 2009
Mirpur, Dhaka
Bangladesh.

Mohammad Zainal Abedin

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

২৫-২৬ ফেব্রুয়ারী পিলখানায় বিডিআর সদর দফতরে নির্মম হত্যাকান্ড দেশবিরোধী চক্রান্তের অংশ বিশেষ। আমাদের সময়ের দুঃসাহসিক কলম সৈনিক গবেষক ও সাংবাদিক মোহম্মদ জয়নাল আবেদীন আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বাধিক মর্মভেদী এ ঘটনাকে গবেষণার মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরে দেশ ও জাতির জন্য অনন্য অবদান রেখেছেন। গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে সময়োপযোগী একটি প্রামাণ্য দলিল বিশেষ, যা যুগ যুগ ধরে স্বাধীনতাকামী মানুষকে অনুপ্রেরণা যোগাবে। ইংরেজি পাঠকদের ব্যাপক প্রশংসিত এ গ্রন্থটি দেশী ও প্রবাসী বাংলাদেশী পাঠকদের বারংবার অনুরোধে সাড়া দিয়ে তাদের জন্য মুদ্রিত করতে পেরে আমি আনন্দিত। এ গ্রন্থটি পাঠান্তে পাঠক সমাজ আমাদের শত্রু-মিত্র চিহ্নিতকরণে এবং স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আরো সচেতনতা ও বিচক্ষণতা অর্জন করবেন মূলতঃ এমন বিশ্বাস থেকেই কালজয়ী গ্রন্থ "বিডিআর ম্যসাকারঃ টার্গেট বাংলাদেশ" এর বাংলা সংস্করণ প্রকাশে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে আমরা এ বার্তাই পৌছিয়ে দিতে চাই, দেশ-জাতি-বিরোধী কুচক্রীদের মুখোশ উম্মোচনকারী সাহসী সৈনিকরা কখনই অপশক্তির কাছে আত্নসমর্পন করবে না। আমিন।

১৪ ডিসেম্বর ২০০৯
শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস

এস. এম. গয়াস উদ্দিন
স্বত্বাধিকারীঃ
ইস্টার্ন পাবলিকেশন
১৬, সিলভেষ্টার হাউজ
লন্ডন, ই ওয়ান ২ জেড; ইউ,কে।
ই-মেইলঃ u_goas@yahoo.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক	**(৩৩-৬০)**
* *তিক্ত অতীত*	৩৩
* *বিষময় সহযোগিতা*	৪৩
* *বাংলাদেশ বিরোধী কার্যক্রম*	৫১
* *ভারতের বাংলাদেশ ভীতি*	৫৭
আমাদের সীমান্ত	**(৬১-৭৪)**
* *অস্থির সীমান্ত*	৬৩
* *অপ্রতিরোধ্য অপরাধ*	৬৫
আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাপনা	**(৭৫-১০৯)**
* *বিডিআরঃ সীমান্ত প্রহরী*	৭৭
* *শত্রুভাবাপন্ন বিএসএফ*	৮১
* *বিডিআর'এর বীরোচিত ভূমিকা*	৮৫
* *বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী: ভারতের চক্ষুশূল*	৯১
* *ভারতীয় সেনাবাহিনীতে হিন্দুত্ববাদী জঙ্গীবাদ*	১০১
ব্যাপক গণহত্যা	**(১১১-২১১)**
* *মূল রূপকার*	১১৩
* *ছদ্মবেশী খুনী*	১৩৭
* *হত্যাকান্ড কিভাবে বাস্তবায়িত হয়*	১৪৫
* *সরকারের ভূমিকা*	১৫১
* *সুদূরপ্রসারী প্রভাব*	১৬৩
* *বিভিন্ন মহলের প্রতিক্রিয়া*	১৭৭
* *বিডিআর পুনর্গঠন*	১৮১
* *তদন্ত কার্যক্রম*	১৮৯
* *কিছু পরামর্শ*	১৯৭
* *উপসংহার*	২০৫
পরিশিষ্ট	**(২১৩-২২০)**
* *নেহেরু'র চিঠি*	২১৫
* *গণহত্যার কিছু ছবি*	২১৭

www.pathagar.com

www.pathagar.com

১ বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক

- তিক্ত অতীত
- বিষময় সহযোগিতা
- বাংলাদেশ বিরোধী কার্যক্রম
- ভারতের বাংলাদেশ ভীতি

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ও দালিলিক প্রমাণাদি সাক্ষ্য দেয় যে, স্থানীয় হিন্দুরা বিশেষতঃ পলাশী যুদ্ধের পর থেকে শতাব্দীর পর শতাব্দী একান্ত প্রতিবেশী হিসেবে সহাবস্থানকারী মুসলমানদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিশ্বাসঘাতকতার ও দেশেদ্রোহিতামূলক নীতি গ্রহণ করে। পলাশী যুদ্ধে বাংলার স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌল্লার পরাজয়কে হিন্দু ধনিক শ্রেণী ও বুদ্ধিজীবীরা তাদের সৌভাগ্যের প্রবেশদ্বার হিসেবে স্বাগত জানায়। ইংরেজদের বশ্যতা মেনে নিয়ে পরাধীনতার শৃংখল পরতে তাদের বিবেকে লাগেনি। এ বিষয়টি মূল্যায়ন করে ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করেছেন, "বাংলাদেশের তৎকালীন ব্রিটিশ বাংলার জনসাধারণ (অর্থাৎ হিন্দুরা-লেখক) বিদ্রোহী সিপাহীদের প্রতি কোনও সহানুভূতি দেখায় নাই। তৎকালীন শিক্ষিত সমাজ ইহাকে কোনও জাতীয় অভ্যুত্থান বা ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রাম বলে মনে করে নাই।"[১]

সে যুগের প্রখ্যত কবি ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় ১৮৫৭ সালের ২০ শে জুন তারিখে প্রকাশিত মন্তব্যে বলা হয়, "কয়েক দল অধার্মিক অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হিতাহিত-বিবেচনাবিহীন এতদ্দেশী সেনা অধার্মিকতা প্রকাশপূর্বক রাজবিদ্রোহী হওয়াতে রাজ্যবাসী শান্ত স্বভাব অধন সধন প্রজামাত্রেই দিবা-রাত্র জগদীশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছেন,"এই দন্ডেই হিন্দুস্থানে পূর্ববৎ শান্তি স্থাপিত হউক। হে বিঘ্নহর! তুমি সমুদয় বিঘ্নহর, সকল উপদ্রব নিবারণ করে... যাহারা গোপনে অথবা প্রকাশ্যরূপে এই বিষমতর অনিষ্ট ঘটনার ঘটক হইয়া উল্লেখিত জ্ঞানান্ধ সেনাগণকে কুচক্রের দ্বারা কুপরামর্শ প্রদান করিয়াছে ও করিতেছেন তাহাদিগে দণ্ডদান কর। তাহারা অবিলম্বেই আপনার অপরাধ বৃক্ষের ফল ভোগ করুক।" বৃটিশদের মতো একটা পরাশক্তির পক্ষে এর চেয়ে বড় ধরনের দালালী আর কি হতে পারে?

এখানেই শেষ নয়। সে আমলের কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী মহলের মনমানসিকতার প্রতিধ্বনি করে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার সম্পাদক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আরও লিখলেন," এই রাজই (ইংরেজ রাজত্ব) তো রাম রাজ্যের

---

[১] বাংলাদেশের ইতিহাস আধুনিক যুগঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদান, ১৩৭৮।

www.pathagar.com

ন্যায় সুখের রাজত্ব হইয়াছে, আমরা যথার্থরূপ স্বাধীনতা সহযোগে পদ, মন্ত বিদ্যা এবং ধর্ম, কর্মাদি সকল প্রকার সাংসারিক সুখে সুখি হইয়াছি, কোন বিষয়ইে ক্লেশের লেশমাত্র জানিতে পারি না, জননীর নিকট পুত্রেরা লালিত পালিত হইয়া যদ্রুপ উৎসাহে ও সাহসে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া অন্তকরণে কৃতার্থ করেন, আমরাও অবিকল সেইরূপে পৃথিবীশ্বরী ইংলন্ডেশ্বরী জননীর নিকটে পুত্রের ন্যায় প্রতিপালিত হইয়া সর্বমতে চরিতার্থ হইতেছি।"

একই দিনে (২০শে জুন ১৮৫৭) পন্ডিত গৌরী শংকর ভট্টচার্য সম্পাদিত এবং কোলকাতা থেকে প্রকাশিত 'সংবাদ ভাস্কর' পত্রিকার মন্তব্য আরও ভয়াবহ, চাঞ্চল্যকর ও লজ্জাকর। সম্পাদক পন্ডিত গৌরী শংকর লিখেছেন, " হে পাঠক সকল, ঊর্ধববাহু হইয়া পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া জয় ধ্বনি করিতে করিতে নৃত্যকর... আমাদিগের প্রধান সেনাপতি মহাশয় সসজ্জ হইয়া দিল্লী প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছেন, শত্রুদিগের মোর্চা শিবিরাদি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছেন, তাহারা বাহিরে যুদ্ধে আসিয়াছিল আমাদের তোপমুখে অসংখ্য লোক নিহত হইয়াছে, রাজসৈন্যরা নূন্যধিক ৪০ তোপও শিবিরাদি কাড়িয়া লইয়াছেন, হতাবশিষ্ট পাপিষ্ঠারা দুর্গ প্রবিষ্ট হইয়া কপাট রুদ্ধ করিয়াছে। আমাদের সৈন্যরা দিল্লীর প্রাচীরে উঠিয়া নৃত্য করিতেছে।"

এছাড়া তৎকালীন বৃটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশেন এবং বাঙালি ব্যক্তিত্বদের মধ্যে কিশোরী চাঁদ মিত্র, শম্ভু চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ প্রকাশ্যেই মন্তব্য করেছেন যে, সিপাহী বিদ্রোহ হচ্ছে সিপাহীদের ব্যাপার এবং এর সংগে জনসাধারণের (অর্থাৎ হিন্দুদের) কোনই সম্পর্ক নেই।' আশ্চার্যের বিষয় এই যে, ঊনবিংশ শতব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী মহলের কেউই এমনকি পরোক্ষভাবেও সিপাহী বিদ্রোহের পক্ষে কোনও কথাই বলেননি। আধুনিক যুগের ভাষায় এঁদের 'হিন্দু রাজাকার' নামে আখ্যায়িত করা যায়।[২]

হিন্দুদের এভাবে পরাধীনতা বরণ এবং পরবর্তীকালে উপমহাদেশে কোম্পানী ও ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসন বিস্তৃত, সুদৃঢ় ও প্রলম্বিতকরণে হিন্দুদের দেশদ্রোহিতামূলক নিলর্জ্জ ভূমিকা মূলতঃ মুসলিম বিদ্বেষী জজবা থেকে

---

[২] এম আর আখতার মুকুল: কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণী: সাগর পার্বলিসার্স, ঢাকা, পৃ: ৩৩, ১৯৮৭।

www.pathagar.com

উৎসারিত।

ফলে উপমহাদেশের মুসলমানদেরকে দুই শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছে। বিদেশী শাসক ইংরেজ এবং তাদের দালাল স্বদেশী হিন্দু। উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসন উৎখাতের উদ্দেশ্যে মুসলমানদের পরিচালিত সব আন্দোলন, প্রতিরোধ ও লড়াইকে হিন্দুরা তাদের স্বার্থ ও কর্তৃত্বের পরিপন্থী হিসেবে বিবেচনা করে সেগুলো ব্যর্থ করে ব্রিটিশ শাসন প্রলম্বিত করতে যারপরনাই চেষ্টা চালায়। ফলে মুসলামানরা শাসক ব্রিটিশ এবং তাদের এদেশীয় 'চর'ও দালাল হিন্দুদের হাতে চরমভাবে নির্গৃহীত হয়। যদিও এই হিন্দুরাই সমগ্র মুসলিম শাসনামলে সর্বোচ্চ সুবিধাদি ভোগ করে। ব্রিটিশ শাসকদের আনুকল্য প্রাপ্ত হিন্দুদের মনস্তত্বে মুসলিম বিরোধী এমন অনুভূতিও ধারনা সৃষ্টি হয় যে, মুসলমানরা হিন্দুদের তুলনায় হীনতর ও নিকৃষ্টতর। সুতরাং মুসলমানরা হিন্দুদের সমপঙক্তীয় নয় বিধায় তারা (মুসলমান) হিন্দুদের মতোই সম সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার ভোগ করার অধিকার পেতে পারে না। তাদের অনেকে দাবী করে, মুসলামানরা হিন্দুদের মধ্যে সর্বনিম্ন বর্ণের শূদ্রদের চেয়েও নীচ ও অপবিত্র । সুতরাং মুসলমানদেরকে অবশ্যই পুনরায় হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত হতে হবে কিংবা আরব ভূমিতে ফেরত যেতে হবে যেখানে তাদের ধর্মের আর্বিভাব ঘটে এবং যে স্থান থেকে মুসলমানরা কালক্রমে ভারতে আসে।

এমনকি তথাকথিত উদার হিন্দু এবং বুদ্ধিজীবীরা তাদের ব্রিটিশ প্রভুদের সহযোগিতায় মুসলমানদেরকে সার্বিক সুবিধা হতে বঞ্চিত রেখে কোনঠাসা করে রাখে। অধিকার বঞ্চিত মুসলিম সমাজ ব্রিটিশ সরকার তো বটেই, হিন্দুদের হাতে নানাভাবে লাঞ্চিত ও অপমানিত হয়। অন্যদিকে মুসলমানদের স্বার্থের অনুকূলে কালেভদ্রে ব্রিটিশ সরকার কোন পদক্ষেপ নিলে হিন্দুরা সাথে সাথে প্রতিহত করতে মাঠে নামে। এমনকি ব্রিটিশদের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রিটিশ স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের হিন্দু নেতৃবৃন্দ মুখে নিজেদেরকে 'ধর্ম নিরপেক্ষ ও উদার' হিসেবে দাবী করলেও বাস্তবে তারা ছিল কট্টর সম্প্রদায়িক ও ধর্মান্ধ। তারাও তাদের পূর্বসূরীদের মতো বিশ্বাস করতো যে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পরেও অবিভক্ত অখন্ড স্বাধীন ভারতে মুসলমানরা কোন ক্ষেত্রেই হিন্দুদের মতো সমঅধিকার পাওয়া উচিত নয়। অবশ্য হিন্দু নেতৃত্ব ও নীতি-নির্ধারকদের এ অমূলক আপোষহীন নীতি

www.pathagar.com

মুসলমানদের পৃথক আবাসভুমি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধিতে সাহায্য করে। হিন্দুরা উপমহাদেশ বিভক্তির মুসলিম দাবীর তীব্র বিরোধিতা করে ব্রিটিশ শাসন অবলুপ্তির পরও অখন্ড ভারত প্রতিষ্ঠার দাবী ও যুক্তিতে অনড় থাকে। বহু মুসলিম নেতা, এমনকি হিন্দুদের ভাষায় হিন্দু-মুসলিম সংহতির 'ঐক্যের দূত' কায়েদ-ই-আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহও হিন্দু- মুসলিমদের সম-অধিকারের ভিত্তিতে ভারতকে 'অখন্ড' রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু হিন্দু নেতৃবৃন্দ বিশেষতঃ গান্ধী, নেহেরু প্যাটেল, ক্রিপালিনী, প্রমুখ তাদের মুসলিম বিদ্বেষী সম্প্রদায়িক মানসিকতা ও পরিকল্পনার উর্ধ্বে উঠতে পারেননি বিধায় তারা জিন্নাহ'র হিন্দু-মুসলিমের সমানাধিকার ভিত্তিক অখন্ড ভারত প্রতিষ্ঠার দাবী মেনে নেয়নি। এই অবস্থায় মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ছাড়া মুসলমানদের সামনে অন্য কোন বিকল্প ছিলনা।

হিন্দুদের সার্বিক বিরোধিতা সত্বেও মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাসভূমি প্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠলে তৎকালীন হিন্দু নীতি-নির্ধারকরা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে পূর্ববাংলা, পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সমন্বয়ে পাকিস্তান সৃষ্টির দাবী মেনে নেয়। এখানে উল্লেখ্য যে, তারা ভারত-পাকিস্তানের বাইরে পৃথক অখন্ড স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার দাবী কেবল প্রত্যাখ্যানই করেনি বরং উপমহাদেশ ভাগ করে পৃথক মুসলিম আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার শর্ত হিসেবে বাংলা ও পাঞ্জাবের বিভক্তি আবিশ্যিক হিসেবে জুড়ে দেয়। উল্লেখ্য যে, ১৯৪৭ সালে হিন্দুরা বাংলা বিভক্তির পক্ষে জোরালো আন্দোলন, এমনকি কলিকাতায় হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রাদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাত ঘটালেও ১৯০৫ সনে এদেরই পূর্বসূরীরা তৎকালীন বাংলাদেশ ভাগ করে আসাম ও পূর্ববঙ্গের সমন্বয়ে ঢাকাকে রাজধানী করে নতুন প্রদেশ গঠনের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন, অসহযোগ ও মুসলিম-বিরোধী দাঙ্গায় লিপ্ত হয়। এ স্ববিরোধিতার মূল কারণ তাদের ধারণামতে ১৯০৫ সনে বাংলা বিভক্ত হলে আর ১৯৪৭ সনে বাংলা অবিভক্ত থাকলে মুসলমানরাই উপকৃত আর হিন্দুরা ক্ষতিগ্রস্থ হতো।

স্মরণযোগ্য যে, সমুদয় হিন্দু নেতৃবৃন্দ, বিশেষতঃ গান্ধী ও নেহেরু পাকিস্তান সৃষ্টি মেনে নিলেও সর্বদা অবিভক্ত, ঐক্যবদ্ধ ভারতের স্বপ্ন দেখেছেন এবং সে লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য কাজ করেছেন। ২৩ মে ১৯৪৭ সনে নেহেরু তৎকালীন

www.pathagar.com

ত্রিপুরা (বর্তমানে কুমিল্লা)'র কংগ্রেস দলীয় জেলা সভাপতি আশরাফউদ্দিন চৌধুরীকে লেখা এক চিঠিতে পাকিস্তান সৃষ্টির শর্ত হিসেবে বাংলা ও পাঞ্জাব বিভক্তির মূল রহস্য তুলে ধরেন। নেহেরু লিখেছেনঃ

"The Congress has stood for the Union of India and still stands for it. But we have previously stated that we are not going to compel any part against its will. If that unfortunately leads to a division, then we accept it. But inevitably such a division must mean a division also of Bengal and Punjab. That is the only way to have a united India soon after. If we can have a united India straight-way without such division, that will, of course, be very welcome."

("কংগ্রেস ভারতীয় ইউনিয়নের জন্য লড়েছে এবং এখনো সে লক্ষ্যে লড়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা ইতোপূর্বে বলেছিলাম আমরা কোন অংশকেই তাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে যেতে বাধ্য করছিনা। যদি তা দুর্ভাগ্যক্রমে (উপমহাদেশ) বিভক্তি ঘটায়, আমরা তা মেনে নেব। কিন্তু সে বিভক্তি আবিশ্যিকভাবে বাংলা ও পাঞ্জাবের বিভক্তিকেও বুঝাবে। উহাই হলো একমাত্র পন্থা যার মাধ্যমে তেমন বিভক্তি (বাংলা-পাঞ্জাব) ব্যতিরেকে আমরা সরাসরি অখন্ড ভারত পেয়ে যাই, তবে তা অবশ্যই হবে অতীব অভিনন্দনযোগ্য।)

ল্যাবি কলিন এবং ডমিনিক ল্যাম্পিয়ার তাদের 'Mount Batten & The Partition of India' শীর্ষক গ্রন্থে মাউন্ট ব্যাটেনের বক্তব্য এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, নেহেরু স্বাধীন অবিভক্ত বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে হিন্দু মহাসভার আপত্তির প্রতি সমর্থন দিয়েছিলেন। দুই লেখকই যৌথভাবে রচিত তাদের গ্রন্থে মাউন্ট ব্যাটেনের বক্তব্যকে এভাবে উল্লেখ করেছেনঃ

"Pundit Nehru has stated that he would not agree to Bengal being independent. ..... In his opinion, East Bengal was likely to be a great embarrassment to Pakistan. Presumably, Pundit Nehru considered East Bengal bound sooner or later to rejoin India."

(পন্ডিত নেহেরু বলেছেন বাংলা স্বাধীন রাষ্ট্র হোক তাতে তিনি একমত হবেন না। . . . . . তার মতে, পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের জন্য চরম বিব্রতকর হবে। বিনা প্রমাণেই তিনি মনে করতেন পূর্ববঙ্গ আজ হোক কাল হোক ভারতে পুন:সংযুক্ত হতে বাধ্য।)

উপমহাদেশ বিভক্তির অব্যবহতি পরে ১৯৪৭ সনে কংগ্রেসের তৎকালীন

www.pathagar.com

সভাপতি আচার্য কৃপালিনীর মন্তব্য:
"Neither the Congress nor the nation has given up to its claim of United India."
(না কংগ্রেস না (হিন্দু) জাতি ঐক্যবদ্ধ ভারতের দাবী পরিত্যাগ করেছে।)
ভারতের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভল্লব ভাই প্যাটেল ১৯৪৭ সনেই তাদের স্বপ্নের পুনরাবৃত্তি করে বলেছেন:
"Sooner than later, we shall again be united in common allegiance to our nation."
(আজ হোক কাল হোক আমরা আমাদের জাতির প্রতি সাধারণ আনুগত্যতার মাধ্যমে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হব।)
উপরোল্লিখিত এবং অন্যান্য হিন্দু নেতৃবৃন্দের একই ধরনের অসংখ্য বক্তব্য-বিবৃতি বাংলাদেশের পৃথক স্বাধীন সার্বভৌম অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। অখন্ড ভারত কিংবা কল্পিত রামরাজ্যের গোপনীয় কথিত মানচিত্রে বাংলাদেশ নামক কোন পৃথক রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নেই। ঐতিহাসিকভাবে হিন্দুরা বিশেষত: বাংলাভাষী হিন্দুরা বাংলাভাষী মুসলমানদেরকে তাদের জানি দুশমন মনে করে এবং এরা বাংলাভাষী মুসলমানদেরকে কখনই বাঙালী বলে স্বীকার করে নি।
তাদের দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য ভারতীয় নীতি নির্ধারকরা ইন্ডিয়া ডকট্রিন (ভারত তত্ত্ব), গুজরাল ডকট্রিন (গুজরাল তত্ত্ব) 'গ্রেটার ইন্ডিয়া থিওরী (বৃহৎ ভারত তত্ত্ব), রিসারেকশন অব ইন্ডিয়া (ভারত পুনর্জীবিতকরণ তত্ত্ব) প্রভৃতির উদ্ভাবন করে।
দক্ষিণ এশীয়াঞ্চলের আফগানিস্তান হতে মায়ানমার পর্যন্ত সব স্বাধীন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব অস্বীকার করে ভারতীয় নেতৃত্ব ১৯৪৭ হতে তাদের স্বপ্ন ও কল্পিত অখন্ড ভারত তত্ত্ব বাস্তবায়নের জন্য অবিচল নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। ১৯৭১ সনে ভারতের পৃষ্ঠপোষকতায় পাকিস্তানের বিভক্তিকে ভারতীয় নীতি-নির্ধারকরা অখন্ড ভারত প্রতিষ্ঠার পথে ইতিবাচক অগ্রগতি হিসেবে বিবেচনা করেন। বাংলাদেশ, নেপাল, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, শ্রীলংকা প্রভৃতি দেশে চলমান বিবদমান সংকট ও সমস্যা অখন্ড ভারত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নয়াদিল্লী কর্তৃক উদ্ভাবিত ও প্রযোজিত চক্রান্তের প্রতিফলন বিশেষ।
গত ৩৮ বছর (১৯৭১-২০০৯) ধরে ভারত পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে

www.pathagar.com

আমাদেরকে ভারতের সাথে একীভূত হবার পরামর্শ দিয়ে আসছে। ১৯৯৪ সনে বাংলাদেশে তথাকথিত পঙ্গু অর্থনীতি এবং অস্থিরতার ওপর প্রকাশিত এক দীর্ঘ নিবন্ধে নির্লজ্জভাবে নিম্নোক্ত পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

"নির্মম সত্য ও বাস্তবতাকে অনুসরণ করে বাংলাদেশের জনগণের উচিত ভারতের সাথে মিশে যাবার দাবী তোলা।"[৩]

এর আগে ১৯৯২ সনের ২৮ ফেব্রুয়ারী ঢাকায় অনুষ্ঠিত দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতার বিষয়ে এক সেমিনারে একই পরামর্শের পুনরাবৃত্তি করে কংগ্রেস নেতা এবং কলকাতার 'দৈনিক আজকাল' এর তৎকালীন সম্পাদক মায়ারাম সার্জন বলেন, যদি ইউরোপ ঐক্যবদ্ধ হতে পারে, তবে আমরা কেন ১৯৪৭-পূর্ব ভারতে ফিরে যেতে পারি না।"

ভারতীয় নেতৃত্বের বিশ্বাস দক্ষিণ এশিয়া একটি কৌশলগত একক (ইউনিট) যা ভারতের স্বার্থ ও প্রয়োজনানুযায়ী পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে। ভারতীয়রা অযৌক্তিক ধারণার ওপর ভিত্তি করে মনে করছে যে, ভারতের জাতীয় স্বার্থের সাথে সংগতিপূর্ণ করে এই অঞ্চলের জন্য নীতি ও কর্ম-প্রণালী প্রণয়নের অধিকার ও কর্তৃত্ব ভারতের রয়েছে। তাদের কেউ কেউ এমনও ভাবেন যে, ভারতের স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর এমন যে কোন দেশ আক্রমণের অধিকার ভারতের রয়েছে। যে কোন ধরনের সংকট হতে শেখ হাসিনাকে রক্ষা করার ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রণব মুখার্জির প্রকাশ্যে ঘোষণা এ ধরনের তত্ত্ব বাস্তবায়নে দৃঢ়তার বহির্প্রকাশ বিশেষ।

ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সুনির্দিষ্ট নীতি হলো বাংলাদেশকে সমস্যার পর সমস্যায় জড়িয়ে ফেলা। তারা কখনও বন্ধুসুলভ প্রতিবেশী হতে চায়নি। সদয় উদার প্রতিবেশীর ভূমিকা পালন এবং স্বচ্ছ ব্যবসা বাণিজ্যের উৎসাহ প্রদানের পরিবর্তে দু'দেশের মধ্যে অনাহুত বিরোধ সৃষ্টি করে সম্ভাব্য সব ক্ষেত্রে আমাদের বিপদাপন্ন অবস্থায় ফেলেছে। ভারত বারংবার আন্তর্জাতিক নীতিমালা ও ন্যায়নীতি লঙ্ঘন করে মরুকরণসহ বাংলাদেশের বিবিধ বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কথা বিবেচনায় না এনে আন্তর্জাতিক নদীসমূহের উজানে অসংখ্য বাঁধ নির্মাণ করেছে। ভারত সরকার বাংলাদেশে ফেনসিডিল ও অন্যান্য মাদকদ্রব্যের মরণাত্মক প্রতিক্রিয়া কেমন ভয়াবহ হবে তা অনুভব করে

---

[৩] মুসলিম জাহান, ঢাকা, ৩ জানুয়ারী, ১৯৯৫।

www.pathagar.com

একেবারে জ্ঞাতসারে বাংলাদেশ সীমান্ত-সংলগ্ন ভারতীয় ভূখন্ডে ফেনসিডিল ও অন্যান্য মাদকদ্রব্যের অসংখ্য কারখানা স্থাপন করেছে। বিএসএফ কিছু সংখ্যক অসৎ বিডিআর সদস্য এবং চোরাচালানীদের সহযোগিতায় বাংলাদেশে ফেনসিডিল এবং অন্যান্য নেশাজাতীয় দ্রব্যের এজেন্ট ও বাহকদের মাধ্যমে এগুলো বাংলাদেশে ঠেলে দিচ্ছে।[৪]

বাংলাদেশ ভারতের বহুমূখী আগ্রাসী নীতির শিকার। পিলখানায় সংঘটিত বিপর্যয় সে আগ্রাসী চক্রান্তের প্রতিফলন। ভারতীয় নাগরিক অরবিন্দ দয়াল তার সাম্প্রাতিক 'পাকিস্তান টু বার্মা : রিবার্থ অব ইন্ডিয়া' শীর্ষক উপন্যাসে পরিস্কারভাবে ভবিষ্যদ্বানী করেছেন কিভাবে পাকিস্তান থেকে মায়ানমার পর্যন্ত সবদেশ ভারতীয় নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে, যাকে তিনি পুন-একত্রিত ভারত বলে অভিহিত করেছেন।

বিডিআর সদর দফতরে এ বিপর্যয় কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বরং ভারত কেমন নির্মম পন্থায় বাংলাদেশ দখলের কূটকৌশল ও চক্রান্ত বাস্তবায়ন করবে– ইহা তারই মহড়া বিশেষ। এই মহড়া দেখিয়েছে কেমন কৌশলে ও ধবংসাত্মকভাবে ভারতীয় হায়েনারা তাদের বাংলাদেশী চক্ষশূলদের নির্মূল করবে।*

---

[৪] Yasmin Bhuyan, March 2,
uttp//www.amardeshbd.com/dailynews.datail_news_index.php?newsType=bistorito&section/D=home&news/D=214002.

www.pathagar.com

বিষময় সহযোগিতা

এটা ভাগ্যের নির্মম পরিহাস যে, ঐতিহাসিকভাবে আমাদের পূর্ব-পুরুষদের প্রতিপক্ষ ১৯৭১ সনে আমাদের সহযোগী ও মিত্র হিসেবে আর্বিভূত হয়েছে। বাংলাদেশে ভারতপন্থী ব্যক্তিবর্গ তাদের স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে ভারতীয় ব্যাক্ষ্রণ্যবাদী নীতি-নির্ধারকদের মুসলিম-বিরোধী তীব্র বিদ্বেষ, নীতি, চক্রান্ত ও কার্যক্রম উপেক্ষা করে ও বিস্মৃত হয়ে ১৯৭১ সনে আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধে ভারতের উদ্দেশ্যেমূলক সহযোগিতার কথা বার বার জাতির কাছে রোমন্থন করে এবং ভারতকে আমাদের দুর্দিনের বন্ধু হিসেবে চিহ্নিত করে। অথচ ভারতের বাংলাদেশ-বিরোধী বিবিধ কার্যক্রম ইতোমধ্যে এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছে যে, ১৯৪৭ সন হতেই ভারতের একমাত্র দুরভিসন্ধি ছিল উপমহাদেশের মুসলিম শক্তিকে দুর্বলতর করা। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই ১৯৭১ সনে ভারত আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। তাতে তাৎক্ষণিক ভাবে না হলেও কালক্রমে মুসলিম-প্রধান পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) ও এর চির প্রতিদ্বন্দ্বী পশ্চিম পাকিস্তান (বর্তমান পাকিস্তান) গিলে ফেলে নিজেকে দক্ষিণ এশীয় এবং ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। ১৯৭১ সনে ভারত বাস্তব অর্থেই আংশিকভাবে হলেও তার কৌশলগত এ উদ্দেশ্য অর্জনে সক্ষম ও সফল হয়েছে। কেউই এখন আর এই বাস্তবতা অস্বীকার করছেন না যে, পাকিস্তানের বিভক্তি এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয় ভারতের আত্মবিশ্বাস এবং গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামরিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে সহায়ক উপাদান হিসেবে ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশকে পদানত করতে ভারত ১৯৭১ সনেই পরস্পর বিরোধী দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করে। প্রকাশ্যে সে আমাদের বন্ধু ও সহযোগী, আর গোপনে শত্রু প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে কাজ করে। সে আমাদের আশ্রয় দেয়, কিন্তু বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে আমাদের জন্য পাঠানো অর্থ ও অন্যান্য সাহায্য-সামগ্রীর সিংহভাগ আত্মসাৎ করে। সাধারণ মানুষতো দুরের কথা, এমনকি অধিকাংশ শিক্ষিত বাংলাদেশীরাও ভারতের এই গোপন নীতি ও চক্রান্ত অনুধাবন করতে পারেননি, কেন ভারত তার চিরশত্রু মুসলিম জন গোষ্ঠীর প্রতি সাহায্যের এমন উদার হস্ত সম্প্রসারিত করেছে। বস্তুতঃ বাংলাদেশের সীমান্ত অতিক্রম করার পরপরই ভারত তার নির্ধারিত অরি-সুলভ

www.pathagar.com

কূট-চক্রান্ত বাস্তবায়নে উদ্যত হয়। আমরা ভারতের ভিন্ন চেহারা দেখতে পেলাম। সে আমাদের ভেতরেই আমাদের শত্রু তৈরি করে আমাদেরকে পরস্পরের শত্রুতে পরিণত করল। সে আমাদের এক গ্রুপকে অন্য গ্রুপের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিল। স্বাধীন বাংলাদেশকে আষ্ঠেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলার উদ্দেশ্যে সে মুজিব অনুসারীদের মুজিব বাহিনী ও মুক্তি বাহিনী নামে দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরে বিভক্তি করে। আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সম্মুখ-সারির নেতা-কর্মীদের সমন্বয়ে মুজিব বাহিনী গঠন করা হয়, যার সদস্যরা ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে নিয়ন্ত্রণে ও নির্ধারিত ছকানুযায়ী গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেয়। ভারতে অবস্থানকারী তৎকালীন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের ওপর মূলত চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই বিকল্প ফ্রন্ট হিসেবে মুজিব বাহিনীর অভ্যুদয় ঘটানো হয়।[১]

প্রবাসী সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ভারত সরকার বারংবার সর্তক করে দেয় যে ভারতের পরামর্শ অনুযায়ী ভারতের চাহিদা পূরণে রাজি না হলে প্রবাসী সরকারকে প্রদত্ত সহযোগিতা ও সমর্থন প্রত্যাহার করে মুজিব বাহিনীর চার আঞ্চলিক অধিনায়ক ছাত্রলীগের সাবেক নেতা সর্বজনাব সিরাজুল আলম খান, শেখ ফজলুল হক মনি, আব্দুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমেদের নেতৃত্বে নতুন প্রবাসী সরকার গঠিত হবে। এ উদ্দেশ্যেই শেখ মনি, আব্দুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ, আ. স. ম আব্দুর রব, নূরে আলম সিদ্দিকী, শাহজাহান সিরাজ, ইসমত কাদির গামা, শরীক নুরুল আম্বিয়া, হাসানুল হক ইনু এবং অন্যান্যরা ছাত্র সমাবেশে বিশেষতঃ মুজিব বাহিনীর প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে ভারতে আশ্রিত প্রবাসী সরকার, পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের ও পুর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য এবং আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের দুর্নীতি ও কু-কীর্তি তুলে ধরে জ্বালাময়ী বক্তব্য রাখতেন। ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ এমনকি এমন হুমকিও দিতেন যে, পাকিস্তান হতে মুক্ত হবার পরে স্বাধীন বাংলাদেশে তাদেরকে ঢুকতে দেয়া হবে না।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে ভারত কেমন জঘন্য নোংরা খেলায় নেমেছে এই

---

[১] বিস্তারিত তথ্যের জন্য মাসুদুল হক রচিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র' ও সিআইএ এবং ভারতীয় সাংবাদিক অশোক রায়নার 'Inside Raw Today: The History of India's Secret Service' দেখুন।

www.pathagar.com

বাস্তবতা অনুধাবন করতে বহু আওয়ামী লীগ নেতা অনেক দেরী করে ফেলেছেন। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে মূলতঃ উভয় সংকটে নিক্ষেপ করা হয়েছে। দেশকে স্বাধীন করতে তারা না পারছিলেন ভারতের অসম অগ্রহণযোগ্য পূর্বশর্ত মেনে নিতে, না পারছিলেন চরম পরিণতির মুখে পড়ার শংকায় স্বদেশ পূর্ব পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তন করতে। উপায়ান্তর না দেখে আওয়ামী নেতৃবৃন্দ ভারতের কাছে নতি স্বীকার করে বিষপান করার মতোই ভারতের স্বার্থ, সুবিধা ও চাহিদা মোতাবেক মৈত্রী ও সহযোগিতার আবরণে বশ্যতামূলক চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন। মুজিব অনুসারীরা ভারতে গিয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকলে হয়তো এমনটি হতো না।

উল্লেখ্য, মুক্ত বাংলাদেশে ভারতের অপ্রকাশ্য কাজ ছিল যতো বেশী সংখ্যক সম্ভব মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করা, তাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধী বিভাজন-বিভক্তি সৃষ্টি করা, যাতে তারা একে অপরকে হত্যা করে। ভারতীয় নেতৃত্বের মাথায় এই ভীতি সব সময় সক্রিয় যে, সুসংবদ্ধ ও অটুট মুক্তিযোদ্ধারা ভারতের ঐক্য ও সংহতির জন্য চরম মাথা ব্যথা এবং বাংলাদেশকে গ্রাস কিংবা নিদেন পক্ষে করদরাজ্যে পরিণত করার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

স্বাধীন বাংলাদেশে ভারত মুজিব বাহিনীর সম্মুখ সারির মোড়লদের দুটো বিবদমান শিবিরে বিভক্ত করে ফেলে। একাংশ শেখ মুজিব সরকারের সাথে থেকে যায়, অন্যাংশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) নামে নতুন রাজনৈতিক শিবির গঠন করে। প্রথমাংশের দায়িত্ব ছিল শেখ মুজিব পর্দার অন্তরালে কি কাজ করছেন এবং ভারতের ভূ-আর্থিক কৌশলগত স্বার্থের পরিপন্থী কোন পদক্ষেপ নিচ্ছেন কিনা তা মনিটর করত: তা বন্ধ করতে সচেষ্ট থাকা। আর দ্বিতীয় গ্রুপের দায়িত্ব ছিল মুজিব সরকারের ব্যর্থতা এবং আওয়ামী নেতাকর্মীদের দুর্নীতি ও নানাবিধ অপকর্মের বিরুদ্ধে জনগণকে ক্ষেপিয়ে তোলা এবং শেখ মুজিবকে ভারতপন্থী, ব্যর্থ, গণবিরোধী, দুর্নীতিপরায়ণ, স্বৈরাচারী হিসেবে চিহ্নিত করা। অনতিবিলম্বে 'গণবাহিনী' নামে জাসদের সামরিক শাখা গঠিত হয়, যা শ্রেণী শত্রু নিধনের নামে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে গুপ্ত হত্যা শুরু করে। 'গণবাহিনী'কে নির্মূল করার জন্য পুলিশ বিডিআর সেনাবাহিনী থাকা সত্বেও সরকার রক্ষী বাহিনীকে মাঠে নামায়, যা জাসদের দাবী মতে ৩০ হাজার মুজিব বিরোধীকে খুন করে যাদের অধিকাংশই ছিল মুক্তিযোদ্ধা এবং এদের প্রায় সবাই ছিল সৎ

www.pathagar.com

মেধাবী প্রতিশ্রুতিশীল শিক্ষার্থী যারা তৎকালীন সময়ে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, লাগামহীন দুর্নীতি, অপশাসন ও নির্যাতন ও ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। গণবাহিনীর হাতে কত সংখ্যক মানুষ খুন হয়েছে তার কোন পরিসংখ্যান জানা যায়নি। এভাবে ভারত আমাদেরকে দিয়ে আমাদেরকে খুন করিয়েছে। এটা যেন কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা প্রবাদের বাস্তবায়ন।

ভারতের বাংলাদেশ বিরোধী দীর্ঘমেয়াদী চক্রান্ত এবং পরিকল্পনা স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং তৎপরবর্তীকাল থেকে প্রাপ্ত বৈধ-অবৈধ বিবিধ সুবিধাদি আড়ালে রেখে ভারত এবং তার এদেশীয় তাবেদাররা কেবলমাত্র ১৯৭১ সনে প্রদত্ত উদ্দেশ্যমূলক সহযোগিতার কথা বারবার উচ্চারণ করে। আমরা কখনোই মুক্তিযুদ্ধকালীন ভারতের সহযোগিতার কথা অস্বীকার করতে চাইনা। কিন্তু ভারত কখনোই স্বীকার করে না আমাদের মুক্তিযুদ্ধ এবং পরবর্তীকালীন বাংলাদেশ হতে তারা কি পরিমাণ ফায়দা লুটেছে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ কোন ভাবেই ভারতের জন্য লাভহীন কিংবা উদ্দেশ্যহীন উদ্যোগ নয়। ইহা ভারতের জন্য সৌভাগ্যের দুয়ার খুলে দিয়েছে। পাকিস্তান ভেঙ্গে দিতে বাংলাদেশীরাই মুখ্য ভূমিকা রেখেছে, যা ভারতকে আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হবার সুযোগ করে দিয়েছে। এটাই হলো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ থেকে ভারতের শ্রেষ্ঠতম প্রাপ্তি।

অন্যদিকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ মারফত বিশ্বের বিভিন্ন সূত্র হতে প্রাপ্ত নগদ অর্থ এবং সাহায্য ও ত্রাণসামগ্রী মিলিয়ে অগাধ পরিমাণ সম্পদ কুক্ষিগত করার সুযোগ ভারত পেয়েছে। যুদ্ধকালীন সময়ে বিভিন্ন দেশ এবং আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা ও মানবাধিকার গ্রুপের বাংলাদেশী শরণার্থীদের জন্য নগদ অর্থ, ঔষধ, খাবার, শিশুখাদ্য পোশাক-পরিচ্ছদ, কম্বল, গৃহ নির্মাণ সামগ্রীতে ভারত ভরে যায়। তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার কমিউনিস্ট মিত্ররা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অনির্ণীত পরিমাণ যুদ্ধাস্ত্রসহ গোলাবারুদ সরবরাহ করেছে। ভারত এসব সামরিক ও বেসামরিক সামগ্রীর সিংহভাগই আত্মসাৎ করে। অন্যদিকে ভারত সরকার পূর্ব পাকিস্তানে স্তুপীকৃত পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর কোটি কোটি ডলার মূল্যের সমুদয় সমরাস্ত্র, সরঞ্জাম, যানবাহন, যুদ্ধ বিমান, যুদ্ধজাহাজ বাংলাদেশ থেকে ভারতে নিয়ে যায়। তদুপরি, ১৬ ডিসেম্বরের পর বাংলাদেশে ভারতের বাধাহীন অদৃষ্টপূর্ব ও নজির-বিহীন

www.pathagar.com

প্রকাশ্যে লুটপাট দরিদ্র ভারতের দ্রুত আর্থিক ও সামরিক সমৃদ্ধিকরণে যারপরনাই ভূমিকা রাখে। পাটকল, বস্ত্রকল, চিনিকল, ইস্পাত কারখানার সমুদয় যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ গুদাম, কাঁচামাল ও যানবাহন, খাদ্য গুদাম, সাইলো, ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, সোনা, রূপা, বড় বড় মার্কেট ও দোকান লুট করে বড় বড় জাহাজ, কার্গো বিমান, হাজার হাজার লরি বোঝাই করে দিবারাত্র ভারতে পাঠানো হয়। স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগার, টেবিল চেয়ার, ব্ল্যাক বোর্ড এবং আবাসিক বাসগৃহ ও অফিস আদালতের চেয়ারটেবিল, বাসনপত্র, সিলিংপ্যান, রিফ্রিজিরেটর, ওয়াশ বেসিন এবং অন্যান্য টয়লেট সামগ্রী পর্যন্ত লুট করা হয়। বিভিন্ন মহল থেকে এসব সামগ্রীর আনুমানিক মূল্য তৎকালীন মুদ্রামানে ৯০ হাজার কোটি টাকা বলে দাবী করা হয়েছে। সমুদয় যুদ্ধাস্ত্র ও সরঞ্জাম ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনীর তিন শাখায় বিতরণ করা হয়েছে। স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লুট করা সামগ্রী ভারতের 'গাছতলায় বসা' শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করা হয়। খাদ্য সামগ্রী ও অন্যান্য আসবাবপত্র এবং ইলেক্ট্রনিক্স সামগ্রী নিলামে বিক্রি করা হয়। ঢাকায় আত্মসমর্পণকারী পাকিস্তান বাহিনীর ৯৩ হাজার সদস্য ভারতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ভারতের ভূ-কৌশলগত স্বার্থের সাথে সঙ্গতি রেখে অসম চুক্তি স্বাক্ষরে পাকিস্তানকে বাধ্য করা হয়।

১৯৭১ সনে এবং তৎপরবর্তীকালে বাংলাদেশে ভারতের লাঘামহীন চুরি স্বয়ং ভারতীয় লেখক বুদ্ধিজীবীরা এখন পরোক্ষভাবে হলেও স্বীকার করছেন। ভারতীয় কূটনীতিক লেখক জে এন দীক্ষিত লিখেছেন, "আমাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও নেতৃত্ব, সংবাদ মাধ্যম এবং শিক্ষাবিদরা এ ব্যাপারে একেবারে সুস্পষ্ট যে ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জড়িত হয়েছে কেবলমাত্র মানবাধিকার ও রাজনৈতিক কারণেই নয় বরং এর সাথে ভারতের রাজনৈতিক ও কৌশলগত স্বার্থও জড়িত ছিল।"

ভারতকে তার অবৈধ প্রাপ্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মরহুম মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী বলেছিলেন, ভারতের উচিত আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা, আমাদেরকে ভারতের প্রতি নয়। ভারতের উচিত বাংলাদেশ যুদ্ধ থেকে ১৯৭১ সনে এবং তৎপরবর্তীকালে কোন কোন ক্ষেত্রে কিভাবে লাভবান হয়েছে তার একটি ব্যালেন্সশীট প্রস্তুত করা। দারিদ্রাকবলিত ক্ষুধাতুর স্বল্পোন্নত ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কারণে আজকের অবস্থানে পৌঁছতে

www.pathagar.com

পেরেছে। সুতরাং ভারতের উচিত বাংলাদেশের বীর জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা। কেননা আমরা তার জানি শত্রুকে পরাভূত করতে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছি, দরিদ্র ভারতকে সম্পদে ও শক্তিতে সমৃদ্ধ করেছি।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের জড়িয়ে পড়া কোনভবেই বাংলাদেশী জনগণের প্রতি মানবিক চেতনার বহির্প্রকাশ নয়। বরং এর মূল সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য হলো দ্বি-খন্ডিত পাকিস্তানের উভয়াংশে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করা। তৎকালীন ভারতীয় নেতৃবৃন্দের বিশ্বাস ছিল পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান হতে বিছিন্ন করা গেলে তা তাৎক্ষণিক ভারতের সাথে একীভূত হয়ে যাবে। কিন্তু ৩৮ বছর পরেও ভারতের সে স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি। বরং এমন সম্ভবনা এখন সুদূরপরাহত বলেই মনে হচ্ছে। তথাপি ভারত তার স্বপ্ন অটুটু রেখেছে এবং আমাদেরকে ভারতের গোলামে পরিণত করার জন্য নানাবিধ নতুন চক্রান্ত ও সমস্যা সৃষ্টি করে চলেছে।

১৯৭১ সন থেকেই ভারত তার বিভিন্ন প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য চক্রান্ত ও কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রমাণ করেছে যে, সে সার্বিক অর্থে সমৃদ্ধ স্থিতিশীল স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের অস্তিত্ব মেনে নিতে পারছে না। বরং ভারত মনে করে বাংলাদেশকে আপাততঃ পুরোপুরি ভারতভূক্ত করা না গেলেও, নিদেনপক্ষ ভারতীয় আগ্রাসী পাখার নীচে নামিয়ে আনতে হবে। একেবারে শুরু থেকেই ভারতের এমন উদ্দেশ্য ছিল যে, ১৯৭১ সনে প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী মরহুম তাজউদ্দিন আহমদকে স্বল্পালোচিত অথচ মহাবিতর্কিত অসম পূর্বশর্ত-সম্বলিত ৭-দফা চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য করে বাহ্যতঃ পাকিস্তান বাহিনীকে পরাভূত ও আত্মসমর্পণে এর মাধ্যমে একটি তাবেদার সরকার প্রতিষ্ঠা করা। আর অঘোষিত গোপন উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে ভারতীয় সেনাবাহিনী চিরতরে মোতায়েন রাখা। ভারতীয় আমলাদের বাংলাদেশে নিয়োগ দেয়া, বাংলাদেশের পররাষ্ট্র ও বাণিজ্যিক যোগাযোগ ভারত-কেন্দ্রিক করা, ভারতীয় মুদ্রা এদেশে প্রচলন এবং ভারতীয় নাগরিকদের অবাধে যাতায়াতের মাধ্যমে সীমান্তহীন সিকিম-ভূটানসম নামমাত্র সরকার ও পতাকা-সর্বস্ব বাংলাদেশকে একসময়ে পুরোপুরি ভারতের অধীনস্থ করা। **ঐ সাত-দফা চুক্তি দেখুনঃ**

১. বাংলাদেশের জন্য ভারতীয় সামরিক বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে একটি আধা-সামরিক বাহিনী গড়ে তোলা যা নিয়মিত সেনাবাহিনীর (যদিও বাংলাদেশে কোন সেনাবাহিনী থাকবেনা—লেখক) তুলনায় শক্তিধর ও

www.pathagar.com

দক্ষতর হবে।

২. বাংলাদেশ তার সমুদয় সামরিক সরঞ্জাম ভারতীয় সামরিক বিশেষজ্ঞদের পরিকল্পিত তত্ত্বাবধানে ভারত থেকে সংগ্রহ করবে।

৩. বাংলাদেশ তার বৈদেশিক বাণিজ্য ভারত সরকারে তত্ত্বাবধানে ও নিয়ন্ত্রণে পরিচালনা করবে।

৪. ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ তার বার্ষিক ও পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করবে।

৫. বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি অবশ্যই ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির সাথে সুসঙ্গত হতে হবে।

৬. ভারত সরকারের পূর্বানুমতি ব্যতীত বাংলাদেশ এককভাবে (ভারতের সাথে স্বাক্ষরিত) চুক্তি বাতিল করতে পারবে না।

৭. ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী যে কোন সময় বাংলাদেশে প্রবেশ করতে এবং সেখানে সৃষ্ট যে কোন ধরনের প্রতিরোধ বা বাধা নিশ্চিহ্ন করতে পারবে।

স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে বাংলাদেশের জনগণকে প্রদত্ত সমুদয় সাহায্য এবং তথাকথিত মৈত্রী ও সহযোগিতার ধরন ও উদ্দেশ্য কেমন নির্মম ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত ছিল তা অনুধাবনে উপরোক্ত চুক্তির শর্তাবলী বাংলাদেশী এবং বিশ্ব সম্প্রদায়ের জন্য চক্ষু উম্মোচক বিশেষ। গত ৩৮ বছরে ভারতীয় আচরণ ও কার্যক্রমে প্রমাণ করে না যে, ভারতীয় নেতৃবর্গের মানসিকায় সামান্যতম পরিবর্তন এসেছে এবং বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে মেনে নিতে এবং যথাযথ সম্মান প্রদর্শনে তারা আন্তরিকভাবে সম্মত আছে।*

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলাদেশ বিরোধী কার্যক্রম

ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে সব সময় বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারত-বিরোধী সন্ত্রাসী গ্রুপগুলোকে আশ্রয়দানের অস্পষ্ট ও প্রমাণবিহীন অভিযোগ আনতে দেখা যায়। কিন্তু বাংলাদেশ প্রামাণ্য দলিলপত্রসহ ভারতের বিপক্ষে একই ধরনের অভিযোগ তুললে ভারত তাতে কর্ণপাত করেনা। বাংলাদেশ ভারতের অভিযোগের অনুকূলে বিস্তারিত তথ্য ও প্রমাণাদি চাইলে বিএসএফ কিংবা ভারতীয় কর্মকর্তারা সে ধরনের গ্রহণযোগ্য তথ্য কিংবা ছবি উপস্থাপন করতে পারে না, যাতে প্রমাণিত হয় যে বাংলাদেশের মাটিতে ভারত বিরোধী কোন গ্রুপের ঘাঁটি কিংবা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নেই। অবশ্য ভারত সব সময়ই প্রশিক্ষণ শিবির ও গেরিলা ঘাঁটির অবস্থান সংক্রান্ত এমন সব স্থানের নাম ও মানচিত্র উপস্থাপন করে যাদের অস্তিত্ব বাস্তবে নাই। যেসব স্থানে কথিত শিবির আছে বলে দাবী করা হয় বাস্তবে সেগুলো খেলার মাঠ, আবাসিক কলোনী, বিদ্যালয়, হাটবাজার, ধানক্ষেত, পুকুর, নদী, কিংবা বাগান।

অন্যদিকে ভারত ১৯৭২ সন থেকে বাংলাদেশের এক দশমাংশ ভূমি পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাংলাদেশ হতে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে প্রধানতঃ চাকমা উপজাতিভূক্ত সন্ত্রাসীদের অর্থ, আশ্রয় প্রশিক্ষণ, অস্ত্র প্রদানসহ সর্ববিদ সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। উল্লেখ্য, ১৭'শ শতাব্দী হতে পার্বত্য চট্টগ্রামে আশ্রয় গ্রহণকারী ১৩টি উপজাতির সবগুলোই বহিরাগত। এরা পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫১ শতাংশ। অন্যদিকে বাকী ৪৯ শতাংশ বাঙালী। পার্বত্য উপজাতিরা বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র ০.২ শতাংশ।

অন্যদিকে কিছুসংখ্যক ভারতীয় নাগরিককে বাংলাদেশের ২১টি জেলার সমন্বয়ে তথাকথিত স্বাধীন বঙ্গভূমি, হিন্দুল্যান্ড, নতুন বাংলা প্রতিষ্ঠার দাবীতে ভারতে বিশেষতঃ কলিকাতায় প্রকাশ্যে সভা-সমাবেশ, মিছিল, সেমিনার, দীর্ঘ পদযাত্রা করতে দেখা যায়। আর ভারতীয় প্রচার মাধ্যমে তা যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করা হয়। ভারতের মাটিতে ভারত সরকারের পৃষ্টপোষকতায় বাংলাদেশ বিরোধী এমন কিছু প্রকাশ্যে তৎপরতার বিবরণ নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

স্বাধীন বঙ্গভূমি আন্দোলন

বাংলাদেশের আঞ্চলিক সংহতি ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী তথাকথিত স্বাধীন বঙ্গভূমি আন্দোলন ১৯৭৭ সন থেকে চলে আসছে। এর অধীনে কতগুলো

www.pathagar.com

সশস্ত্র গ্রুপ কাজ করছে। এগুলো হলোঃ

১. বঙ্গসেনা
২. বাংলাদেশ লিবারেশন অর্গানাইজেশন (বিএলও)
৩. বাংলাদেশ ফ্রিডম অর্গানাইজেশন (বিওএফ)
৪. লিবারেশন টাইগার্স অব বাংলাদেশ (এলটিবি)

বাংলাদেশের বরিশাল, পটুয়াখালী, খুলনা, যশোর, ফরিদপুর ও কুষ্টিয়া এই ৬টি (যেগুলো বর্তমানে ২১টিতে বিভক্ত) জেলার সমন্বয়ে হিন্দুদের জন্য তথাকথিত হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দশ্যে বঙ্গভুমি আন্দোলন ভারতীয় নাগরিকদের দিয়ে করানো হচ্ছে।

এলটিবি'র প্রশিক্ষণ শিবিরসমূহ

বাংলাদেশী পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন এবং সংশিষ্ট সংস্থার সংগৃহীত তথ্যানুযায়ী জনৈক রমেশ পামওয়ানের তত্ত্বাবধানে পশ্চিম বাংলার চব্বিশ পরগনা জেলার নিম্নোক্ত স্থানসমূহের এলটিবি'র প্রশিক্ষণ শিবিরসমূহ চালানো হচ্ছে[১] ঃ

শিবিরের অবস্থান	পরিচালক	প্রশিক্ষক
বাদুরিয়া	নিতাই গোপাল পাল	মহাদেবপাল,সুকুমার সেন হিরালাল পাল
উত্তর কোটারী পাড়া জাছিকাটি	অতুল সরকার	রবি সরকার, সুসেন সরকার, নিতাই গায়েন,তারাপদ
জেলেপাড়া জাছিকাটি	সাহেব মন্ডল	অশোক প্রামানিক ও অতুল প্রামানিক রাজন পরাই
পশ্চিম কোটারী পাড়া জাছিকাটি	হারাধন মন্ডল	কামাল বিশ্বাস
কাপালি পাড়া জাছিকাটি	প্রভাত মন্ডল	জসাই কার্তিক, কারঐ বাশার

[১] Abu Rushd, Indo-Bangladesh Border, Bangladesh Defence Journal, Dhaka, September Issue, 2008.

www.pathagar.com

মুগুরখালি প্রাথমিক বিদ্যালয়	পূর্না সরকার	কালিকৃষ্ণ ব্যানার্জি,পরিমল সরকার, নারায়ন চৌধুরী
কাটিয়া, বশিরহাট	প্রমুখ হেডমাষ্টার	গণেশ মন্ডল, পরিতোষ পাল
বিজিতপুর, বশির হাট	কার্তিক চন্দ্র	দেবী দাস
গন্ধবপুর, বশির হাট	পুষ্পপতি (শিক্ষক)	অজিত বৈদ্য ও সদানন্দ বিশ্বাস

স্বাধীন হিন্দু রাষ্ট্র

উনিশ 'শ পঞ্চাশের দশকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তথাকথিত স্বাধীন হিন্দু রাষ্ট্রের নীল-নকশা প্রস্তুত করা হয়। দীর্ঘ দিন যাবত এর অস্তিত্ব কেবল ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের ফাইলের মধ্যেই সীমিত ছিল। ১৯৫২ সনে কালিদাস বৈদ্য, চিত্তরঞ্জন সূতার এবং নিরোধ মজুমদার এই তিন চরমপন্থী যুবক ভারতের পশ্চিম বাংলায় গিয়ে বাংলাদেশের ভেতরে সংখ্যালঘু হিন্দুদের স্বাধীনতার জন্য কাজ শুরু করে । কালিদাস বৈদ্য তার রচিত 'বঙ্গভূমি' ও 'বঙ্গসেনা' নামক গ্রন্থে এ রকম দাবী করেছেন। সাম্প্রতিক সময়ে এই আন্দোলনের পেছনে কালিদাস ও চিত্তসূতারের বিশেষ ভুমিকা আছে।

ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার সংশ্লিষ্টতা

এমন অভিযোগ পাওয়া গেছে যে, ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ বঙ্গসেনাকে আর্থিক ও অস্ত্র প্রশিক্ষণসহ সহযোগিতা প্রদান করছে। বিভিন্ন মিছিলে বঙ্গসেনার বিভিন্ন ইউনিটের সদস্যদের অভিন্ন পোশাক পরিধান বলে দেয় এর পেছনে ভারত শক্তভাবে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে।

১৯৮৯ সনে বাংলাদেশের ইংরেজী সাময়িকী 'ঢাকা কুরিয়ার' হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার কালিদাস বৈদ্যের একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশ করে। তাকে প্রশ্ন করা হয়, তার আন্দোলনের বিকল্প কি হতে পারে। বৈদ্যের তাৎক্ষণিক উত্তর–বিকল্প একটাই আছেঃ বাংলাদেশকে নিরবে ভারতের প্রদেশ হিসেবে ভারতের সাথে মিশে যেতে হবে।[২]

---

[২] Dhaka Courrier, Dhaka May, 1989/ Abu Rushd, Indo-Bangladesh Border, Banagladesh Defence Journal, September issue, 2008.

www.pathagar.com

ভারত সরকার এবং ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ বিরোধী কর্মকান্ডের সব কিছুই জানে। কিন্তু তারা এসব তৎপরতা বন্ধে সামান্যতম পদক্ষেপও নেয়নি। ভারতীয় টিভি চ্যানেলগুলো তথাকথিত বঙ্গভূমি আন্দোলনের অতি ক্ষুদ্র পদযাত্রা, মিছিল, সমাবেশ প্রভৃতির অতিরঞ্জিত সচিত্র সংবাদ পরিবেশন করে। ভারত সরকারের কোন মন্ত্রণালয়, এমনকি পশ্চিম বাংলার কোন বিবেকবান মহল কিংবা রাজনীতিক অথবা বুদ্ধিজীবী এসব অপকর্মের কখনো নিন্দা করেছেন এমন তথ্য আমাদের জানা নেই।

নিখিল বঙ্গ নাগরিক সংঘ

কলিকাতার ৮৫ এপিসি রোড রাজাবাজারে নিখিল বঙ্গ নাগরিক সংঘের সদর দফতর অবস্থিত। সাবেক পূর্ব পাকিস্তান হতে যেসব হিন্দু ১৯৪৭ সনের আগে ও পরে ভারতে পাড়ি জমিয়ে সেদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করে ভারতের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে এবং ভারতের নাগরিক হিসেবে সব ধরনের সুযোগ সুবিধা ভোগ করে, তাদের জন্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সম্পূর্ণ হিন্দু অধ্যুষিত একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবীদার নিখিল বঙ্গ নাগরিক সংঘ। অথচ ১৯৭৩ সনের মুজিব-ইন্দিরা স্বাক্ষরিত চুক্তিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে ১৯৭১ সনের ২৬ মার্চের আগে যারা পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশ হতে ভারতে প্রস্থান করেছে তারা ভারতীয় নাগরিক অর্থ্যাৎ বাংলাদেশ কোনভাবেই তাদেরকে ফেরত নিতে বাধ্য নয় এবং ভারত তেমন দাবী তুলতেও পারবে না। অথচ জনৈক সুব্রত চ্যাটার্জির নেতৃত্বে গঠিত নিখিল বঙ্গ নাগরিক সংঘের মাধ্যমে ভারত সরকার ৩৮ থেকে ৮০ বছর আগে চলে যাওয়া ভারতীয় নাগরিকদের জন্য বাংলাদেশের ভেতরে পৃথক রাষ্ট্র তৈরীর চক্রান্ত করছে। শুধু তাই নয়, ব্রিটিশ সরকার নিজস্ব উদ্যোগে ও পৃষ্ঠপোষকতায় তৎকালীন বাংলার যেসব মুসলমান চাষীকে অবিভক্ত আসামে পতিত জমিতে কৃষিকাজ সম্প্রসারণের জন্য নিয়েছিল সেসব চাষীদের হতভাগ্য বর্তমান বংশধরদেরও বিদেশী ও বহিরাগত হিসেবে চিহ্নিত করে বাংলাদেশে ঠেলে দেয়া হচ্ছে।

বাংলাদেশ উদ্বাস্ত উন্নয়ন পরিষদ

বাংলাদেশে উদ্বাস্ত উন্নয়ন পরিষদের সদর দফতরের ঠিকানা পিএল মেডিক্যাল লেইন, থানা হাবড়া, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিম বঙ্গ। জনৈক বিমল মজুমদার এর সাধারণ সম্পাদক। এই আন্দোলনের মূল বিষয় হলো

www.pathagar.com

বাংলাদেশে কথিত হিন্দু নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনমত তৈরী করা।

সংযুক্ত উদ্বাস্তু সংগ্রাম পরিষদ

এর ঠিকানা হলো বলাকা পোষ্ট অফিস বামনগাছি, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিম বঙ্গ। সুশান্ত সাহা ইহার সাধারণ সম্পাদক। উদ্ধাস্তু উন্নয়ন পরিষদের মতোই এর দায়িত্ব হলো বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণা চালানো।

হিন্দু প্রজাতন্ত্রী বীরবঙ্গ সরকার

স্বাধীন বঙ্গভূমি আন্দোলনের প্রতিচ্ছবি হলো তথাকথিত হিন্দু প্রজাতন্ত্রী বীরবঙ্গ সরকার। ৩/৪ বছর আগে এই সংগঠন ভারতে অবস্থিত বিভিন্ন দূতাবাসে বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের কল্পিত কাহিনী লিপিবদ্ধ করে স্মারকলিপি পাঠিয়েছিল। এর মূল উদ্দেশ্যে হলো আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের সুনাম ও ভাব-মর্যাদাকে হেয় প্রতিপন্ন করে বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় হতে বিচ্ছিন্ন করা যাতে বাংলাদেশ একান্তভাবেই ভারত-নির্ভর হয়ে পড়ে।*

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভারতের বাংলাদেশ ভীতি

বাংলাদেশকে নাজেহাল তথা ঘায়েল করার অন্যতম নতুন হাতিয়ার হিসেবে বাংলাদেশের পৃথক অস্তিত্ব ভারতের জন্য বিপদজনক – এমন ভীতিকর প্রচারণা চালানো হচ্ছে। ভারতীয় নেতৃত্ব, বুদ্ধিজীবী, সংবাদ মাধ্যম প্রকাশ্যে বারংবার অভিযোগ করছে যে, ভারতের জন্য বাংলাদেশ পাকিস্তানের চেয়েও ভয়ঙ্কর বিপদজনক। মায়ানমারের সাথে সামান্য সীমান্ত (২৭১ কি.মি) বাদ দিলে বাংলাদেশ তিন দিক থেকেই ভারতবেষ্ঠিত। দক্ষিনের বঙ্গোপসাগর মূলত: ভারতীয় নৌবাহিনীর দখলে। এমন একটি ভৌগলিক অবস্থানে থাকা বাংলাদেশ বাহ্যিকভাবে অসুবিধাজনক অস্বস্তিকর অবস্থায় থাকলেও ভারতের দৃষ্টিকোণ হতে বাংলাদেশ ভূ-কৌশলগত কারণে অত্যন্ত গুরুত্ববহ ও বিব্রতকর। ভারতীয় নীতি নির্ধারকদের মতে ভারতের মূল ভূখন্ডের সাথে উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় সাতটি রাজ্যের (যে অঞ্চলকে আধুনিক গবেষকরা পূর্ব এশিয়া (ইস্টার্ণ এশিয়া) বলে অভিহিত করেন) বাস্তব ও সত্যিকার সংযুক্তি বা একত্রীকরণ বাংলাদেশের পৃথক অস্তিত্বের কারণে সম্ভব হচ্ছেনা। পূর্ব এশীয় সাত রাজ্যের মাঝখানে বাংলাদেশের অবস্থানের কারণে ঐ অশান্ত অঞ্চলকে ভারতের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছেনা। ভারতের ভয় সড়কপথে যাতায়াতের একমাত্র সংযোগকারী শিলিগুড়ি করিডোর কোন কারণে বন্ধ হয়ে গেলে পুরো পূর্ব এশীয় অঞ্চল ভারত হতে বেরিয়ে যাবে। ভারত মনে করে, বাংলাদেশকে পুরোপুরি গ্রাস না করা পর্যন্ত সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে অন্য কোন নামে একটি করিডোর পাওয়া গেলে এই শঙ্কা ও সমস্যা অনেকখানি দূরীভূত হবে।

ভারতের বাংলাদেশ-বিরোধী অবন্ধুসুলভ আগ্রাসী আচরণ ও নীতির কারণে ১৯৭১ সন হতে প্রত্যাশিত করিডোর এমনকি ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা প্রাপ্তির জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালানো সত্বেও ভারত অদ্যাবধি তা লাভ করতে পারেনি। বাংলাদেশের স্বার্থ, এমনকি অস্তিত্বের জন্য এমন করিডোর বিপজ্জন্নক হতে পারে এমন দূরদৃষ্টির কারণে বাংলাদেশের স্থপতি মরহুম শেখ মুজিব ভারতকে এই সুযোগ দেননি। তিনি জানতেন ভারতের সাথে বন্ধুত্ব করা যায়, কিন্তু ভারতকে বিশ্বাস করা যায় না। ভারত যদি কোন তাবেদারকে ব্যবহার করে তেমন সুবিধা পেয়েও যায়, তাতেও ভারত ঐ করিডোর সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারবে না। অথচ পূর্ব এশীয় অঞ্চলে সশস্ত্র স্বাধীনতাকামী গেরিলা যুদ্ধ দমনে সামরিক বাহিনী ও যুদ্ধাস্ত্র প্রেরণে অবাধ

www.pathagar.com

সুযোগ ভারতের জন্য অপরিহার্য। বর্তমানে গেরিলা-কবলিত বিপদসঙ্কুল পার্বত্য ঘুরপথে অধিকতর সময় ও অর্থব্যয়ে ঐ অঞ্চলের জন্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য, নির্মাণ সামগ্রী, সাধারণ নাগরিক, সামরিক বাহিনীর লোকজন, যুদ্ধাস্ত্র, সামরিক যান সবকিছুর জন্য একমাত্র ভরসা শিলিগুড়ি করিডোর। চীনের সাথে সম্ভাব্য যুদ্ধে ঐ করিডোর কয়েক ঘন্টার মধ্যে চীনের দখলে চলে যাবে। তেমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ ভারতীয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকলে পূর্ব-এশীয় রাজ্যগুলো ভারতের হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে।

বাংলাদেশ-বিরোধী অবন্ধুসুলভ আগ্রাসী নীতি অব্যাহত রেখে বাংলাদেশকে নেপাল, ভূটান, পাকিস্তান, চীনের সাথে স্থলপথে যোগাযোগের একই ধরনের সুযোগ-সুবিধা না দিয়ে ভারত সামান্য কিছু পয়সার বিনিময়ে করিডোর সুবিধা ছিনিয়ে নিতে চায়। কূটনৈতিক পন্থায় এ সুযোগ পেতে ব্যর্থ হয়ে ভারত নানাবিধ অন্তর্ঘাতমূলক দুষ্কর্মের মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি করে এ সুযোগ আদায় করতে চাচ্ছে।

বাংলাদেশ মনে করে ভারতকে প্রত্যাশিত করিডোর দেয়া হলেও ভারত কখনোই বাংলাদেশ বিরোধী তৎপরতা ও নীতি হতে সরে আসবে না। অবাধ বাণিজ্যসহ নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা পেয়েও ভারত তার জঘন্য নীতি অব্যাহত রাখছে। সুতরাং কোন ধরনের করিডোর দেয়া হলে ভারত বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে বাংলাদেশ দখলের জন্য ঐ করিডোর ব্যবহার করবে। কারণ ভারতীয় নীতি-নির্ধারকরা একবারে নড়বড়ে অথচ পৃথক অস্তিত্ব সম্পন্ন বাংলাদেশকেও ভারতের ভৌগলিক অখন্ডতার জন্য বিপজ্জন্নক মনে করে। শক্তিশালী সমৃদ্ধ স্থিতিশীল শান্তিময় বাংলাদেশের প্রতিবেশী ভারতীয় রাজ্যসমূহকে স্বাধীন হতে উৎসাহিত না করলেও যুগ যুগ ধরে উপেক্ষিত, শোষিত ও বঞ্চিত এসব রাজ্যে দীর্ঘ দিন ধরে স্বাধীনতা লড়াই চলছে। বাংলাদেশ সরকারের সামান্যতম সাহায্য ছাড়াই যেকোন দেশপ্রেমিক বাংলাদেশী গ্রুপ ভারতের বিচ্ছিন্ন-প্রবন অঞ্চলে বিপর্যয় সুষ্টি করতে পারে।

এমন পরিস্থিতি হতে রক্ষা পাবার জন্য ভারত বাংলাদেশে প্রতিবছর শত সহস্র কোটি টাকা ব্যয় করে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বাংলাদেশকে নড়বড়ে করে রাখার পন্থা অবলম্বন করেছে, যাতে বাংলাদেশ সোজা হয়ে দাঁড়াতে না পারে। এতদসত্বেও ভারত বিরামহীনভাবে অভিযোগ করে আসছে যে, পূর্বএশীয় অঞ্চলের সাতটি রাজ্যের স্বাধীনতাকামী মুক্তিযোদ্ধাদের ১৯৫টি শিবির ও ঘাঁটি

www.pathagar.com

বাংলাদেশে রয়েছে, যে প্রচারণা ও দাবীর অনুকূলে কোন সত্যিকার তথ্য প্রমাণ ভারত আজ পর্যন্ত হাজির করতে পারেনি। বাংলাদেশের মাটিতে ভারত-বিরোধী কোন চক্রের, এমনকি পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই'র কোন শিবির কিংবা তৎপরতা নেই – বাংলাদেশের এমন বারংবার আশ্বাসের পরেও ভারত তার মিথ্যে প্রচারণা বন্ধ করেনি। আসল কথা ভারত নিজেই জানে বাংলাদেশ সত্যি কথা বলছে। কিন্তু কেবল বাংলাদেশকে চাপে রাখার জন্য এবং বাংলাদেশ-বিরোধী হাজারো পদক্ষেপকে যুক্তিসংগত হিসেবে খাড়া করানোর অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার জন্য ভারত এমন অভিযোগ তুলছে।

তৃতীয় যে উপাদানটি ভারতকে সত্যিই সন্ত্রস্ত ও শঙ্কিত করছে তা হলো বাংলাদেশের ক্রমবর্ধিষ্ণু জনসংখ্যা যা ইতোমধ্যেই ১৬ কোটি ছাড়িয়ে গেছে, যাদের প্রায় ৯০ ভাগই মুসলমান। যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা এখনই বন্ধ হয়ে যায়, তা সত্বেও ১৬ কোটি বাংলাদেশী ভারতের জন্য বিভিন্ন ধরনের সংকট ও সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। এই সংকট সারা ভারতব্যাপী ছড়িয়ে পড়বে যদি ভারত কখনো সিকিমীয় কায়দায় শান্তি পূর্ণভাবে হলেও বাংলাদশকে ভারতের সাথে একীভূত করতে সক্ষমও হয়। ঐ অবস্থায় আজকের বাংলঅদেশীরা আরো ব্যাপক এলাকা নিয়ে বিশ্ব মানচিত্রে পুন:আবির্ভূত হবে, যেসব এলাকা বর্তমানে ভারতের অন্তর্ভূক্ত।

ভারতীয় নেতৃবৃন্দের জানা আছে, বাংলাদেশকে সহজে দখল করা যায়, কিন্তু দখলে রাখা যায় না। ঐতিহাসিকভাবে এ অঞ্চলের জনগণ কখনোই দিল্লীর কর্তৃত্ব মেনে নেয়নি। তারা দিল্লীর কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। ভারতকে আরো স্মরণ রাখতে হবে বাংলাদেশের জনগণ যে পাকিস্তান তৈরী করেছে তারাই মুসলিম পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে এসেছে হিন্দুর গোলাম হবার জন্য নয়। তথাপি ভারতীয় নীতি-নির্ধারকরা এই ভ্রান্ত ধারণায় ভূখছে যে, কোন রূপে এমনকি ভারতীয় দালাল-শাসিত বাংলাদেশের পৃথক অস্তিত্ব শ্রীলংকা, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, নেপাল, ভূটান ও বার্মার (মায়ানমার) সমন্বয়ে স্বপ্নের অখন্ড ভারত প্রতিষ্টার পথে প্রধান অন্তরায়। তাদের বিশ্বাস বাংলাদেশের সর্বক্ষেত্রে 'চর' ও দালাল তৈরী ও ভারত-মুখী সরকার কায়েম করে বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক ও সামরিকভাবে ভঙ্গুর ও পঙ্গু করে বিপর্যয়ের পর বিপর্যয় সৃষ্টি করলে কালক্রমে বাংলাদেশ দখলে কোন বেগ পেতে হবে না।

www.pathagar.com

সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশে ভারত-সৃষ্ট বিপর্যয়ের অবসান ঘটবে এমন সম্ভবনা মোটেই নেই। পিলখানায় গণহত্যা ভারতীয় অসংখ্যা অপরাধকর্মের একটি। ভারত এ ধরনের অপরাধ সংঘটন অব্যাহত রাখবে, যা অন্যান্য ক্ষেত্রে আরো নির্মম আকারে ঘটানো হবে, যতোক্ষণ পর্যন্ত না ভারত হয়তো খন্ড-বিখন্ড হবে, অথবা বাংলাদেশের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে। বাংলাদেশকে যদি কখনো আমাদের নেতৃত্বের ভ্রান্তি কিংবা ভারত-প্রেমের কারণে ভারতের দাসত্ব বরণ করতেই হয়, তবে বাংলাদেশ অঞ্চলে ভারত এমন ব্যাপক ও নির্মম গণহত্যা চালাবে, যা মানব ইতিহাসে এর আগে আর কখনোই ঘটেনি।

বাংলাদেশকে ভারতের ছায়া রাষ্ট্রে পরিণত করতে ভারতের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য নেতিবাচক ও আগ্রাসী দুষ্কর্ম ও অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা একদিন ভারতের জন্য চরম পরিণত ডেকে আনতে পারে। কিনতু ভারত তেমন সম্ভবনাকে আমলে নিচ্ছেনা। ভারত বুঝতে চাইছেনা বাংলাদেশকে দৌড়ালে ভারতকেও দৌড়তে হবে। বাংলাদেশ ভারতের বিচ্ছিন্ন-প্রবণ রাজ্যসমূহের একান্ত প্রতিবেশী। বাংলাদেশকে অহেতুক উত্যক্ত করার কারণে বাংলাদেশে ভারত বিরোধী যে তীব্র ক্ষোভ ও জনমত তৈরী হচ্ছে ভারতের জন্য একদিন তা কাল হয়ে দাঁড়াবে। ক্ষুদ্র দিয়াশলাই থেকেই বিরাট অগ্নিকান্ড ঘটে।*

www.pathagar.com

২ আমাদের সীমান্ত

- অস্থির সীমান্ত
- অপ্রতিরোধ্য অপরাধ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অস্থির সীমান্ত

বাংলাদেশের মানচিত্রের প্রতি চোখ বুলালে যে কেউই বলবেন যে, বাংলাদেশ-ভারত সারা বিশ্বের দেশসমূহের মধ্যে সবচেয়ে আকাবাঁকা সীমান্তের অংশীদার। এই কারণে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের নিখুঁত দৈর্ঘ্য নির্ণয় করা সত্যিই দুরূহ ব্যাপার। এ কারণে বাংলাদেশ-ভারতের সীমান্তের দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন ধরনের তথ্যের মুখোমুখি হই। বাংলাদেশ ডিফেন্স জার্নালের তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত ৪,১৫৬ কি.মি লম্বা। বাংলাদেশ-ভূখন্ড লাগোয়া পাঁচটি ভারতীয় রাজ্যের সীমান্ত যথাক্রমে পশ্চিম বঙ্গ ২,২৬২ কি.মি, আসাম ২৬৪ কি.মি, মেঘালয় ৪৩৪ কি,মি, ত্রিপুরা ৮৭৪ কি.মি. ও মিজোরাম ৩২০ কি.মি। একই সাময়িকীর মতে বাংলাদেশ মায়ানমার সীমান্তের দৈর্ঘ্য ৩২০ কি.মি.।[১]

অন্যদিকে বিডিআর কর্তৃক প্রকাশিত তথ্যমতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের দৈর্ঘ্য ৪,২২৭ কি.মি. এবং বাংলাদেশে মায়ানমার সীমান্তের ২৭১ কি.মি.।[২]

বাংলাদেশের একান্ত সীমান্তবর্তী দুই দেশের মধ্যে এতোদিন আমরা কেবল ভারতকে নিয়েই উদ্বিগ্ন ছিলাম। প্রায় তিনদিক থেকে ভারতবেষ্ঠিত এবং ভারতের বহুবিধ আগ্রাসী ও অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা এমন উদ্বেগের মূল কারণ। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত ভারত পাকিস্তান কিংবা ভারত-চীন সীমান্তের চেয়েও দীর্ঘতর। এই বাস্তবতা অনিস্বীকার্য যে, এই দীর্ঘ সীমান্ত দেকবাল ও নিয়ন্ত্রণ করা কেবল বাংলাদেশের জন্যই নয়, ভারতের জন্যও দুরূহ। বিশেষত: সীমিত সম্পদ, শক্তি, জনবল এবং দুর্বল অবকাঠামোর আওতায় বিডিআর'এর পক্ষে সমতল ভূমি, নদী ও পাহাড়ী বনজঙ্গল-সম্বলিত এ বিশাল সীমান্ত পাহারা দেয়া এবং আগ্রাসী প্রবিতেশীকে প্রতিহত করা নি:সন্দেহে কষ্টসাধ্য। ভারতীয় বিএসএফ না বাংলাদেশের সীমান্ত তথা সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, না আন্তর্জাতিক আইন ও রীতিনীতির তোয়াক্কা করে। সীমান্ত পাহারার নামে বিএসএফ বারংবার মানবিক বিষয়াদি লঙ্ঘন করে, আন্তর্জাতিক বিধি অমান্য করে এবং নির্মম কূটকৌশল অবলম্বন

---

[১] Abu Rushd, Indo-Bangladesh Border, Bangladesh Defence Journal, Dahaka, September issue, 2008.

[২] কর্নেল জাহাঙ্গীর বারী, পরিচালক, বিডিআর অপারেশন ও প্রশিক্ষণ, দৈনিক আমার দেশ, ঢাকা, জুন ১৯, ২০০৯।

www.pathagar.com

করে বাংলাদেশকে বিব্রত করে চলেছে।

ভারতের আগ্রাসী নীতির কারণে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে মূলত: সারা বছরই অশান্ত ও উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে। একথা অনস্বীকার্য যে, একান্ত বন্ধু-প্রতীম দুই প্রতিবেশী দেশের সীমান্ত যৌক্তিক কারণেও অশান্ত হতে পারে। মাদকদ্রব্য ও মানব পাচারকে কেন্দ্র করে মার্কিন-মেক্সিকো সীমান্তে সঙ্গত কারণেই কখনো কখনো সমস্যা সৃষ্টি হয়। উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া সীমান্ত নি:সন্দেহে গোলযোগপূর্ণ। কিন্তু বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের মতো এতো দুর্যোগপূর্ণ ও ভয়ঙ্কর সীমান্ত বিশ্বের অন্য কোথাও নেই।[৩]

বছরে এমন কোন দিন যায়না, যেদিন ভারতীয় বিএসএফ বাংলাদেশ ভূখন্ডে অনুপ্রবেশ করে, নিরপরাধ বাংলাদেশীদের হত্যা ও তাদের মালামাল লুণ্ঠন করে, নিষিদ্ধ ভারতীয় সামগ্রী ও নাগরিক বাংলাদেশে ঠেলে দিয়ে সীমান্তে গোলাযোগ ও যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে না। বিএসএফ এর তুলনায় বিডিআর এর সম্পদ ও শক্তি অতি তুচ্ছ হলেও কেবল অদম্য সাহস ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিডিআর দস্যুসম ভারতীয় বিএসএফ' এর দুষ্কর্ম প্রতিহত করে চলেছে। ভারত ভূ-অর্থনৈতিক স্বার্থোদ্ধারের জন্য বিডিআরকে পঙ্গু করে সীমান্ত পরিস্থিতিকে তার অনুকূলে নেয়ার উদ্দেশ্যে দীর্ঘদিন ধরে চক্রান্ত চালিয়ে আসছে। পিলখানার হত্যাকান্ড সে চক্রান্তেরই অংশ বিশেষ।

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে ভারতীয় বিএসএফ যেসব বেআইনী ও অমানবিক দুষ্কর্ম চালায় তার অতি সামান্যাংশই বাংলাদেশী জনগণ ও বিশ্ববাসী জানে। প্রকৃতাবস্থা সবার অগোচরেই থেকে যায়। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর হতেই বাংলাদেশ ক্রমাগতভাবে ভারতের শত্রুতা ও আগ্রাসনের শিকারে পরিণত হয়েছে। ভারতীয় বিএসএফ এবং তাদের প্ররোচনায় ও সহযোগিতায় ভারতীয় দুস্কৃতকারীরা প্রায় প্রতিদিন নিরাপরাধ বাংলাদেশীদের হত্যা, অপরহরণ, ধর্ষণ এবং তাদের গোবাদি-পশুসহ মালামাল ও ফসল লুণ্ঠন করলেও বাংলাদেশ সরকার ও প্রচার মাধ্যম সর্বদাই ভারতকে বন্ধুদেশ হিসেবে সম্বোধন করে এবং বলে বেড়ায় যে বাংলাদেশের সাথে ভারতের নাকি সুবন্ধুসুলভ সম্পর্ক বিরাজ করছে এবং দিন দিন এই সম্পর্ক আরো জোরদার হবে। এই ধরনের মিথ্যে প্রচারণা সীমান্তবাসী বাংলাদেশী এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সাবভৌমত্বের সাথে নির্মম প্রতারণা ও কৌতুক ছাড়া কিছুই নয়।*

---

[৩] Border Management– A case study of Indo-Bangladesh border, Bangladesh Defence Journal, Dhaka, September, 2008.

www.pathagar.com

অপ্রতিরোধ্য অপরাধ

বাংলাদেশ–ভারত সীমান্তে ভারতের দিক হতে এতোসব বহুমুখী সমস্যা ঘটানো হয়, যা সারা বিশ্বের অন্যকোন আন্তর্জাতিক সীমান্তে ঘটেনা। বিএসএফ উদ্দেশ্যমূলকভাবে এসব দুষ্কর্ম করে থাকে। এতে ভারত সরকারের বাংলাদেশ বিরোধী গভীর চক্রান্ত ও আগ্রাসী তৎপরতার প্রতিফলন ঘটে। বাংলাদেশ ডিফেন্স জার্নাল (সেপ্টেম্বর সংখ্যা, ২০০৮) অনুযায়ী বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে ভারতের দিক থেকে নিম্নোক্ত প্রধান প্রধান অপরাধগুলো সংঘঠিত হয়ে থাকে।

১. চোরাচালান
২. মানব পাচার
৩. খুন-জখম
৪. বিনা উস্কানীতে গোলাগুলি
৫. লুণ্ঠন, অকারণে সীমান্তবাসীদের ফসল ও সম্পদের ক্ষতি সাধন
৬. জোরপূর্বক ভারতীয় নাগরিকদের বাংলাদেশ ঠেলে দেয়া
৭. বাংলাদেশ ভূখন্ডে উন্নয়নমূলক কাজে বাধাদান
৮. অবৈধ অনুপ্রবেশ
৯. কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ
১০. ভূমি ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণসহ বন্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী সংক্রান্ত বিরোধ

চোরাচালান

স্বর্ণ-রৌপ্য, কলকারখানার মৌলিক যন্ত্রপাতি, ইলেক্ট্রনিক্স সামগ্রী, ঔষধ, ডিজেল ও পেট্রোলসহ জ্বালানী সামগ্রী, ভোজ্য তেলসহ বিদেশ থেকে আমদানীকৃত সব ধরনের সামগ্রী বাংলাদেশ হতে ভারতে পাচার হয়ে থাকে। অন্যদিকে ভারত হতে বাংলাদেশে মাদকদ্রব্য, নিম্নমানের কাপড়, কৃষি ও শিল্পের জন্য ক্ষতিকারক সামগ্রী, খাদ্যদ্রব্য, মানব-কংকাল পাচার হয়।

ভারত সাধারণতঃ বাংলাদেশ থেকে এমন সব দ্রবাদি চোরাচালানে আগ্রহী যেগুলো বাংলাদেশে তৈরি হয় না, বরং বাংলাদেশ নিজস্ব চাহিদা মেঠানোর জন্য বিদেশ থেকে আমদানী করে। অন্যদিকে ভারত বাংলাদেশে অধিক হারে মাদকদ্রব্য বিশেষতঃ ফেনসিডিল পাচারে অধিকতর তৎপর। এছাড়া সন্ত্রাসী কাজে ব্যবহৃত ক্ষুদ্রাকারের অস্ত্র এবং গোলাবারুদ বাংলাদেশে প্রেরণ করে।

www.pathagar.com

মাদকদ্রব্য চালান

ফেনসিডিল সর্বাধিক ক্ষতিকারক মাদকদ্রব্য ভারত যেটা কেবলমাত্র বাংলাদেশে চোরাচালানীর মাধ্যমে প্রেরণের জন্য তৈরি করে। কাশির ওষুধ হিসেবে ভারতে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুতকৃত ফেনসিডিলে ৫ শতাংশ 'কডিন' থাকে । অন্যদিকে বাংলাদেশে বিভিন্ন উপায়ে প্রেরণকৃত নিষিদ্ধ এই মাদকদ্রব্যে কডিনের পরিমাণ ২০ শতাংশের বেশী। ভারত বাংলাদেশ ভূখন্ডের একবারে কাছে ৬০টির বেশী ফেনসিডিল কারখানা নির্মাণ করেছে। এসব কারখানায় উৎপাদিত সব ফেনসিডিলই বাংলাদেশে পাঠানো হয়। বাংলাদেশে চোরাচালনকৃত ফেনসিডিলের অতি সামান্যই আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর হতে ধরা পড়ে। আটককৃত ফেনসিডিলের সংখ্যার দিকে তাকালেই বুঝা যায় কি ব্যাপকভাবে এ মহামারাত্নক বিষসম মাদকদ্রব্য বাংলাদেশে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। ঢাকা থেকে প্রকাশিত বাংলাদেশ ডিফেন্স জার্নালে (সেপ্টেম্বর ইস্যু-২০০৮) আটককৃত বিভিন্ন ধরনের ভারতীয় মাদকদ্রব্যের পরিসংখ্যান ছিল নিম্নরূপ:

পরিসংখ্যান – এক

বছর	ফেনসিডিল (বোতল)	মদ/কেজি	গাঞ্জা/কেজি	হেরোইন (কেজি)	বিয়ার (বোতল)
২০০৩	২,৩৯,৩৩৭	৫,২০,২৫,৩৬৯	৯৬,৭৪,১৯০	১২,৭৯৬	জানা যায়নি
২০০৪	৩,০০,৩১২	২,২৩,৪৮,২৯৮	৯৭,২৩,৩৪০	২০,০৯২	৩,৯৫২
২০০৫	২,৫৮,৩৭৬	২,৭১,৪৯,৭০	১,১১.০০,২৪৯	৪৫,৮১১	৫,১০২
২০০৬	২,৮৯,৬৭৪	৩,১৯,৫৭,৩০	৬০,৬১,৮৯৩	৩৮,৫২৩	৫,৫৪৯
২০০৭	২,০৬,১৪০	১,৮৫,৯৭,৮৫	৭৭,১৯,৬৭৪	২২,৮১২	২,৯৭১
২০০৮ জুন ৩০	১,৯৬,৫৬৩	১,১৪,৪৯,১২৯	৫২,১৭,২৭০	৩০,২৬১	১,০৫৮

www.pathagar.com

পরিসংখ্যান –২

আটককৃত মাদকদ্রব্যের পরিসংখ্যান (২০০৩-২০০৮)[১]

	মাদকদ্রব্যের নাম	২০০৬	২০০৭	২০০৮, মার্চ
১.	ফেনসিডিল বোতল	২,৮৯,৬৪৭	২,০৬,১৪০	৯১,২৪৭
২.	উইন (লিটার)	৩১,৯৫৭,৩০০	১৮,৫৯৭,৮৯৫	৮৬৮,২৩৪
৩.	গাঞ্জা (কেজি)	৬০,৬১,৮০৩	৭৭,১৯,৬৭৮	২৩,৫৯,৫২০
৪.	হেরোইন (কেজি)	৩৮,৫৩৩	৩৩,৮১২	১৬,৬৪০
৫.	বিয়ার (বোতল)	৫,৫৮৯	২,৯৭১	৭৪২
৬.	ডিষ্ট্রিল উইন (লিটার)	২,৮৮৬,৮০০	৬,২৯৭,৯৫০	৮,২৮,৫০০
৭.	জয়া উইন (লিটার)	৩,৮৭২,২০০	৪,৭৮৯,১৬০	–
৮.	কোকেন (কেজি)	১,১০০	১,১৮০	–
৯.	অফিয়াম/মরফিন	১,০২০	–	৬০০
১০		-	৭৬০	মরফিন ৪৫৯

অন্যদিকে বিডিআর'এর অপরেশন ও প্রশিক্ষণ শাখায় পরিচালক কর্নেল জাহাঙ্গীর কবির তালুকদার জানিয়েছেন, ২০০৯ সনের মার্চ ও মে মাসের মধ্যে বিডিআর জোয়ানরা ৬০.২২ কোটি টাকা মূল্যমানের চোরাচালানকৃত সামগ্রী সীমান্তে আটক করেছে।[২]

উপরের পরিসংখ্যান ও তথ্য ভারত হতে বাংলাদেশে চোরাচালানের মাধ্যমে প্রেরিত মোট মাদকদ্রব্য কিংবা অন্যান্য সামগ্রীর অতি নগন্যতম অংশ। মোট চোরাচালানকৃত দ্রব্যের গড়ে ১০ শতাংশ বিডিআর জোয়ানরা আটক করতে পারে বলে মনে করা হয়।

ভারত হতে বিভিন্ন ধরনের চোরাচালানকৃত এই সব সামগ্রী বাংলাদেশের সার্বিক অর্থনীতি ও শিল্প অবকাঠামোই কেবল ধবংস করছেনা আমাদের যুব সমাজ তথা সমগ্র জাতির জন্য চরম পরিণতি ডেকে আনছে। অন্যদিকে আমদানিকৃত সামগ্রী ভারতে পাচার হয়ে যাবার কারণে বাংলাদেশের বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা প্রকারান্তে ভারতে চলে যাচ্ছে।

---

[১] M. A. J. Wadud Didar, Border Smuggling & a Picce of our Tragedy, Banagladesh Defence Journal, Dhaka, September issue, 2009.

[২] The Daily Star, Dhaka, 19 June, 2009.

www.pathagar.com

নিরাপরাধ মানুষ হত্যা

ভারত পরিকল্পিতভাবে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তকে অশান্ত ও বিরোধপূর্ণ রাখে। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত ফিলিস্তীন-ইসরাইল সীমান্তের চেয়েও বেশী অশান্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ যেখানে মানুষকে অনবরত পাখীর মতো গুলি করে হত্যা করা হয়।

সারা বছরে এমন একটি দিন অতিবাহিত হয়না, যেদিন বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী কিংবা ভারতীয় দুস্কৃতিকারীরা খুন, জখম, অনুপ্রবেশ, চোরাচালান, অপহরণ, ধর্ষণ, লুট, পুশ-ইন ইত্যাদি কোন না কোন অপরাধ করে সীমান্তে অস্বাভাবিক ও উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেনা। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ কর্মের ওপর নজর রাখে 'অধিকার' নামক এমন একটি মানবাধিকার সংস্থার সংগ্রহীত পরিসংখ্যানই চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় বিএসএফ এবং ভারতীয় নাগরিকরা সীমান্তে কেমন অসহনীয় তান্ডব চালাচ্ছে । ২০০০ সন হতে ২০০৯ সনের এপ্রিল মাসের মধ্যে সীমান্তে সর্বমোট ৮২৩ জন বাংলাদেশী নিহিত হয়েছে। এদের মধ্যে ৭৬৪ জন বিএসএফ'র গুলিতে এবং বাকী ৫৯ জন ভারতীয় দৃস্কৃতকারী (যারা মূলতঃ বিএসএফ'র বেসামরিক সদস্য) দের হাতে খুন হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের অপরাধ কর্মের তথ্য-সম্বলিত নিম্নোক্ত ছকটি নি:সন্দেহে ভারতীয় বিএসএফ ও দুস্কৃতকারীদের নির্মমতার দলিল[৩]ঃ

সীমান্তে বিএসএফ'এর অত্যাচার

সন	নিহত	আহত	গ্রেফতারকৃত	অপহৃত	নির্যোজ	ধর্ষণ	লুন্ঠন	পুশ-ইন	সর্বমোট
২০০৯ (১ জানুয়ারী হতে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত)	৩৪	৪১	০	৬	০	০	১	০	৮২
২০০৮	৬২	৪৭	০	৮১	০	০	৩	২০	২১৩
২০০৭	১২০	৮২	৮	৯৮	৯	৩	৫	১৯৮	৫২৩

[3] অধিকার, বাড়ী নং- ৩৫, সড়ক-১১৭, গুলশান- ০২, ঢাকা, বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

২০০৬	১৪৬	১৪৪	২১	১৬৫	৩২	২	৯	০	৫১৯
২০০৫	১০৪	৬৬	২৬	৭৮	১৪	৩	৪	০	২৯৫
২০০৪	৭৬	৩৫	৯	৭৩	০	০	৫	০	১৯৮
২০০৩	৪৩	৮২	২১	১২০	৭	২	৮	০	২৮৩
২০০২	১০৫	৫৪	১১০	১১৮	৩৮	০	১২	০	৪২৯
২০০১	৯৪	২৪৪	৬০	৪৫	০	১	১০	০	৪৫৪
২০০০	৩৯	৩৮	১১	১০৬	০	২	১৩	০	২০৯
সর্বমোট	৮২৩	৮৩৩	২৪৬	৮৯০	৬২	১৩	৭০	২১৮	৩২০৫

অন্যদিকে নিম্নোক্ত ছকটি প্রমাণ করে বিগত শতাব্দীর শেষ দশকের তুলনায় একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত রক্ষীরা অপরাধ সংঘটনে অধিকতর অমানবিক ও বেপরোয়া ভূমিকায় নেমেছে। ২০০০ থেকে ২০০৯ (এপ্রিল পর্যন্ত) সালে সীমান্তে ৮২৩ জন বাংলাদেশীকে খুন করা হয়। অথচ এর আগের দশকে এই সংখ্যা ছিল মাত্র ২০৬ জন। পূর্ববর্তী দশকের পরিসংখ্যানটি নিম্নরূপ[৪]ঃ

বছর	নিহত	আহত	আক্রামন ও গোলাগুলির সংখ্যা
১৯৯০	২৯	১৯	জানা নেই
১৯৯১	২৭	১৭	জানা নেই
১৯৯২	১৬	১৩	জানা নেই
১৯৯৩	২১	জানা নেই	জানা নেই
১৯৯৪	২১	১৪	১৭০
১৯৯৫	১২	০৯	৭৫
১৯৯৬	১৩	১৮	১৩০
১৯৯৭	১১	১৮	৩৯
১৯৯৮	২৩	১৯	৫৬
১৯৯৯	৩৩	৩৮	৪৩
মোট	২০৬	২৮৫	৫১৩

বিএসএফ শুধুমাত্র নিরাপরাধ বাংলাদেশীদেরকেই অনেক ক্ষেত্রে দেখামাত্রই গুলি করে না, এমনকি বিডিআর জোয়ানদেরকেও খুন করতে দ্বিধা করেনা।

[৪] দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা, ২১ অক্টোবর, ২০০৯।

www.pathagar.com

২০০০ সনে বিএসএফ'র গুলিতে ৩৫ জন বিডিআর জোয়ান প্রাণ হারান।[৫] বিএসএফ'র নির্মম আচরণ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ভারত সরকারকে চিঠি দিয়ে বিএসএফ'র বিভিন্ন ধরনের অপকর্ম হতে বাংলাদেশ ভূখন্ডের নিকটবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের মান-ইজ্জত, জীবন ও সম্পদ রক্ষার উদ্দেশ্যে বাংলাভাষী বিএসএফ সদস্য মোতায়েনের অনুরোধ জানিয়েছেন।[৬] কর্নেল জাহাঙ্গীর কবির এক প্রেস ব্রিফিংয়ে জানিয়েছেন ১ জুন হতে ১৮ জুন ২০০৯ এর মধ্যবর্তী সময়ে বিএসএফ সীমান্তে ৩০ জন বাংলাদেশীকে হত্যা করেছে।[৭] অন্যদিকে মানবাধিকার সংস্থা 'অধিকার' জানিয়েছে (১ জানুয়ারী হতে ৩০ মে, ২০০৯) পর্যন্ত বিএসএফ ৪৪ জন বাংলাদেশীকে খুন এবং অন্য নয় জনকে অপহরণ করেছে।[৮]

অস্ত্রচোরাচালান:

নানা ধরনের অবৈধ হালকা ও ক্ষুদ্র অজানা সংখ্যক অস্ত্র সীমান্ত পথে ভারত হতে বাংলাদেশে প্রবেশ করছে। অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতীয় পিস্তল, রিভলবার, পাইপগান, রাইফেল, এসএমজি'র মূল্য কম হবার কারণে বাংলাদেশী দৃষ্কৃতকারী ও সন্ত্রাসীদের কাছে এসবের চাহিদা অনেক বেশী। ভারত ইচ্ছে করেই এসব অস্ত্র ও বিভিন্ন ধরনের গোলবারুদ এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম অস্থির অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টির জন্য বাংলাদেশে ঠেলে দিচ্ছে। বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেষেঁ এসব অবৈধ অস্ত্রের অনেকগুলো কারখান গড়ে তোলা হয়েছে।

কাঁটাতারের বেড়া:

ভারত সরকার বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের ৩,২৮৬.৮৭ কিলোমিটারে কাঁটাতারের বেড়া, পাকা সড়ক, সেতু, সুউচ্চ টাওয়ার, উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন ফ্লাডলাইট স্থাপনের প্রকল্প হাতে নিয়েছে। দুই পর্যায়ে বিভক্ত এই প্রকল্পের কাজ যথাক্রমে ১৯৮৭ এবং ২০০০ সনে শুরু হয়। প্রথম পর্যায়ে পশ্চিম বঙ্গ

---

[৫] The Independent, Dhaka, 12 December, 2000.

[৬] দৈনিক বাংলার বাণী, ঢাকা, ৬ ফেব্রুয়ারী, ২০০১।

[৭] দৈনিক আমার দেশ, ঢাকা, ১৯ জুন, ২০০৯।

[৮] অধিকার, পূর্বোক্ত।

www.pathagar.com

আসাম ও মেঘালয় সীমান্ত ১,৮৫৪.৩৫ কিলোমিটার কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে ২৪,২৯.৫ কি.মি কাঁটা তারের বেড়া নির্মাণের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের ৬০ ভাগ অংশে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে।[৯]

২৯৭ কিলোমিটার অর্থ্যাৎ মোট সীমান্তের সাত শতাংশে কাঁটাতারের এই বেড়া শূন্য রেখা হতে ১৫০ গজের ভেতরে পড়েছে। বাকী বেড়া ১৫০ গজের বাইরে অর্থ্যাৎ বাংলাদেশের ভেতরে পড়েছে। ফলে উভয় দেশের মধ্যে প্রায়ই এতদসংক্রান্ত গাইডলাইনের ব্যাখ্যা নিয়ে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এ জন্য শান্তিপূর্ণভাবে বেড়া নির্মান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যাহত হচ্ছে। সীমান্তে এমন ২৬৫টি স্থান রয়েছে যেগুলোর প্রকৃত অবস্থান নিয়ে উভয় দেশের মধ্যে বির্তক ও বিরোধ রয়েছে। কাঁটাতারের বেড়া-ঘেঁষে সামরিক যানবাহন চলাচল করতে পারে এমন প্রশস্থ মজবুত পাকা সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। এর ফলে বিএসএফ এমনকি ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাধারণ গাড়ী থেকে শুরু করে সাঁজোয়া যান এসব সড়ক দিয়ে সহজে এবং দ্রুত চলাচলের সুবিধা সৃষ্টি হওয়ায় সীমান্তে বিএসএফ অনেক সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। অন্যদিকে সাম্প্রতিক সময়ে বিএসএফকে জিপিএস (গোবাল পজিশনিং সিস্টেম), রাতে দর্শনযোগ্য বায়নোকূলার এবং হাতে বহনযোগ্য থার্মাল ইমেজ প্রভৃতি সরবরাহ করায় বিএসএফ'র কর্মদক্ষতা ও সুবিধা বহুগুণে বেড়ে যায়।

বাংলাদেশ সীমন্তে প্রায় ৭৮০ কি.মি. দীর্ঘ নদী রয়েছে। নৌ-সীমান্ত পাহারা দেয়ার জন্য ভারত বিএসএফ এর নৌ শাখা গঠন করেছে। স্পীডবোট, ইঞ্জিন-চালিত নৌকা, ভাসমান সীমান্ত চৌকি, প্রভৃতির মাধ্যমে নৌ শাখাকে সজ্জিত করা হয়েছে। এর ফলে নৌসীমান্ত রক্ষায় ভারত শক্ত অবস্থান রয়েছে। এর পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে বাংলাদেশের কিছুই নেই।

অপদখলীয় ভূমি

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে উত্তেজনা সৃষ্টিকারী অন্যতম উপাদান হলো অপদখলীয় ভূমি যেগুলো যুগ যুগ ধরে সীমানা নির্ধারণহীন রয়েছে। প্রধানতঃ নিম্নোক্ত তিনটি অঞ্চলে সীমান্ত নির্ধারণ প্রক্রিয়া অসম্পূর্ণ অবস্থায় রয়েছে।

১. বিলুনিয়া (মহুরী নদী) : এ অঞ্চলে ৪৫ একর চর অপদখলীয় অবস্থায়

---

[৯] Bangladesh Defence Journal. Dhaka September issue, 2008.

www.pathagar.com

রয়েছে। এই বিরোধপূর্ণ ভূমিতে ভারতীয় হিন্দুদের একটি শশ্মান রয়েছে। এখানকার ২.৬ বর্গ কিলোমিটার সীমান্তের মালিকানা এখনো নির্ধারিত হয়নি।

২. লাঠিটিলা-ডুমাবারি: তিন বর্গ কি.মি. ভূমির সীমানা নির্ধারিত করা হয়নি।

৩. দক্ষিণ বেরুবাড়ি অঞ্চলের দইখাতা মৌজার ১.৬ বর্গ কি.মি. ভূমির মালিকানা নির্ধারিত করা হয়নি। সর্বমোট অপদখলীয় ভূমির পরিমাণ ৬.১ বর্গ কি.মি.।[১০]

পাহারাবিহীন সীমান্ত : বাংলাদেশ-ভারত এবং বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্তের বাংলাদেশ অংশে ২৯৯ মাইল (৪৭৯ কি.মি) সম্পূর্ণ পাহারাবিহীন অবস্থায় রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বাংলাদেশ-ভারত এবং বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্তে বাংলাদেশ রাইফেলস এর কোন চৌকি নেই। ফলে এই দীর্ঘ সীমান্ত সম্পূর্ণরূপে পাহারাবিহীন, বলতে গেলে দখলবিহীন, অবস্থায় রয়েছে। পার্বত্যময় দুর্গম এই সীমান্তে ভারতের সাথে ১০০ মাইল (১৬১ কি.মি) সীমান্তে মূলত: বাংলাদেশের কোন কর্তৃত্বই নেই। গত ৩৮ বছরে কোন সরকার এই দীর্ঘ সীমান্তে বিডিআর'র কোন চৌকি বা সীমান্ত চৌকি স্থাপনে তৎপর হয়নি। ফলে এই অঞ্চল বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং দুস্কৃতকারী সন্ত্রাসীদের অভয়ারন্য বিশেষ। অথচ একই সীমান্তে বিএসএফ এবং মায়ানমারের নাসাকা বাহিনীর পর্যাপ্ত সংখ্যক সীমান্ত চৌকি রয়েছে।

ভারতের দখলীকৃত বাংলাদেশী ভূমি :

বিভিন্ন পর্যায়ে জোর কূটনৈতিক তৎপরতা চালানো এবং ভারতের বারংবার প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও বিভিন্ন সীমান্তে বাংলাদেশের বিশাল ভূমি দীর্ঘদিন যাবত ভারতের অবৈধ দখলে রয়েছে।[১১]

---

[১০] Abu Rushd, Indo-Bangladesh Border, Bangladesh Defence Journal, Dhaka, September Issue, 2008.

[১১] অধ্যাপক আবদুর রব: ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক: সাম্প্রতিক প্রেক্ষিত/বিবর্তন।

www.pathagar.com

অঞ্চল	জেলা	ভূমির পরিমাণ
আসালঙ্গ	খাগড়াছড়ি	১,৭০০ একর
তেতুলিয়া	পঞ্চগড়	১,০০০ একর
বোদা, দেবিগঞ্জ ও সদর	পঞ্চগড়	১,১২৭ একর
তিস্তা নদীর সীমান্তবর্তী অঞ্চল	----------	২,০০০ একর
শার্শা (ইছামতি-কোদলা)	যশোর	৫৭০ একর
মাটিরাবন-সাতশারি	সুনামগঞ্জ	৩,২৯৫ একর
প্রতাপপুর (গোয়াইনগাট)	সিলেট	২৩০ একর
নয়াগ্রাম (গোয়াইনগাট)	সিলেট	১৩৭ একর
শিবগঞ্জ (ভোলারহাট)	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৬,৫০০ একর
মশালডাঙ্গা (বুড়োঙ্গামারি)	কুড়িগ্রাম	৩০০ একর
মুহিচর	ফেনী	২৪ একর
দক্ষিণ তালপট্টি	সাতক্ষীরা	১০,০০০ একর
উত্তর বঙ্গের অন্যান্য এলাকা	ঠাকুরগাও, দিনাজপুর, পঞ্চগর, নীলফামারী, লালমনিরহাট	১০,০০০ একর
মোট দখলীকৃত ভূমির পরিমাণ	----------	৩৬,৮৮৩ একর
দিমলা-সাতিন সীমান্ত	নীলফামারী	অনির্ধারিত (কয়েক হাজার একর)

নদী তীরবর্তী ভূমি দখলের ঘৃণ্য প্রক্রিয়া : ভারত বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তবর্তী অভিন্ন নদীসমূহে বাংলাদেশ তীরবর্তী ভূমি দখলের জন্য ভারত চরম ঘৃণ্য প্রক্রিয়া অবলম্বন করে চলেছে। নদী শাসনের আবরণে ভারত উদ্দেশ্যমূলকভাবে অভিন্ন নদীসমূহের প্রবাহ ও গতি বাংলাদেশের দিকে ঘুরিয়ে দেয়। এই উদ্দেশ্যে ভারত অভিন্ন নদীসমূহের ভারতীয় তীরে গোয়েন, স্প্যার নির্মাণ করে। ফলে নদীর স্রোত তথা প্রবাহ তীব্রবেগে বাংলাদেশের ভূখন্ডের দিকে ধেয়ে এসে নদী তীরবর্তী ভূমি, ঘরবাড়ী ভেঙ্গে নদীতে পরিণত হয়। আর ভারতীয় অংশে নতুন চর জেগে উঠে। এভাবে বাংলাদেশের দিকে ভূমি ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে নদীগুলো কেবল সম্পূর্ণরূপে বাংলাদেশ ভূখন্ডের ভেতরেই চলে আসেনি, বাংলাদেশের বিশাল ভূমি ভারতের দখলে চলে গেছে, যেগুলোকে ভারত এখন তার নিজস্ব ভূখন্ড বলে দাবী করছে। যদিও সেগুলো বাংলাদেশেরেই অংশ ছিল। ঐসব ভূমির ওপর ভারতে অবৈধ দখল চিরস্থায়ী

www.pathagar.com

করার উদ্দেশ্যে ভারত ইতোমধ্যেই ঐসব ভূমিতে পাকা রাস্তা বাঙ্কার ও অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ করেছে।[১২]

উল্লেখ্য যে, উপমহাদেশ বিভক্তির সময় অভিন্ন নদীসমূহের মধ্যস্রোতকে উভয়দেশের আন্তর্জাতিক সীমান্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ভারত তার অবৈধ জোরপূর্বক ঘৃণ্য কৌশলের মাধ্যমে অভিন্ন নদীসমূহ এবং তাদের মধ্য স্রোতকে বাংলাদেশের কয়েক মাইল ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে ঐ কৃত্রিম ও মানবসৃষ্ট মধ্য স্রোতকে উভয় দেশের অভিন্ন সীমানা হিসেবে দাবী করে বাংলাদেশের ভূমি দখল করে নিচ্ছে।*

[১২] দৈনিক আজকের কাগজ, ঢাকা, ২৮ নভেম্বর, ২০০০।

www.pathagar.com

৩ আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাপনা

- বিডিআরঃ সীমান্ত প্রহরী
- শত্রুভাবাপন্ন বিএসএফ
- বিডিআর'এর বীরোচিত ভূমিকা
- বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী : ভারতের চক্ষুশূল
- ভারতীয় সেনাবাহনীতে হিন্দুত্ববাদী জঙ্গীবাদ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বিডিআর ঃ সীমান্ত প্রহরী

বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত একমাত্র আধা-সামরিক বাহিনীর নাম 'বিডিআর' (বাংলাদেশ রাইফেলস) । সুঃসাহস, উদ্যম মনোবল, আত্মত্যাগ ও দেশপ্রেমের জন্য বিডিআর আমাদের অতি গর্বের ধন, অতন্দ্র প্রহরী। দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব–আর্থিক স্বার্থ, এমনকি আঞ্চলিক অখন্ডতা রক্ষার এবং শত্রু দেশের বিবিধ উস্কানী-আক্রমণ মোকাবেলায় প্রথম প্রতিরোধ বাহিনী বিডিআর। এই বাহিনীর রয়েছে দীর্ঘ গৌরবময় অতীত। দুইশত বছরের বেশী সময়ের ঐতিহ্য আত্মত্যাগ এবং বীরগাঁথা গৌরবময় ইতিহাসের যোগ্যতম উত্তরাধিকারী আজকের বিডিআর।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭২ সনের ৩ মার্চ বিডিআর নামে যে সীমান্তরক্ষী বাহিনী ঐতিহাসিক যাত্রা শুরু করলো এর মূল যাত্রা শুরু হয় ১৭৯৫ সনে। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী রামগড় লোকাল ব্যাটালিয়ন নামে এর প্রথম সূচনা ঘটায়। সঙ্গত কারণেই সময়ের প্রয়োজনে, সর্বোপরি মানচিত্র, দেশ, শাসন প্রভৃতির পরিবর্তন হওয়ায় বারবার এই বাহিনীর নাম দায়-দায়িত্ব পোশাক জনবল অস্ত্রবল ও প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া নানা বির্বতনের মাধ্যমে আজকের অবস্থানে পৌছায়। সব কিছুর বির্বতনে ঘটলেও আজকের বিডিআর অতীত ঐতিহ্য ধারন করে তার বীরত্ব,স্বদেশপ্রেম, আত্মত্যাগ ও কর্তব্যপরায়ণতা থেকে সামান্যতম বিচ্যুত হয়নি। এই অপ্রতিরোধ্য বাহিনীর ভাগ্যলিপিতে কেবল ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারী নারকীয় হত্যাকান্ডই একমাত্র কলঙ্ক, যা আমাদের অস্তিত্বের শত্রুরা উদ্দেশ্যমূলকভাবেই গভীর চক্রান্তের মাধমে এঁকে দিয়েছে। তথাপি একে নিয়েই আমাদেরকে এগুতো হবে। আসুন এর বিবর্তন ও বর্ণাঢ্য ইতিহাসের দিকে সংক্ষিপ্ত দৃষ্টি বুলাই।

দ্য ফ্রন্টিয়্যার প্রোটেকশন ফোর্স/রামগড় লোকাল ব্যাটালিয়ন (১৭৯৫-১৮৬০)

আজকের বিডিআর এর একেবারের আদি নাম 'ফ্রন্টিয়ার প্রোটেকশন ফোর্স'। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ইহা গঠন করে। অচিরেই এর নাম পরিবর্তন করে ১৭৯৫ সনে রামগড় লোকাল ব্যাটালিয়ান নামে নবযাত্রা শুরু হয়। ঐ সময়ে রামগড় অঞ্চলে সন্ত্রাস দমনের দায়িত্ব এই বাহিনীকে দেয়া হয়।

www.pathagar.com

ফ্রন্টিয়্যার গার্ডস (১৮৬১-১৮৯০)

১৮৬১ সনে রামগড় লোকাল ব্যাটালিয়ন পুনগর্ঠিত এবং আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ফ্রন্টিয়্যার গার্ডস তথা বেঙ্গল মিলিটারী পুলিশ নামে যাত্রা শুরু করে। একজন উর্ধবতন ওয়ারেন্ট অফিসার এর প্রধান ছিলেন। এর চারটি কোম্পানির মধ্যে তিনটি যথাক্রমে ঢাকা, কুমিল্লা,ও গ্যাঙ্গটক (সিকিমের রাজধানী) তে অবস্থান করত। ১৭৯৯ সনে এই বাহিনীর একটি ক্যাম্প ঢাকার পিলখানার সবুজ চত্বরে স্থাপিত হয়। এর নাম দেয়া হয় 'স্পেশাল রিজার্ভ কমপেক্' ।

বেঙ্গল মিলিটারী পুলিশ (১৮৯১-১৯১৯)

১৮৯১ সনে ফ্রন্টিয়ার গার্ডসকে আবার পুনগর্ঠিত করে নতুন নাম বেঙ্গল মিলিটারী পুলিশ দেয়া হয়।

ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়্যার রাইফেলস (১৯২০-৪৬))

বেঙ্গল মিলিটারী পুলিশকে আরো শক্তিশালী কর্মক্ষম করার উদ্দেশ্যে ১৯২০ সনে এর নতুন নাম দেয়া হয় 'ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়্যার রাইফেলস'। এর প্রধান দায়িত্ব ছিল সীমান্ত পাহারা দেয়া।

ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস–ইপিআর (১৯৪৭-১৯৭১)

১৯৪৭ সনে উপমহাদেশ বিভক্তির পর সময়ের প্রয়োজনে ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়্যার রাইফেলসকে নব পর্যায়ে পুনর্গঠন করে ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (ইপিআর) নামে সমগ্র পূর্ব পকিস্তানের সীমান্ত পাহারার দায়িত্ব দেয়া হয়। কলিকাতা আর্মড পুলিশের কিছু সদস্য এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অবসরপ্রাপ্ত ১০০০ সেনা সদস্যকে 'ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস' (ইপিআর) এর সাথে একীভূত করা হয়। সেনাবাহিনীর অফিসারদেরকে এ বাহিনীতে পাঠানো হয়। এর প্রধান দায়িত্ব ছিল সীমান্ত প্রতিরক্ষা এবং চোরাচালানী বন্ধ করা। ১৯৭১ সনে ২৫ মার্চ রাতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হওয়াকালীন এর সদস্য সংখ্যা ছিল ১৩,৪৪৫। এদের অধিকাংশই স্বাধীনতা যুদ্ধে সরাসরি অংশ নেয়।

বাংলাদেশ রাইফেলস (বিডিআর ১৯৭২-)

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার ১৯৭২ সনের ৩ মার্চ সাবেক 'ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস'(ইপিআর) সদস্যদের নিয়ে 'বাংলাদেশ রাইফেলস' এর যাত্রা শুরু

www.pathagar.com

হয়। ২০০২ সনে একবার এর পোশাক পরিবর্তন হলেও ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারী ঘটনার পর ২০০৯ সনে বর্তমান পোশাক প্রবর্তিত হয়।

বিডিআর-এর পূর্বসূরীরা প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধসহ বিভিন্ন যুদ্ধে সরাসরি অংশ নেয়। সাহসী ভূমিকার জন্য 'ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস' এর মেজর তোফায়েলকে সর্বোচ্চ সামরিক খেতাব 'নিশান-ই-হায়দার' এ ভূষিত করা হয়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একেবারে সূচনালগ্নেই 'ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস'এর সদস্যরা অস্ত্র হাতে তুলে নেয়। মহান মুক্তিযুদ্ধে অনন্য ভূমিকার জন্য ১৪২ জন সদস্যকে সম্মানজনক উপাদিতে ভূষিত করা হয়। ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ ও মুন্সি আবদুর রউফকে সর্বোচ্চ খেতাব বীরশ্রেষ্ঠ, আটজনকে বীর উত্তম, ৪০ জনকে বীর বিক্রম এবং ৯১ জনকে বীর প্রতীক উপাধি দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

বাংলাদেশ রাইফেলস এর সদর দফতর ঢাকা মহানগরীর পিলখানায়। এর ১১টি 'সেক্টর' হেডকোয়ার্টার যথাক্রমে খুলনা, কুষ্টিয়া, রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট, কুমিল্লা খাগড়াছড়ি, রাঙ্গমাটি ও চট্টগ্রামে অবস্থিত। ২০০৯ সনের ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারীতে বিডিআর' এর সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় ৪৫ হাজার। যদিও প্রতিপক্ষ ভারতের বিভিন্ন মাধ্যমে এর সংখ্যা ৬৮ হাজার বলে উল্লেখ্য করা হয়েছে।*

www.pathagar.com

www.pathagar.com

শত্রুভাবাপন্ন বিএসএফ

এই বাস্তবতা অনিস্বীকার্য যে, যতই বন্ধুভাবাপন্ন হোক না কেন, বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশই তার প্রতিবেশী দেশ থেকে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়। যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো সীমান্তে মাদকদ্রব্য ও মানব পাচারজনিত সমস্যা বিদ্যামান। উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া সীমান্ত কেমন ঝাঞ্জা-বিক্ষুব্ধ তা কারো অজানা নয়। পাকিস্তান-ভারত সীমান্তে যুদ্ধময় পরিস্থিতি বিরাজ করে। কিন্তু বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের মতো এমন বিপদজ্জনক সীমান্ত বিশ্বের অন্যত্র নেই, যদিও দুটি দেশই সরকারীভাবে অহরহ স্বীকার করে যে, তাদের মধ্যে অত্যন্ত চমৎকার বন্ধুত্ব-সুলভ সম্পর্ক রয়েছে। সরকারীভাবে কাগজে কলমে যা বলা হচ্ছে, বাস্তব পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে তার পরিপন্থী। দুটি দেশের মধ্যে সত্যিকার অর্থে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও সদ্ভাব বিদ্যমান থাকলে উভয় দেশই পারস্পারিক বুঝাপড়ার ম্যাধমে অভিন্ন সমস্যাগুলো দূরীভূত করতে উদ্যোগী হতো। কিন্তু তেমন সদ্ভাব নেই বললেই চলে।

প্রতিবেশী ছয়টি দেশের সাথে ভারতীয় সীমান্ত পাহারার দায়িত্ব বিএসএফ (বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স) নামক আধা-সামরিক বাহিনীর। এর সদর দফতর নতুন দিল্লী। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে মোতায়েনকৃত বিএসএফ এর উপ-পরিদফতর কলিকাতায়। ৫টি সীমান্ত ও ১৭টি সেক্টর ও একটি নৌ-শাখাসহ মোট ৬৬টি ব্যাটালিয়নের বিএসএফ সদস্যরা বাংলাদেশ সীমান্তে মোতায়েন রয়েছে। প্রত্যেকটি সীমান্ত (ফ্রান্টিয়্যার) এবং সেক্টর যথাক্রমে আইজি ও ডিআইজি'র নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। প্রত্যেক সেক্টর কয়েকটি ইউনিটে বিভক্ত। প্রত্যেক সেক্টরে তিন থেকে চার ব্যাটালিয়ন সদস্য রয়েছে। প্রতিটি ব্যাটালিয়ন সাতটি কোম্পানীতে বিভক্ত।

বাংলাদেশের সীমান্তে মোতায়েনকৃত ৬৬টি ব্যাটালিয়নের মধ্যে ৩০টি ব্যাটালিয়ন দক্ষিণ-উত্তর বাংলা সেক্টরে, ১১টি ব্যাটালিয়ন আসাম-মেঘালয় সেক্টরে, ১৫টি ব্যাটালিয়ন ত্রিপুরা সেক্টরে এবং ১০টি ব্যাটলিয়ন কাছাড়-মিজোরাম সেক্টরে মোতায়ন করা হয়েছে। সরকারীভাবে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে ৬৬ হাজার বিএসএফ সদস্য মোতায়েন রয়েছে বলে দাবী করা হলেও বাস্তবে এদের সংখ্যা ৮০ হাজারের ওপর। ২০০৭ সনে ১ মে নতুন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে ভারতীয় কর্মকর্তারা বাংলাদেশী কর্মকর্তাদেরকে

www.pathagar.com

উপরোক্ত তথ্য (৮০ হাজার বিএসএফ) অবহিত করেন।[১]

আধুনিক অস্ত্র-সজ্জিত বিএসএফ

বাংলাদেশ সীমন্তে মোতায়েনকৃত বিএসএফ সদস্যরা ইসরাইলে নির্মিত অত্যাধুনিক অস্ত্র ও যুদ্ধ সরঞ্জামে সজ্জিত। এছাড়া একটি বিশেষায়িত গ্রুপ প্রত্যেকটি ইউনিটের সদস্যদের উচ্চতর প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। সারা বিশ্বের সেরা অস্ত্রে বিএসএফ সজ্জিত হলেও ইদানিং ইসরাইল হতে আরো আধুনিকতর অস্ত্র এনে বিএসএফকে আরো শক্তিশালী করা হয়েছে। আমদানীকৃত অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে ঃ

১. স্নাইপার রাইফেল-গালিন
২. অ্যাসেল্ট রাইফেল-টেভর-২১
৩. এম-১৬ অ্যাসল্ট রাইফেল
৪. এমপিচি-১ স্নাইপার রাইফেল
৫. এমপি-৫ সাবমেশিনগান

উপরে বর্ণিত আধুনকি অস্ত্র ছাড়াও বিএসএফ'কে রাতের অন্ধকারে দর্শনযোগ্য বায়নোকুলারসহ আরো নানাবিধ সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়েছে।

বিডিআর'এর সমস্যা

বাংলাদেশ-ভারত দীর্ঘ বেরী সীমান্ত পাহারাদানে জনবল,অস্ত্র, শক্তি ও অন্যান্য সুবিধা এবং সম্পদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিএসএফ'র তুলনায় বিডিআর অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। সীমান্তের ভারতীয় অংশে ভূমি থেকে ছয়-সাত ফুট উঁচু পাকা রাস্তা রয়েছে। এসব সড়কে বিএসএফ সদস্যরা জীপ ও অন্যান্য যানবাহনযোগে দ্রুত যাতায়াত করতে পারে, যা তাদের নজরদারিকে অধিকতর কার্যকর ও সহজতর করেছে। এ সুবিধা তাদের সময় ক্ষেপন না করেই শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। উভয় দেশের মধ্যে গুলি বিনিময় কিংবা সংঘর্ষের সময় ভারতীয় অংশের উঁচু সড়ক বিএসএফকে রক্ষাত্মক সুবিধা দেয়। অন্যদিকে ভারত প্রায় অর্ধেকের বেশী সীমান্তে ইতোমধ্যে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ করেছে এবং বাকী অংশে বেড়া নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলেছে। এসব ব্যবস্থাদি বিএসএফ'কে নি:সন্দেহে বিডিআর এর

[১] Bangladesh Defence Journal, Dhaka, September issue, 2008.

www.pathagar.com

তূলনায় সীমান্ত পাহারায় সুবিধাজনক অবস্থানে নিয়ে গেছে।[২]
এখন পর্যন্ত সীমান্তের বাংলাদেশের অংশে কোন পাকা সড়ক নির্মিত হয়নি। বিডিআর জোয়ানরা তাই পায়ে হেঁটে সীমান্ত পাহারার দায়িত্ব পালন করে। এই কারণে সীমান্তের কোন অংশে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা কিংবা ভারতীয়দের অনুপ্রবেশের খবর পেলেও বিডিআর জোয়ানরা তাৎক্ষণিক অকুস্থলে হাজির হতে পারেনা। তাদের কাছে যেসব সেকেলে অস্ত্র রয়েছে সেগুলোর ব্যবহারের মেয়াদ বহু আগেই পুরিয়ে গেছে। সহজেই অনুমেয় যে, বিডিআর জওয়ানরা কত সামান্য শক্তি ও সম্পদ দিয়ে এই দীর্ঘ বৈরী সীমান্ত পাহারা দিচ্ছে। কেবলমাত্র তাদের অসামান্য সাহস, স্বদেশপ্রেম, ও আত্মত্যাগের মানসিকতাই তাদের এই দুরূহ দায়িত্ব পালনে সক্ষম করছে।
প্রচারণার ক্ষেত্রেও বিএসএফ বিডিআর'র তুলনায় সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম দলমত নির্বিশেষে বিএসএফ'র অনুকূলে জনমত তৈরি করে থাকে। অন্যদিকে বাংলাদেশী কোন কোন সংবাদ মাধ্যমের অবস্থান বিপরীত মেরুতে। বাংলাদেশের সীমান্তে বিএসএফ সদস্যদের অমানবিক আচরণ তথা হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, নির্যাতনের কোন সমালোচনা নেই। অন্যদিকে বাংলাদেশী কোন কোন সংবাদপত্র বিডিআর বিরোধী প্রচারণার অংশ হিসেবে বাংলাদেশে ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদী জঙ্গীদের ঘাঁটি রয়েছে এমন সংবাদ পরিবেশন করে মূলত: ভারত তথা বিএসএফ'র দাবীর অনুকূলে কাজ করছে। দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে দুর্বল ও বিতর্কিত করার লক্ষ্যে ভারতীয় নীতি-অবস্থান ও স্বার্থের অনুকূলে এসব সংবাদ মাধ্যম ভারতের মুখপত্র হিসেবে কাজ করছে, যা বিডিআর'এর মনোবলকে নিশ্চিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।
সীমান্ত পাহারা দেয়ার ক্ষেত্রে বিএসএফ বিশেষ এলাকার ওপর তথাকথিত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার কৌশল ব্যবহার করে। কোন এলাকায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মানে হলো সীমান্তে মানুষ ও মালামালের অবৈধ গমনাগমনের বাধা সৃষ্ঠি করা। এই বাধা দুই ধরনের – কৃত্রিম এবং মানব-সম্বলিত। কৃত্রিম বাধা হলো উচু কাঁঠাতারের বেড়া এবং এর সমান্তরাল পাকাসড়ক। বেড়া মানুষের

---

[২] Brig. Gen.Shamsuddin Ahamed, Forum– A monthly publication of the Daily Star, Dhaka, April, 2009.

www.pathagar.com

অনুপ্রবেশে বাস্তব বাধা হিসেবে কাজ করে। অন্যদিকে পাকা সড়ক বিএসএফ'কে দ্রুত আরামে এবং নিরাপদে দূরবর্তী স্থানে যাতায়াতে সাহায্য করে। অন্যদিকে মানব-সৃষ্ঠ বাধা হলো সীমান্ত চৌকি, চেক পয়েন্ট, পর্যবেক্ষণ টাওয়ার, পায়ে হেঁটে ভ্রাম্যমান পাহারা, স্থল ও নৌযানের ব্যবস্থা। রাত্রিকালীন পাহারায় জন্য প্রতি ৩০০ গজ পরপর চেকপোষ্ট রয়েছে। যেখানে তিন থেকে চার জন বিএসএফ সদস্য মোতায়েন থাকে। ভারতীয় ভূখন্ডের অনুপ্রবেশ রোধে সীমান্তের গোপন স্থানে টহল দল ওঁৎ পেতে থাকে। চোরাচালান বা অনুপ্রবেশের কোন তথ্য পেলে বিএসএফ স্থানীয় পুলিশের সহযোগিতায় যৌথ অভিযান চালায়। বিশেষ নজরদারি এবং নতুন সীমান্ত গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক গড়ে তোলায় বিএসএফ'র সীমান্ত পাহারা ব্যবস্থাপনা বিডিআর, এর তুলনায় বহুলাংশে সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, প্রাথমিক অবস্থায় ভারতীয় সীমান্ত চৌকিগুলো নয় মাইল পর পর কিংবা তারও বেশী দূরবর্তী স্থানে ছিল। বিএসএফ'এর অবস্থান ছিল হালকা-পাতলা ধরনের ছড়িয়ে ছিটিয়ে। ফলে সীমান্ত পাহারা ছিল চরমভাবে অকার্যকর। এ অবস্থায় ভারতীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সীমান্ত চৌকিগুলোর দূরুত্ব ২.৫ কি. মি. কিংবা ৩.৫ কি. মিটারে কমিয়ে আনতে সুপারিশ করে। তবে ভৌগলিকভাবে দুর্গম ও বন্ধুর স্থানসমূহে এ সুপারিশ কার্যকর নাও হতে পারে। অন্যদিকে স্পর্শকাতর এলাকার চৌকিগুলোতে এক প্ল্যাটুনের পরিবর্তে এক কোম্পানী বিএসএফ সদস্য মোতায়েনের সুপারিশ করা হয়েছে।

সীমান্তে বিএসএফ'এর অবস্থান জোরদার করার জন্য ভারত সরকার ট্রান্স-ফ্রন্টিয়্যার ইন্টিলিজেন্স এজেন্সি (টিআইএ) আন্ত:সীমান্ত গোয়েন্দা সংস্থা গঠন করেছে। এই সংস্থা বাংলাদেশ সীমান্তে বিবিধ ধরনের গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করে, যা বিএসএফ'এর কর্মদক্ষতা ও ক্ষিপ্রতা বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও নন-কমিশনড অফিসারদের এ সংস্থায় নেয়া হয়েছে, যারা ইতোপূর্বেই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। তথ্য সংগ্রহণার্থে তাদেরকে প্রায়ই বাংলাদেশে প্রেরণ করা হয়।*

www.pathagar.com

বিডিআর'এর বীরোচিত ভূমিকা

বাংলাদেশের ৪,৪৫৬ কি.মি সীমান্ত পাহারা ও রক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব আধা-সামারিক বাহিনী বিডিআর এর ওপর ন্যস্ত। অত্যন্ত নিষ্ঠা ও যোগ্যতার সাথে তারা এ দায়িত্ব পালন করছে। সীমিত শক্তি দিয়ে সীমান্তে চোরাচালান যতদূর সম্ভব বন্ধ করে তারা বাংলাদেশের অর্থনীতি ও শিল্প কারখানা সচল রাখতে সাহায্য করে। বিভিন্ন সময়ে দেশের অভ্যন্তরে সরকারের বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে জনকল্যাণমূলক কাজে এবং আইন-শংখলা রক্ষায় বিডিআর সম্ভাব্য সবক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে।

সীমান্ত রক্ষার প্রধান দায়িত্ব ছাড়াও বিডিআর বিভিন্ন সামরিক অভিযানে তাদের সাহস, শৌর্য, শৃংখলা স্বদেশপ্রেমের অত্যুজ্জল প্রমাণ রেখেছে। চোরাচালান, অবৈধ জবরদখল, অনুপ্রবেশ, আন্তঃসীমান্ত অপরাধ, চুরি-ডাকাতি, অপহররণ, শিশু ও নারী পাচার, সীমান্ত খুঁটি স্থানান্তর রোধ, সীমান্ত হামলা প্রতিরোধে বিডিআর প্রশংশনীয় ভূমিকা পালণ করে। এছাড়া বিরোধ পূর্ণভূমি এবং অপদখলীয় এলাকা ব্যবস্থাপনায়, শূন্যরেখা (১৫০) গজ বরাবর স্থাপনা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, সীমান্ত নদীর গতি এবং সীমানা চিহ্নিত হয়নি এমন ভূমির ওপর নজরদারী বিডিআর এর কর্ম পরিধির অন্তর্ভূক্ত।

দূর্ভাগ্যবশত: একেবারে রক্ষণাত্নক অবস্থানে থাকা সত্বেও বিডিআর'কে প্রতিদিনই বিএসএফ'এর উস্কানিমূলক তৎপরতার কারণে তাদের সাথে সীমিত আকারে হলেও সংঘর্ষে তথা লড়াইয়ে লিপ্ত হতে হয়। যাদের সীমান্ত অঞ্চলে বসবাসের অভিজ্ঞতা নেই, তারা বুঝতে পারবেন না কেমন অস্থিতিশীল অশান্ত ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশ সেখানে বিরাজ করছে। অধিকাংশ সীমান্ত চৌকিতে বিডিআর-বিএসএফ'এর অনুপাত হলো ১:১০। বিএসএফ প্রায় সারাদিনই বিডিআর'কে সংঘর্ষে লিপ্ত থাকতে প্ররোচিত করে যাতে চোরাচালান ও অন্যান্য দুষ্কর্ম নির্বিঘ্নে চলে। এমন দিন খুব কমই অতিবাহিত হয়, যখন সীমান্তে কোন না কোন বিডিআর সদস্যদের রক্ত ঝরে না। তথাপি আমাদের বিডিআর'এর বীর জোয়ানরা সংখ্যা ও অস্ত্রবলে বহুলাংশে দুর্বল হলেও কেবলমাত্র স্বদেশপ্রেমে বলিয়ান হয়ে বিএসএফ'কে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নিয়ন্ত্রণে রাখছে। বিডিআর'এর সাবেক মহাপরিচালক মেজর জেনারেল ফজলুর রহমানের বর্ণনা মতে পদুয়া ও রৌমারিতে বিডিআর'এর হাতে

www.pathagar.com

বিএসএফ এর বিব্রতকর পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে ভারত সব সময় বিডিআর'এর উপর মরণাত্মক আঘাত হানার চক্রান্ত আঁটছিল। বিডিআর জোয়ানরা যুদ্ধক্ষেত্রে অতীব দুর্দান্ত এবং সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমে সীমান্ত পাহারা দিচ্ছে। প্রতিদিন তাদের রক্ত ঝরছে। সাম্প্রতিক সময়ে বিডিআর' এর বিরুদ্ধে যে বিরূপ জনমত তৈরি করা হয়েছে, তা কোনভাবেই এই আধা-সামরিক বাহিনীর জন্য শুভ নয়। অকেজো নৈতিকভাবে দুর্বল বিডিআর কাদের স্বার্থে ও উপকারে আসে তা অনুধাবনে তেমন বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন নেই। ভারত সরকার সব সময়ই বিডিআরকে চরম ঘৃণার চোখে দেখে এবং তাদের সাথে চরম অবমাননামূলক আচরণ করে। দুর্বল ও ক্ষত-বিক্ষত ছিন্নভিন্ন বিডিআর, এমনকি সম্ভব হলে বিডিআর এর অবলুপ্তি সম্পূর্ণরূপে ভারতের স্বার্থের অনুকূলে যাবে। কার্যকর ও সুশৃংখল বিডিআর এর উপস্থিতিতে বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সীমান্ত পাহারাকে দুর্বল করা ভারতের জন্য বিরাট বাধা বিশেষ। ভারত বহুদিন থেকে এ বাধা উপড়ে ফেলতে সক্রিয় চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে।

বিডিআর মূলত: ভারতের আগ্রাসী স্বপ্ন বাস্তবায়নে চরম বাধা হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। চোরাচালান রোধ ছাড়াও বিডিআর ভারতীয়দের পুশ-ইন চক্রান্ত এবং অনুপ্রবেশ প্রতিহিত করাসহ নানাবিধ সীমান্ত অপরাধ দমনে কার্যকর ভূমিকা রাখায় ভারত ক্ষুব্ধ । তদুপরি বিডিআর তথাকথিত পরাশক্তিসুলভ দাদাগিরি ও আস্ফালনকে ধূলায় মিশিয়ে দিয়েছে। যখনই বিএসএফ বাংলাদেশের কোন এলাকা দখলে সচ্ছেষ্ট হয়েছে, বিডিআর তাৎক্ষণিক তা সাফল্যের সাথে ব্যর্থ করে দিয়েছে। ২০০১ সনে পদুয়া ও রৌমারিতে বিএসএফ'এর চরম পরাজয় ভারতীয়দের মনে তীব্র বেদনা ও প্রতিশোধ স্পীহা জাগিয়েছে।

বিএসএফ'এর এই সব অবমাননাকর পরাজয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে ভারতীয় কলামিষ্ট নান্নুধি কাউর লিখেছেন:

"The latest trouble on the eastern border began on the night of April 15-16, when the Bangladesh Rifles (BDR) captured the Indian-held Pyrdwah (Padua) village. The Border Security Force (BSF) was caught unaware. Intelligence failure on the Indian side was obvious. Worse, after the Pyrdwah offensive, the Union Home Ministry felt that something drastic had to be done. It gave orders to overrun a post at the Bangladeshi village of Boraibari

www.pathagar.com

and destroy house as an act of retaliation against the BDR's occupation of border of Pyrdwah."[১]

(ভাবানুবাদঃ ১৫-১৬ এপ্রিল (২০০১) রাতে পূর্ব সীমান্তে গোলমাল শুরু হয়। যখন ভারতের অধিকৃত গ্রাম পদুয়া বাংলাদেশ রাইফেলস (বিডিআর) দখল করে নেয়। ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বিএসএফ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ বেমালুম ছিল। ভারতীয় পক্ষে গোয়েন্দা তৎপরতা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। সবচেয়ে বিব্রতকর দিক হল, পদুয়া আক্রমণের পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কঠোর কিছু করায় বিষয়টি ভাবে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পদুয়া দখলের প্রতিশোধ হিসেবে বড়াই বাড়ী গ্রামের একটি সীমান্ত চৌকি দখল এবং তা ধ্বংস করার নির্দেশ দেয়।)

ভারতীয় সাময়িকী 'ফ্রন্টলাইন' এর ঢাকা প্রতিনিধি বাংলাদেশী সাংবাদিক হারুন হাবিব পদুয়া ঘটনার পটভূমির বিশদ বিবরণ তুলে ধরেন ঃ

"Padua or Pyrdwah in Sylhet Tamabil area adjoining Meghalaya has been a Bangladeshi enclave that has been controlled as land of "adverse possession" by India since Bangladesh War of Liberation in 1971. During this war Bengali (Bengalee) freedom fighters set up a camp in this strategic border village. As India gave all out assistance to the freedom struggle, the BSF also used the camp. The BSF did not withdraw from the camp after the war was over. Padua, however, did not become an issue, because the two neighbours had bigger bilateral problems to resolve. The construction of a pucca road by the BSF connecting Padua with the mainland (India) reported raised the hackles of the BDR. Alleging that the construction of the road was illegal, "violating international laws and India-Bangladesh border agreement," the BDR asked for a flag meeting. As its request went unheeded, the BHDR launched action on the night of April 15 and "recaptured" Padua "without any bloodshed."[২]

(ভাবানুবাদঃ ভারতের মেঘালয় সীমান্তবর্তী সিলেটের তামাবিল অঞ্চলে পদুয়া একটি বাংলাদেশী ছিটমহল, যা ১৯৭১ সনের মুক্তি যুদ্ধের সময় থেকে

[১] NAUNIDHI KAUR, The dividing line, FRONTLINE, Chennai, India, 25 May, 2001.

[২] HAROON HABIB, FRONTLINE, Chennai, India, May 25, 2001.

www.pathagar.com

অপদখলীয় হিসেবে ভারতের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এই যুদ্ধের সময় বাঙ্গালী মুক্তিযোদ্ধারা কৌশলগত এই সীমান্ত গ্রামে শিবির স্থাপন করে। যেহেতু মুক্তি সংগ্রামে ভারত সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেছে, সে সুবাদে বিএসএফও এই শিবির ব্যবহার করত। যুদ্ধশেষে বিএসএফ এই শিবির থেকে প্রত্যাহার করেনি। প্রতিবেশী দুই দেশের মধ্যে আরো বড় ধরনের বিব্রতকর সমস্যা সমাধানের অপেক্ষায় থাকায় পদুয়া তেমন উল্লেখযোগ্য বিষয় হিসেবে গুরুত্ব পায়নি। ভারতের মূল ভূখন্ডের সাথে পদুয়ার সংযোগ সাধনের জন্য একটি পাকা সড়ক নির্মাণে বিএসএফ উদ্যোগ নিলে বিডিআর তৎপর হয়ে উঠে। সড়ক নির্মাণ অবৈধ," আন্তর্জাতিক আইনের এবং ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত চুক্তির লঙ্ঘন বিধায়" বিডিআর বিএসএফ'কে পতাকা বৈঠকে বসার অনুরোধ করে। এই অনুরোধ কোন আমলে না নেয়ায় ১৫ এপ্রিল রাতে বিডিআর তৎপর হয়ে "বিনা রক্তপাতে" পদুয়া দখল করে নেয়।)

পদুয়ায় ভারতীয় বিএসএফ'র পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের প্রক্রিয়ার বিশদ বিবরণ দিয়ে হারুন হাবিব একই সাময়িকীতে লিখেছেন:

"Even before the shock of Padua subsided came the attack on Baroibari, 80km from Padua, in the Roumari-Mankerchar area adjoining Assam. In a pre-dawn action on April 18, 2001 as the accounts in major Bangladesh dailies put it, nearly 300 heavily-armed BSF jawans entered Roumari to attack the Baroribari post, reportedly to avenge the "defeat" at Padua. Baroibari is also a land of "adverse possession" under Bangladesh's control. The BSF suffered heavy losses in the April 18-19 clashes. As the story goes, when the BSF opened fire on a BDR camp the BDR personnel did not retaliate immediately, giving the impression that there was nobody inside the camp. But they struck when the BSF moved closer to the camp. With the help of quick reinforcements from the nearby border posts and the support of the people of the village, the BDR launched a full-scale counterattack. Heavy exchange of fire continued for more than two days, forcing nearly 10,000 people to flee their homes. The bodies of BSF men were lying in the paddyfield for more than two days as the fight continued. The people recovered several bodies from the field and handed them over to BDR later. Two injured BSF men were

www.pathagar.com

flown to Dhaka by helicopter for treatment."[৩]
(ভাবানুবাদঃ পদুয়া পরাজয়ের ব্যথা প্রশমিত হবার আগেই পদুয়া হতে ৮০ কি.মি. দূরে আসাম-সংলগ্ন রৌমারী-মাইনকার চর এলাকার বড়ইবাড়ী আক্রমণের ঘটনা ঘটে। ১৮ই এপ্রিল (২০০১) একেবারে প্রত্যুষে অধিকাংশ বাংলাদেশী সৈনিকের ভাষ্যমতে পদুয়ার প্রতিশোধ গ্রহণার্থে ভারী অস্ত্রসজ্জিত প্রায় তিনশত বিএসএফ জওয়ান বড়ইবাড়ী বিডিআর চৌকি আক্রমণ করার জন্য রৌমারিতে প্রবেশ করে। বড়ই বাড়ীর 'অপদখলীয়' বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রিত ভূমি। ১৮-১৯ এপ্রিলের সংঘর্ষে বিএসএফ মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়ে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ বিএসএফ হামলা চালালে বিডিআর তাৎক্ষণিক প্রতিশোধ গ্রহণার্থে গুলিবর্ষণ করেনি, বিএসএফ'কে এ ধারণা দেয়ার জন্যই যে ঐ শিবিরে কেউ নেই।
নিকটবর্তী সীমান্ত চৌকি হতে দ্রুত বিডিআর সদস্যদের সমাবেশ ঘটিয়ে এবং স্থানীয় গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় বিডিআর পূর্ণাঙ্গ পাল্টা হামলা চালায়। দু'দিনের বেশী সময় ধরে ব্যাপক গোলাগুলি বিনিময় চলে। ১০ হাজার গ্রামবাসী তাদের ঘর-বাড়ী থেকে পালিয়ে যায়। যুদ্ধ অব্যাহত থাকার কারণে বিএসএফ সৈন্যদের লাশ দু'দিনেরও বেশী সময় ধরে ধানক্ষেতে পড়ে থাকে। স্থানীয় জনগণ মাঠ থেকে বেশ ক'টি লাশ উদ্ধার করে বিডিআর এর কাছে হস্তান্তর করে। আহত দুইজন বিএসএফ সদস্যকে চিকিৎসার জন্য হেলিকপ্টারযোগে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়। (হাবিব হারুন, পূর্বোক্ত)
উল্লেখ্য যে, ভারত অতর্কিতে এককভাবে বিনা উস্কানীতে গোপনে বিএসএফ হায়েনাদের বাংলাদেশ ভূখন্ডে প্রবেশের নির্দেশ দেয়। বাংলাদেশী গ্রামবাসীদের মাধ্যমে ওয়াকিবহাল হয়ে বিডিআর জোয়ানরা সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে শত্রুবাহিনীর ওপর পাল্টা হামলা চালিয়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে। বিএসএফ সৈন্যরা তাদের লজ্জা ঢাকার জন্য তাদের মৃত সহকর্মীদের অসংখ্য লাশ নিয়ে ভারতীয় ভূখন্ডে সরে যায়। এতদসত্বেও বাংলাদেশ ভূখন্ডে ১৬টি লাশ ধানক্ষেত্রে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে, যেগুলো বিএসএফ সদস্যরা খুঁজে পায়নি। বিডিআর'এর তৎকালীন মহাপরিচালক মেজর জেনারেল ফজলুর রহমান জানান, তিন শতাধিক বিএসএফ সদস্য বাংলাদেশ ভূখন্ডে অনুপ্রবেশ করে। এদের মধ্যে ১৩৭ জন নিহত হয়। অভিযানে তিনজন বিডিআর সদস্য

[৩] HAROON HABIB, FRONTLINE, Chennai, India, 25 May, 2001.

www.pathagar.com

শহীদ হন। ইহা ছিল ভারতরে জন্য চরম অপমানজনক পরাজয়। বিডিআর সদর দফতর ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেয়ার জন্য ভারতীয় লোক সভায় দাবী জানানো হয়। পদুয়া ও বড়ইবাড়ীতে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার উদ্দেশ্যে পরবর্তী বছর বিএসএফ আখউড়ায় বিডিআর শিবিরে আক্রমণ করে। বিডিআর বিএসএফ'এর আক্রমণ প্রতিহত করে। এতে বিএসএফ তার জনৈক কোম্পানী কমান্ডারকে হারায়। এই ঘটনার পর ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, ভারত কোন অবস্থাতেই তার পোশাকের অর্থ্যাৎ সশস্ত্রবাহিনীর অবমাননা সহ্য করবেনা। ভারতের তৎকালীন স্বরাষ্ট্র বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী সি. আই. ডি. সোয়ামী দাবী করেন যে, ১৬ জন বিএসএফ সদস্যদের হত্যাকারীদের শাস্তি দিলেই বাংলাদেশ ভারতের আস্থা অর্জন করতে পারবে। তদানুযায়ী ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ বিএসএফ সদস্যদের কথিত হত্যাকারীদের একটি তালিকা প্রস্তত করে। কথিত এই তালিকায় তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আহসান নাজমুল আলিম চৌধুরী, ময়মনসিংহ ডিভিশনের কমান্ডার মেজর জেনারেল ওয়াহাব, রংপুর ডিভিশনের কমান্ডার মেজর জেনারেল আব্দুল মতিন, চট্টগ্রাম ডিভিশনের কমান্ডার মেজর জেনারেল কবির এবং বিডিআর'এর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল ফজলুর রহমান প্রমূখের নাম রয়েছে। ভারতীয় মন্ত্রী হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, দ্বিতীয়বার এমনটি ঘটলে ভারত অপ্রস্তুত থাকবে না, অর্থাৎ সে ক্ষেত্রে ভারত-বাংলাদেশ আক্রমন চালাবে।[৪]*

[৪] The Hindu, Chennai, India, 26 April, 2001.

www.pathagar.com

বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী ঃ ভারতের চক্ষুশূল

১৯৭১ সনের ১৬ জিসেম্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণের আগেই ভারত বাংলাদেশকে পদানত করার সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছিল। একই উদ্দেশ্যে ভারতে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর ভ্রূণ হত্যার ক্ষেত্রেও প্রস্তুত করে রাখে। কারণ ভারতীয় নীতি-নির্ধারকদের এই দূরদৃষ্টি ছিল যে, তাদের আধিপত্যবাদী আগ্রাসন ও অখন্ড ভারত প্রতিষ্ঠার পক্ষে বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী চরম বাধা হয়ে দাঁড়াবে। বাংলাদেশে পেশাদার সশস্ত্রবাহিনী গঠন ও লালন প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে ভারত ১৯৭১ সনের নভেম্বর মাসে ভারতে আশ্রিত প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারকে এক অসম আত্মহত্যাসম চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য করে। এই চুক্তির দু'টির শর্ত ছিল সশস্ত্রবাহিনী সংক্রান্ত। এসব শর্তে বলা হয়:

১. ভারতীয় সামরিক বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশে একটি আধা-সামরিক বাহিনী গড়ে তোলা হবে, যা বাংলাদেশের সেনাবাহিনী থেকে শক্তিধর ও অধিকতর কার্যকর হবে।

২.বাংলাদেশ তার সমুদয় সামরিক যন্ত্রপাতি ভারত থেকে সংগ্রহ করবে। এবং (ঐগুলো) ভারতীয় সামরিক বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বধানে থাকবে।

১৯৭২ সনে বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান ঐ অসম চুক্তি এবং ভারতীয় চাপ অবজ্ঞা করে পেশাদার নিয়মিত সশস্ত্র বাহিনীর গোড়া পত্তন করেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীতে কর্মরত বাংলাভাষী সদস্যদের সমন্বয়ে, যাদের অধিকাংশই মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, সীমিত জনবল ও সম্পদ দিয়ে সীমিত পরিসরে বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর যাত্রা শুরু হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের মওজুদকৃত পাকিস্তান সশস্ত্রবাহিনীর সমুদয় অস্ত্র ও সামরিক যানবাহন লুট করে ভারতে নিয়ে যায় বিধায় বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীকে শূন্যহাতে যাত্রা শুরু করতে হয়।

তথাপি বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী গঠন ভারত সরকার এবং তাদের বাংলাদেশী 'চর'দের তীব্র বিরোধিতার মুখে পড়ে। তাদের যুক্তি ছিল যেহেতু বাংলাদেশের তিনদিকের সীমান্ত বন্ধুরাষ্ট্র ভারতবেষ্টিত এবং দক্ষিণের সমুদ্রে ভারতীয় নৌবাহিনীর ব্যাপক উপস্থিতি বিদ্যমান, তাই বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনীর কোন

www.pathagar.com

প্রয়োজন নেই। এ ধরনের যুক্তি, ভারতের সাথে গভীর সম্পর্ক এবং ভারতের চাপ উপেক্ষা করে বাংলাদেশের নীতি-নির্ধারকরা সশস্ত্রবাহিনী গঠন ও লালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং দূরদর্শিতার সাথে ক্ষুদ্রাকার এ বাহিনীর জনবল ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করে একে আধুনিক বাহিনীতে পরিণত করেন, যা কালক্রমে বিডিআর, পুলিশ-আনসার, গ্রাম পুলিশ, সর্বোপরি জনগণের সহযোগিতায় বিদেশী হামলা প্রতিহত করতে মোটামুট ক্ষমতা অর্জনে সক্ষম হয়। এ ধরনের যৌথ জনপ্রতিরোধ যেকোন শক্তিধর আগ্রাসী হামলা প্রতিহত করে স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখবে। বাংলাদেশের সুদূরপ্রসারী রণকৌশল অনুধাবণ করে ভারত নব্য প্রতিষ্ঠিত সশস্ত্রবাহিনীকে ব্যর্থ ও ধ্বংস করার জন্য প্রকাশ্য ও গোপন চক্রান্তের আশ্রয় নেয়।

বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীকে ভেঙ্গে দিয়ে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে ১৯৭৫ সনের মধ্য-আগস্টে ভারত জঘন্য ও দুঃসাহসিক ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের অপচেষ্টা চালায়। সৌভাগ্যবশতঃ ঐ চক্রান্ত অঙ্কুরেই ব্যর্থ হয়। ১৯৭৫ সনের ১৪ আগষ্ট নোয়াখালী জেলার রামগতি থানাধীন তোরাবগঞ্জের চরাঞ্চলে ভারতীয় বিমান বাহিনীর একটি হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়। হেলিকপ্টারে থাকা ভারতীয় সেনাবাহিনীর দুইজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ঘটনাস্থলেই নিহত হন। পরবর্তী দিন তাদের লাশ কলিকাতায় পাঠনো হয়। কলিকাতার দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা ও আজকাল এবং নয়াদিল্লী থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'রেইডিঅ্যান্স'সহ কতিপয় ভারতীয় সংবাদপত্র বারবার প্রশ্ন তোলে কেন হেলিকপ্টারটি ঐ দুইজন ভাগ্যাহত সেনা কর্মকর্তাকে নিয়ে বাংলাদেশের আকাশ সীমায় প্রবেশ করে বাংলাদেশের একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভেঙ্গে পড়ে। ভারত সরকার আজ পর্যন্ত ঐ ঘটনা সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্য করেনি। বাংলাদেশের সরকারী মহল একই পন্থা অনুসরণ করে আজ পর্যন্ত এ ব্যাপারে মুখ খোলেনি। তথাপি বিভিন্ন কঠোর গোপনীয়তা, আইনী প্রতিবন্ধকতা এবং সরকারী ও কূটনৈতিক নিষেধাজ্ঞা পেরিয়ে এই অতি স্পর্শকাতর খবর বিমানবাহিনী সদর দফতর ও ঢাকা সেনানিবাসে ফাঁস হয়ে যায়। এতে বলা হয় যে, বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বাহিনী ভেঙ্গে দিয়ে একে আগরতলাস্থ ভারতীয় সেনাবাহিনীর কমান্ডের অধীনস্ত করার একটি গুরুতর ও স্পর্শকাতর চুক্তির কপি নিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর দুইজন উর্ধতন কর্মকর্তা হেলিকপ্টার যোগে ঢাকায় আসেন। অন্যান্যের মধ্যে তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান ঐ

www.pathagar.com

চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এরপর হেলিকপ্টারটি সেনা কর্মকর্তাদ্বয়কে নিয়ে আগরতলায় যায়। চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ভারতীয় কর্মকর্তাদের অভিহিত করে হেলিকপ্টারটি কর্মকর্তাদ্বয়কে নিয়ে আগরতলা হতে কলিকাতার পথে যাত্রা করে। ইতোমধ্যে বিষয়টি যেহেতু এয়ার হেডকোয়ার্টার ও ঢাকা সেনানিবাসে ছড়িয়ে পড়েছে তাই সশস্ত্র বাহিনী ও দেশরক্ষার তাগিদে দেশপ্রেমিক বিমান বাহিনী হেলিকপ্টারটিকে ভূপাতিত করে এই গভীর চক্রান্তটি ব্যর্থ করে দেয়।[১]

দৈনিক সংগ্রামে অতি সম্প্রতি এই দুর্দান্ত স্পর্শকাতর তথ্য প্রকাশিত হবার পর ভারতীয় দূতাবাস কিংবা বাংলাদেশ সরকার এ ব্যাপারে কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেনি। অন্যদিকে আমি আমার রচিত 'BDR Massacre: Target Bangladesh' শীর্ষক গ্রন্থে দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশিত তথ্যটি উদ্ধৃত করেছি। গ্রন্থটি ডিজিএফআই, ভারতীয় দূতাবাসসহ বিভিন্ন মহলে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু কোন মহল থেকে এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া কিংবা প্রতিবাদ আসেনি। এর মানে হলো, দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশিত তথ্যটি যথার্থথ ও সঠিক। নোয়াখালীতে যে একটি ভারতীয় হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়েছিল, তা ঐ সময়কার ঢাকার দৈনিক পত্রিকায় এসেছিল। কিন্তু কোন বাড়তি মন্তব্য বা কারণ বলা হয়নি। উল্লেখ্য যে, ঐ সময়ে বাংলাদেশে সংবাদপত্রের কোন স্বাধীনতা ছিল না। চারটি দৈনিকই ছিল সরকারী নিয়ন্ত্রণে। সম্ভবত: এই কারণেই ভারতীয় হেলিকপ্টার বিধ্বস্থ হবার খবর প্রকাশিত হলেও এর কারণ প্রসঙ্গে কিছুই বলা হয়নি। কিংবা তদন্তও অনুষ্ঠিত হয়নি। ঠিক এর পর দিন শেখ মুজিব নিহত হবার কারণে বিষয়টি একেবারে ধামাচাপা পড়ে যায়। অন্যথায় হয়তো এ নিয়ে লঙ্কাকান্ড ঘটে যেত।

ভারতের এই জঘন্য খেলা ব্যর্থ হবার পরেও বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীর বিরুদ্ধে ভারতীয় চক্রান্ত থেমে যায়নি। বরং এ চক্রান্ত আরো বহুগুণে বেড়ে যায়। একে চিরতরে নির্মূল করার জন্য ভারত তার 'চর'দের মাধ্যমে তথাকথিত 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলে। তাছাড়া ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা অভ্যুত্থান ও পাল্টা-অভ্যুত্থানে ইন্ধন যুগিয়ে প্রতিরক্ষা বাহিনীর বহু সৈনিক ও অফিসারকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। প্রেসিডেন্ট

---

[১] মোঃ নুরল আমিন, উপ-সম্পাদকীয়, দৈনিক সংগ্রাম, ২৪ মার্চ, ২০০৯।

www.pathagar.com

জিয়াকে হত্যার উদ্দেশ্যে উপর্যুপরি ১৯টি অভ্যুত্থানের পরপরই প্রতিরক্ষা বাহিনীর বিপুল সংখ্যক সৈন্যকে সঙ্গত কারণেই কোর্ট মার্শালের মুখোমুখি হতে হয়। এতদসত্বেও ভারতীয় চক্রান্তের মধ্যে বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বাহিনী আজ শক্ত অবস্থানে থেকে সারা বিশ্বের প্রশংসায় অভিষিক্ত।

বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বাহিনী নিজস্ব দক্ষতা, সাহসিকতা, দায়িত্বপরায়ণতা, অনন্য নিষ্ঠা ও শৃংখলাবোধের জন্য বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্যতার শীর্ষে অবস্থান করা সত্বেও ভারত তার 'মাসোহারা' প্রাপ্ত 'চর'দের মাধ্যমে প্রতিরক্ষা বাহিনীর অপ্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রচারণা অব্যাহত রেখেছে। আমাদের একশ্রেণীর চিহ্নিত রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, ছাত্র সংগঠন, সাংবাদিক, প্রমূখ প্রকাশ্যে বিশাল ভারতীয় বাহিনীর বিপরীতে আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনীর কার্যকারিতা ও প্রয়োজনীতা প্রসঙ্গে নানা অবান্তর প্রশ্ন ও যুক্তি উত্থাপন করে। অযৌক্তিক বক্তব্যকে যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করে ভারতমূখী এসব তাবেদার প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য যে সামান্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়, তা বাতিল করে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ অন্যান্য খাতে ব্যবহারের দাবী তোলে। ভারতপন্থী হিসেবে পরিচিতি একটি দৈনিকের সম্পাদক মতিউর রহমান ১৯৯৯ সনে প্রকাশিত একটি নিবন্ধে লিখেছিলেন যে, ধরাধামে নাকি বাংলাদেশের কোন শত্রু নেই। শেখ হাসিনার দ্বিতীয় মেয়াদের অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব স্ট্যাটিজিক স্ট্রাডিজ (বিআইএসএস) এক সেমিনারে প্রতিরক্ষা বাহিনী তুলে দেয়ার জন্য পরোক্ষভাবে ওকালতি করেছিলেন। পিলখানায় সেনা কর্মকর্তাদের নির্মম হত্যার ঘটনাকে ভিন্নখাতে ঘুরিয়ে দেয়ার জন্য শেখ হাসিনার বাণিজ্যমন্ত্রী ফারুক খান প্রকাশ্যে দাবী করেছেন যে, প্রতিরক্ষা বাহিনীর বিভিন্ন স্তরে জঙ্গীপণার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। শেখ হাসিনার পুত্র সজিব ওয়াজেদ তথাকথিত এক গবেষণাপত্রে দাবী করেছেন, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নিয়োগপ্রাপ্তদের ৩৫ শতাংশ নাকি মাদ্রাসায় শিক্ষা নিয়ে এসেছেন। ওয়ালিয়ার রহমান নামক ভারতমুখী জনৈক সাবেক কূটনীতিক সম্ভবতঃ শেখ হাসিনার আশীর্বাদ পাবার উদ্দেশ্যে সজীব ওয়াজেদের কথিত গবেষণায় বর্ণিত পরিসংখ্যান সমর্থন করেন। একই ভূয়া পরিসংখ্যান ও দাবীর অনুকূলে ঢাকার এবং ভারতের সংবাদ মাধ্যমে বেশ হৈচৈ পড়ে। এতে বুঝা যায় সেনাবাহিনীর দুর্দিনে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে এমন মিথ্যে দাবী ও প্রচারণা ছিল পাতানো খেলা বিশেষ।

www.pathagar.com

ভারতীয় কূটনৈতিক বলয় ও সংবাদ মাধ্যম এবং তাদের বাংলাদেশী তাবেদার শ্রেণী বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী হতে বহিস্কার করার উদ্দেশ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর মানবাধিকার লঙ্ঘনের মিথ্যে অভিযোগ তোলে, যেখানে ভারতের লেলিয়ে দেয়া সশস্ত্র চাকমা সন্ত্রাসীরা বাংলাদেশের এক-দশমাংশ অবিচ্ছেদ্য এলাকা বিচ্ছিন্ন করে তথাকথিত 'ঝুম ল্যান্ড' প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট।

অন্যদিকে ভারত-সৃষ্ট 'র' এর মুখপাত্র বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের 'কলিকাতা কনফারেন্স' নামক একটি সহযোগী শাখার চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলন ১ ফেব্রুয়ারী (২০০৯) কলিকাতার সুভাষ ইনষ্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনে আগতদের অধিকাংশই ছিল ভারতীয় নাগরিক। বাংলাদেশ থেকে কেবলমাত্র দু'চারজন ভারতীয় 'চর' ঐ তথাকথিত সম্মেলনে উপস্থিত ছিল। ইহার প্রধান আকর্ষণ ছিল শাহরিয়া কবিরের "হিউম্যান বিং ও মালাউন" শীর্ষক তথাকথিত একটি প্রামাণ্যচিত্র। উল্লেখ্য, শাহরিয়ার কবির সবার কাছে ভারত-বান্ধব হিসেবে পরিচিত। ঐ প্রামাণ্যচিত্রে দাবী করা হয় যে, বাংলাদেশে সংঘটিত সর্বাধিক নির্যাতন ও নিষ্পেষণের জন্য রাষ্ট্র-ধর্ম ইসলাম, সেনাবাহিনী এবং এর গোয়েন্দা সংস্থা দায়ী। ইসলাম ও আর্মি নির্মূল না করা পর্যন্ত এই সংকটের সমাধান হবে না।[২]

বাংলাদেশ হতে ইসলাম ও সেনাবাহিনী তুলে দেয়ার জন্য সম্মেলনে ভারতসহ পরাশক্তিসমূহের সহযোগিতা কামনা করা হয়।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বাহিনীর ব্যাপক সদস্য নিয়োগ প্রাপ্তির পর ভারত একাধারে উদ্বিগ্ন ও বেপরোয়া হয়ে ওঠে। কেননা বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যরা তাদের দক্ষতা, শৃংখলাবোধ, সাহসিকতা ও দায়িত্বপরায়ণতার জন্য ঈর্ষণীয় সুখ্যাতি ও সুনাম অর্জন করে। এই মিশনে যোগদান করে তারা বিপুল অংকের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সুযোগ পায়। এ ছাড়া সারা বিশ্বের সেরা সামরিক কর্মকর্তা ও সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের সাথে পরিচিত হবার সুযোগ সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যরা যুদ্ধ ও প্রতিরোধ অভিযানের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে।

[২] মোকাররম হোসেন, দৈনিক নয়া দিগন্ত, ৭ মার্চ, ২০০৯।

www.pathagar.com

সর্বোপরি, বিশ্বের শক্তিধর দেশসমূহের সংস্পর্শে যাওয়ার সুযোগ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে পরোক্ষভাবে হলেও আরো সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করে। ভারত বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বাহিনীর আকাশ-ছোঁয়া সুখ্যাতি ও গ্রহণযোগ্যতা, সর্বোপরি অগ্রযাত্রা, থামিয়ে দেয়ায় লক্ষ্যে নানাবিধ প্রচারভিযান চালায়। পিলখানায় সেনাবাহিনী-বিরোধী গণহত্যার মাত্র ক'দিন আগে আওয়ামী লীগ এবং তার জোটভুক্ত দলভূক্ত সংসদ সদস্যদের জাতীয় সংসদে প্রদত্ত সমালোচনামূলক বক্তব্য সেনাবাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থার জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতাকে চরমভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

পিলখানায় সেনা কর্মকর্তাদের নিধনের সময় এক শ্রেণীর ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়াকে বিডিআর'এ নিয়োজিত সেনা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অপমানসূচক অপবাদ প্রচারে লিপ্ত হতে দেখা যায়। তাদের চরম দুর্নীতিবাজ, স্বৈরাচার ও নির্মম হিসেবে চিহ্নিত করে পরে সেনাবাহিনীর ভাব-মর্যাদা ম্লাণ করতে এ চ্যানেলগুলো যেন প্রতিযোগিতায় নেমেছিল। বিডিআর জোয়ানদের দাবী-দাওয়া প্রচারের নামে এই চ্যানেলগুলোতে প্রতিবেদকরা মূলতঃ তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও অগ্রহণযোগ্য ব্যাখ্য উপস্থাপন করেছে, যা যাছাই বাছাই না করেই সম্প্রচার করা হয়। বিদ্রোহী বিডিআর সদস্যদের প্রদত্ত তথ্য কিংবা অভিযোগ কতখানি সত্য, যথার্থ ও বিশ্বাসযোগ্য তা খতিয়ে না দেখেই এ ধরনের ঢালাও প্রচারণা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জন্য সুবিবেচনাপ্রসূত ছিলনা। এ ধরনের প্রচারণা দর্শক-শ্রোতাদের মধ্যে কেমন নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে তা হিসেব না করেই যেসব অভিযোগ, তথ্য ও ব্যাখ্যা টিভি পর্দায় বলা হয়েছে, তাদের অধিকাংশই যে ভিত্তিহীন পরবর্তীতে তা-ই প্রমাণিত হয়েছে। এসব টিভি প্রতিবেদকরা যে পিলখানায় ঘটে যাওয়া নারকীয় হত্যাকান্ডের ধারে কাছেও না গিয়ে কেবল সেনাবাহিনী-বিরোধী যে প্রচারণায় লিপ্ত ছিলেন তা উদ্দেশ্যমূলক কিংবা কোন শক্তির ইংগিত-প্রসূত কিনা তা খতিয়ে দেখলে চ্যানেল কর্তৃপক্ষ ভাল করতেন। তারা হয়তো ভাবতেই পারেননি এ ধরনের অপমানসূচক অভিযোগ বিডিআর, প্রতিরক্ষা বাহিনী ও সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা তথা দেশের বিরুদ্ধে লোমহর্ষক চক্রান্তের অংশ। বিদ্রোহী জোয়ানরা এমনকি যদি শতভাগ সঠিক তথ্যও দিয়ে থাকেন, তথাপি সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদক ও কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ছিল সেগুলো খতিয়ে দেখা। কেননা তাদের অভিযোগ কিছু ব্যক্তির বিরুদ্ধে হলেও তা মূলতঃ বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাপনা এবং এর স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব

www.pathagar.com

এবং অস্তিত্বের পরিপন্থী। হেলিকপ্টার হতে বিডিআর হেডকোয়র্টারে গুলিবর্ষণ কিংবা দরবার হলে বিডিআর মহাপরিচালক কর্তৃক বিডিআর জোয়ানদের ওপর গুলিবর্ষণ, যা চ্যানেলগুলো ফলাও করে প্রচার করেছিল, পরবর্তীকালে সর্বৈব ভিত্তিহীন ও মিথ্যে হিসেবে প্রমাণিত হয়। অভিযোগ উঠেছে, এক শ্রেণীর সংবাদ মাধ্যমেকে সম্ভবত: সেনাবাহিনী-বিরোধী বিশেষ চক্রের প্রভুরাই সেনা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়ে জনমতকে সম্ভাব্য গৃহযুদ্ধে সেনাবাহিনীর প্রতিপক্ষ হিসেব দাঁড় করানো জন্যই নিয়োগ করেছিল।

সংশ্লিষ্ট অদূরদর্শী প্রতিবেদকরা না জানতে চেয়েছেন সেনা কর্মকর্তাদের ভাগ্যে কি ঘঠেছে এবং তারা কোথায় কেমন আছেন, না চেষ্টা করেছেন বিদ্রোহী জোয়ানদের কথিত অভিযোগের বাস্তবতা, সত্যতা ও যথার্থতা যাচাই করতে। বিডিআর জোয়ানদের মনস্তত্ব অনুভব করার উপস্থিত বুদ্ধিও এসব প্রতিবেদকদের ছিলনা। এরা সেনা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দায়িত্বহীন ঢালাও অভিযোগ উত্থাপনের সুযোগ দিয়েছিলেন। বিডিআর পোশাক পরিহিত এসব ব্যক্তি আসলেই বিডিআর সদস্য কিনা, নাকি বহিরাগত অথবা ভিনদেশী নাগরিক, সে বিষয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। এমনকি টিভি 'টক শো'তে অংশ গ্রহণকারী তথাকথিত প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ ও বুদ্ধিজীবীদের কেউ কেউ একইভাবে দায়িত্বহীন ও অপরিণামদর্শী মন্তব্য করেছেন। তাদের অনেকেই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং যুক্তি ছিল উস্কানিমূলক ও একচোখা ধরনের। অনেক অংশগ্রহণকারী তাদের ভারত মুখিতার জন্য ধিকৃত, যাদের মূল দায়িত্বই হলো বাংলাদেশে ভারতের ভূ-কৌশলগত স্বার্থ দেকবাল করা। ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়া যে কায়দায় বিডিআর সদর দফতরে সংঘটিত দুর্ভাগ্যজনক গণহত্যার বিবরণী উপস্থাপন করেছে, তাতে একটি সত্যি বেরিয়ে এসেছে যে, তারা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বাংলাদেশ-বিরোধী প্রতিপক্ষের স্বার্থের অনুকূলে কাজ করেছে।

তথ্যানুসন্ধানীমূলক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দীর্ঘমেয়াদী চক্রান্তের অংশ হিসেবে এমনসব ব্যক্তিবর্গকে বিডিআর'এ ঢুকানো হয় যারা ভারতমুখী দলসমূহের সাথে যুক্ত ছিল। এ ছাড়া বিডিআর জোয়ানদের একটি বিপথগামী অংশকে বিপুল অর্থের বিনিময়ে হাত করা হয়। তাদেরকে ব্যবহার করে সেনাবাহিনী-বিরোধী ভাবাবেগ বিডিআর'এর অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া হয়। সেনাবাহিনী-বিরোধী তীব্র ঘৃণা ও ভাবাবেগ জোরদার করার উদ্দেশ্যে নিম্নতর বেতন,স্বল্প রেশন, অধিকতর কাজ, সেনাবাহিনীর

www.pathagar.com

কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলায়নের প্রক্রিয়া প্রভৃতি স্বাভাবিক ও তুচ্ছ বিষয়কে অতিরঞ্জিত করে প্রচার করা হয়। তাদের মনে এমন ধারণা ঢুকিয়ে দেয়া যে, যদি বিএসএফ নিজস্ব অফিসার দ্বারা চলতে পারে, তবে বিডিআর'এর ক্ষেত্রে অসুবিধা কোথায়? তাদের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য কেন সেনা কর্মকর্তা নিয়োগ করা হবে?

ভারত দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বাহিনীর বিরুদ্ধে কূটনৈতিক ও মিডিয়া প্রচারণা চালিয়ে আসছে, মূলতঃ পাশ্চাত্যের শক্তিধর দেশগুলোকে প্ররোচিত করতে যাতে তারা জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বাহিনী পুলিশকে গ্রহন না করে। পিলখানায় গণহত্যার পর ভারত এবং বিভিন্ন সেক্টরে বিদ্যমান স্থানীয় 'চর'রা সেনাবাহিনী-বিরোধী প্রচারণা জোরদার করে অভিযোগ করে যে, বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বাহিনীতে ইসলামী জঙ্গীদের ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘঠেছে। সুতরাং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীতে বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের সংযুক্তি নিরাপদ নয়।

১৫ মার্চ (২০০৯) সুসান রামগোপাল নামক জনৈক ভারতীয় নাগরিক জাতিসংঘ মহাসচিব বান কী মুন'কে লেখা এক চিঠিতে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশন হতে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের প্রত্যাহারের অনুরোধ জানিয়েছে। সে ক্ষমতাসীন সরকারের বাণিজ্যমন্ত্রী ফারুক খানকে উদ্ধৃত করে অভিযোগ করে যে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ইসলাম-পন্থীদের অনুপ্রবেশ ঘঠেছে। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, অতি সাধারণ একজন অজ্ঞাত ভারতীয় নাগরিকের চিঠি সংবাদ মাধ্যমে এমন অভাবিত গুরুত্ব পেল কি করে? এতে প্রমাণিত হয় যে, ভারত সরকার নিজেই বাংলাদেশের স্বার্থ-সুনাম ক্ষুন্ন এবং বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় হতে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে এই চিঠি সুসান রাম গোপালের নামে পাঠিয়ে সংবাদ মাধ্যমে অতীব গুরুত্বের সাথে প্রচারের ব্যবস্থা করেছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন হতে বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বাহিনী ও পুলিশ সদস্যদের প্রত্যাহার কিংবা শান্তিরক্ষা বাহিনীতে যোগদানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সহজেই অনুমেয়।

ভারত সরকার ভারতীয় প্রচার মাধ্যম এবং তাদের বাংলাদেশী অনুগামীরা বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বাহিনীতে ইসলামী জঙ্গীবাদের অনুপ্রবেশের মিথ্যে ও ভিত্তিহীন খবর বিশ্বময় প্রচার করলেও ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীতে চরম ও উগ্র হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীদের ব্যাপক উপস্থিতিকে উপেক্ষা করে। অথচ ভারতীয়

www.pathagar.com

জঙ্গীবাদী হিন্দু ও সন্ত্রাসী দল ও গ্রুপের সদস্যরা সাম্প্রদায়িকতায় বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত হয়ে প্রকাশ্যে ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীতে প্রবেশ করে সংশ্লিষ্ট সদস্যদের মধ্যে উগ্র হিন্দুত্ববাদ ও সন্ত্রাসী তথা অন্তর্ঘাতমূলক চেতনা ছড়িয়ে ভারতে বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালিয়ে তার দায়-দায়িত্ব ভারতীয় মুসলমান এবং বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের ওপর চাপিয়ে এই তিন পক্ষকে নাজেহাল করতে ভারত সরকারকে প্ররোচিত করে চলেছে। ভারতসহ দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের অন্যান্য দেশগুলোতে সক্রিয় সন্ত্রাসী চক্রগুলোর অস্ত্র, গোলাবারুদ, অর্থ ও আশ্রয়ের মূল যোগনদার হলো ভারত। অথচ সেই ভারতই বাংলাদেশ ও পাকিস্তানকে ঘায়েল করার উদ্দেশ্যে দেশ দু'টিকে সন্ত্রাসবাদীদের লালন ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করে বিশ্বময় প্রচারণা চালাচ্ছে। আর দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পাশ্চাত্য দুনিয়া এই সন্ত্রাসী রাষ্ট্র ভারতকে সাথে নিয়ে সন্ত্রাস মোকাবেলার নামে মুসলিম দেশ দখলের পন্থা অবলম্বন করেছে।*

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভারতীয় সেনাবাহিনীতে হিন্দুত্ববাদী জঙ্গীবাদ

ভারতীয় সরকারী কর্মকর্তা, নীতি-নির্ধারক এবং তাদের বাংলাদেশী সেবাদাসরা উদ্দেশ্যেমূলকভাবে বাংলাদেশে সক্রিয় ইসলামী মৌলবাদের কথা প্রচার করে বেড়ায়। তাদের মতে কতিপয় রাজনৈতিক দলের সাথে মুসলিম জঙ্গীবাদীদের সম্পর্ক রয়েছে। ভারতীয় 'চর'দের উক্তি উদ্ধৃত করে সম্পূর্ণ মিথ্যে পরিসংখ্যান প্রচার করেছে যে, বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বাহিনীতে চাকরি প্রাপ্তদের ৩৫ শতাংশই মাদ্রাসার ছাত্র। এই মিথ্যে তথ্য যদি সত্যিও হয়, তাতেও সেনাবাহিনীতে জঙ্গীবাদের অনুপ্রবেশ হচ্ছে এমন অভিযোগ গ্রহণযোগ্য নয়। মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা সেনাবাহিনীতে প্রবেশের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা প্রমাণ ও শর্তাবলী পূরণে সক্ষম হলে সে সুযোগ হতে তাদের বঞ্চিত করার অধিকার কারো নেই। সেনাবাহিনীতে নিযুক্তির আগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির, এমনকি তার পরিবার ও দূর-আত্মীয়দের কর্মকান্ডের যথাযথ তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সুতরাং জঙ্গীদের সেনাবাহিনী কেন, সাধারণ সরকারী চাকরি পাওয়াও সম্ভব নয়। মুসলমান হিসেবে নামায পড়া কিংবা দাঁড়ি রাখা, কিংবা ইসলাম নির্দেশিত পথে জীবন যাপন করা—মোটেই জঙ্গীবাদ নয়। সুতরাং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে মুসলিম জঙ্গীবাদ ঢুকে পড়েছে এ কথা মোটেই সত্যি নয়। অথচ ভারত এবং তার বাংলাদেশী দোসররা ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং অন্যত্র হিন্দু সাম্প্রদায়িক জঙ্গী ও জঙ্গী সংগঠনের ব্যাপক অনুপ্রবেশ ও উপস্থিতির বিরুদ্ধে কোন উচ্চবাচ্য করেনা। ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমে এ ধরনের প্রচারণা কদাচিৎ দেখা যায় যে, ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কংগ্রেস থেকে শুরু করে কমিউনিষ্ট নাস্তিক, চরম হিন্দু উগ্রবাদী সাম্প্রদায়িক আরএসএস, হিন্দু মহাসভা, বজরং দল, ভারতীয় জনতা পার্টিসহ প্রায় প্রতিটি দল ও গ্রুপের কেবল সক্রিয় কর্মী-সমর্থকই নয়, রীতিমত গোপন সংগঠন রয়েছে। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' পরিকল্পিত ও উদ্দেশ্যেমূলকভাবে হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক জঙ্গীদের প্রতিরক্ষা বাহিনীতে নিয়োগের ব্যবস্থা করে যারা ভারতের ঐক্য ও সংহতি অটুট রাখতে সৈন্য ও কর্মকর্তাদের মধ্যে হিন্দু ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়ায়। ভারতীয় নীতি-নির্ধারকরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ভারতকে ঐক্যবদ্ধ রাখার সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে বর্ণ, পেশা, অঞ্চল ও রাজনৈতিক আদর্শ নির্বিশেষে হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসীদের মধ্যে তীব্র হিন্দুত্ববাদী মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িক চেতনার উন্মেষ ঘটিয়ে বহুধাবিভক্ত

www.pathagar.com

হিন্দুদের সক্রিয় এক ও ঐক্যবদ্ধ করা। এই চেতনাবোধ উজ্জীবিত থাকলেই ভারতীয় হিন্দুরা জাতিগত ও বর্ণগত বিদ্বেষ এবং আঞ্চলিক রেষারেষি, তথা আর্থ-সামাজিক সমস্যা ভুলে গিয়ে ভারতকে কেবল ঐক্যবদ্ধই রাখবেনা, বরং চরম দারিদ্র ও সামাজিক সংকট সত্ত্বেও ভারতকে তথাকথিত পরাশক্তি হিসেবে বাহ্যিকভাবে হলেও প্রদর্শনার্থে অপ্রয়োজনীয় মাথাভারী সামরিক বাহিনী গড়ে তোলা যাবে। আর এভাবেই অখন্ড ভারত প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। মূলত: চরম মুসলিম-বিরোধী উগ্র হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক চেতনা উজ্জীবিত রাখার কারণেই বহুধাবিভক্ত বিক্ষুব্ধ বিচ্ছিন্নতাবাদী ও মাওবাদী যুদ্ধ বিগ্রহে বিধ্বস্থ ভারত আজো অখন্ড রয়েছে। আর এর নেপথ্য শক্তি হলো চরম হিন্দুত্ববাদী বিশাল ভারতীয় সেনাবাহিনী। অনাহারক্লিষ্ট রোগে অপুষ্ঠিতে পর্য্যদুস্ত ভারতীয়দের সামনে অখন্ড হিন্দু ভারতের মূলো ঝুলিয়ে ভারত প্রতি বছর সামরিক ব্যয় আশংকাজনক হারে বৃদ্ধি করে চলেছে।

চৌদ্দ লক্ষাধিক ভারতীয় সৈন্যদের প্রায় দশ লাখই ভারতীয় জনগণের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। চরম হিন্দুত্ববাদী চেতনা থেকেই ভারতীয় সৈন্যরা নিজদের প্রবঞ্চিত ও উপেক্ষিত জনগণকে নির্মমভাবে নিমূর্ল করছে। উল্লেখ্য কাশ্মীর, পাঞ্জাব, মিজোরাম, ত্রিপুরা, মনিপুর, নাগাল্যান্ড, অরুনাচল প্রদেশ, আসাম, মেঘালয়ে যুদ্ধ হচ্ছে মূলত অহিন্দুদের বিরুদ্ধে। বিচ্ছিন্নতাবাদী জঙ্গী দমনের নামে ভারতীয় সৈন্যরা এসব অঞ্চলে যে নির্মম কৌশল অবলম্বন করছে, তা সন্ত্রাসীদেরকেও হার মানায়। মাওবাদী গেরিলাদের দমনের জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনী এখন আরো ১১টি রাজ্যে যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। বিশ্বের অন্যকোন দেশের সেনাবাহিনী স্বদেশবাসীর বিরুদ্ধে এমন যুদ্ধে লিপ্ত নয়। উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদী বিষবাষ্প অক্ষুণ্ন রেখে তা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীসহ বিভিন্ন প্রতিরক্ষা বিষয়ক সংস্থার চরমপন্থী ধর্মান্ধ হিন্দুদের পরিকল্পিত উপায়ে উদ্দেশ্যেমূলকভাবে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। ভারতীয় এবং বিদেশী সংবাদপত্র ও প্রতিরক্ষা বিষয়ক সাময়িকীর রক্ষণশীল কায়দায় প্রস্তুত প্রতিবেদনে ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীতে হিন্দু সাম্প্রদায়িক চেতনার অধিকারী উগ্রপন্থীদের ব্যাপক অনুপ্রবেশের স্বীকৃতি রয়েছে। এসব প্রতিবেদন নিশ্চিত করে যে, প্রতিরক্ষা বাহিনীর ভেতরেই বিভিন্ন হিন্দু সাম্প্রদায়িক উগ্রপন্থী গোপন সংগঠন বহু বছর ধরে সক্রিয় রয়েছে। সেনাবাহিনী হতে অবসরপ্রাপ্ত এবং কর্মরত বহুসংখ্যাক কর্মকর্তা সেনাবাহিনীর ভেতরে উগ্রপন্থী গ্রুপগুলোকে

www.pathagar.com

সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ করে। তাদের মূল দায়িত্ব হলো প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্বশাখায় উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদী চেতনা ছড়িয়ে দেয়া ও উজ্জীবিত করা। বিজেপি, শিবসেনা, বজরং দল, দূর্গা বাহিনী, অভিনব ভারত, সনাতন শাস্ত্র, হিন্দুজন জাগৃতি সমিতি, আর এস এস (রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ), ভারতীয় হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি) প্রভৃতি কট্টর হিন্দু সম্প্রদায়িক উগ্রবাদী দল ও গ্রুপ ভারতীয় প্রতিরক্ষা সংস্থাসমূহে সক্রিয় রয়েছে, যেগুলো বাস্তব অর্থে তালেবান আলকায়দা'র চেয়েও জঘন্যতর। এগুলো তাদের অনুসারীদের ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীতে প্রতিনিয়ত অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে। এ কারণে ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহে বিজেপি, আরএসএস, বিএইচপি, বজরং দল ও তাদের শাখাসমূহের হাজার হাজার অনুসারী ও কর্মী সক্রিয় রয়েছে। এই কারণেই প্রতিরক্ষা বাহিনী, আধা-সামরিক বাহিনী, পুলিশ কিংবা গোয়েন্দা সংস্থা হতে অবসর নেয়া অধিকাংশ কর্মকর্তা ও সাধারণ সদস্যরা প্রধানত বিজেপিতে যোগ দেয়। যুব অনুসারী ও সমর্থকদের ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী, আধা-সামরিক বাহিনী এবং সংশিষ্ট অন্যান্য সংস্থায় অফিসার হিসাবে যোগদানের যোগ্যতাসম্পন্ন করার জন্য আরএসএস মহারাষ্ট্রের নাসিক অঞ্চলে বনস্‌লা সামরিক বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেছে। ভারতের অন্যান্য রাজ্যে এর শাখা রয়েছে। অবসরপ্রাপ্ত হিন্দুত্ববাদী কর্মকর্তারা এসব সামরিক একাডেমীতে শিক্ষক ও প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করে। বিজেপি-আরএসএস পরিচালিত এসব ধর্মীয়-সামরিক প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় ও মনস্তাত্তিকভাবে উগ্র হিন্দুত্ববাদে উদ্বুদ্ধ করা হয়। পরবর্তীতে এসব হিন্দুত্ববাদে উদ্বুদ্ধ উগ্রবাদী হিন্দু যুবকরা নিযুক্তিমূলক পরীক্ষায় অংশ নিয়ে প্রতিরক্ষা বাহিনী ও আধা-সামরিক বাহিনীতে চাকরি নেয়।[১] তাদের অতীত শিক্ষা কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস, কার্যক্রম, কিংবা তাদের রাজনৈতিক পরিচিত অথবা আর্দশ নিয়ে কেউ কোন প্রশ্ন কিংবা আপত্তি উত্থাপন করেনা। অথবা ভারতীয় প্রতিরক্ষা সংস্থাসমূহে কত শতাংশ সদস্য ধর্মীয়, আদর্শিক বা রাজনৈতিকভাবে উদ্বুদ্ধ বা পক্ষপাতমূলক এমন তথাকথিত জরিপ কেউ চালায়না।

বিজেপি-আরএসএস পরিচালিত 'বনস্‌লা' সামরিক বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়' ছাড়াও সংবাদ মাধ্যমে 'মহারাষ্ট্র মিলিটারী ফাউণ্ডেশন' 'আত্মঘাতক পাঠক'

[১] দৈনিক নয়াদিগন্ত, ঢাকা ১৪ মে, ২০০৯।

www.pathagar.com

(Attaghatak Phatak) এর নাম এসেছে যার সাথে জড়িতরা ২০০৮ সনের নভেম্বর মাসে বোম্বাইয়ের দুটি হোটেলে সন্ত্রাসী হামলা চালায়। শিবসেনা প্রধান বাল ঠেকারের'র অনুসারী অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল প্রেমনাথ হান 'মহারাষ্ট্র' মিলিটারী ফাউণ্ডেশন এর প্রতিষ্ঠাতা। ইহা মূলতঃ শিবসেনা'র একটি শাখা প্রতিষ্ঠান। সেনাবাহিনীতে কর্মরত থাকাকালীন জেনারেল প্রেমনাথ শিবসেনার সংস্পর্শে আসেন। জেনারেল প্রেমনাথের বিশ্বস্ত শিষ্য কর্নেল জয়ন্ত রাও চৈতাল 'আত্মঘাতক পাঠক'এর প্রতিষ্ঠাতা। জেনারেল প্রেমনাথ ও কর্নেল চৈতাল বহুদিন যাবত ভারতীয় সেনাবহিনী ও 'র' এর সামরিক নির্বাচন কেন্দ্রের বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তারা সেনা সদস্যদেরকে সন্ত্রাসী সংগঠনে টানতে সক্ষম হন।

জেনারেল প্রেমনাথ এবং কর্নেল চৈতাল যৌথভাবে একটি হিন্দু আত্মঘাতী স্কোয়ার্ড গঠন করে। সংগৃহীত রিক্রুটদের মুম্বাই থেকে ৫০ কি.মি. দূরবর্তী আম্বরনাথ শিল্পনগরীতে প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। ৩০-সদস্য বিশিষ্ট প্রতিটি ব্যাচ (দল) কে ১৫দিন ধরে প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। জেনারেল প্রেমনাথ ও কর্নেল চৈতাল স্বীকার করেছেন আত্মঘাতী দলের সদস্যরা পাকিস্তানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে অন্তর্ঘাতমূলক হামলা চালায়। সবচেয়ে বিব্রতকর ও লোমহর্ষক বিষয় হলো ভারতের অভ্যন্তরে বিবিধ অপরাধ কর্মের সাথে প্রেমনাথ ও চৈতালের সংগঠনের জড়িত থাকার তথ্য পুলিশ বারংবার পেয়েছে। কিন্তু অদৃশ্য শক্তির হস্তক্ষেপের কারণে প্রত্যেক বারই পুলিশী তদন্ত মাঝপথে থেমে যেত। ২০০২ সনে চালানো এক তদন্তে চৈতালের সাথে যুগপৎভাবে সেনাবাহিনী ও হিন্দু সন্ত্রাসীদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রমাণ উদঘাটিত হয়। কিন্তু চৈতালকে গ্রেপ্তারের প্রাক্কালে অ্যান্টি টেরোরিষ্ট স্কোয়ার্ডকে মাঝপথে থেমে যেতে হয়। কারণ থেমে যাবার নির্দেশ 'র' থেকেই আসে। প্রকাশ হয়ে যাওয়া এক খবরে বলা হয়েছে,'র' হিন্দুত্ববাদী গ্রুপগুলোর প্রশিক্ষিত সন্ত্রাসীদের ভারতের সব প্রধানমন্ত্রীর সময়ে ব্যবহার করেছিল। এই কারণেই 'র' মুসলমান, খ্রিষ্টান ও বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে ঘটানো সব অপরাধী হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীদের প্রশ্নে নমনীয় পন্থা অবলম্বন করে।

বাবরি মসজিদ ধ্বংস, গোর্দা স্টেশনে ট্রেনে অগ্নিসংযোগ, খ্রিস্টান হত্যা, মালেগাঁওতে বোমা হামলা, গুজরাটে মুসলিম বিরোধী গণহত্যা, পাকিস্তানগামী 'সমঝোতা' ট্রেনে বোমা হামলা এবং সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সংঘটিত সব

www.pathagar.com

সাম্প্রদায়িক লোমহর্ষক দাঙ্গায় হিন্দু উগ্রপন্থীদের জড়িত থাকার সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে।

কর্নেল শ্রীকান্ত পুরোহিত গ্রেফতার হবার পর মালেগাঁওয়ে বোমা হামলা এবং 'সমঝোতা' এক্সপ্রেসে 'আরডিএক্স' ব্যবহার করে অগ্নিসংযোগ ও বোমা হামলার সাথে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেন। এসব খবরে ভারতীয় সংবাদ পত্রসমূহ যখন সয়লাব ঠিক সে মুহূর্তে ২৬ নভেম্বর (২০০৮) বোম্বাইয়ে পুনরায় বোমা হামলা চলে। তাজ্জবের ব্যাপার হলো বোমা হামলার ১৫ মিনিটের মধ্যে এ্যান্টি টেরোরিস্ট স্কোয়ার্ডের প্রধান হেমন্ত কারকারি নিহত হয়। তার নিহত হওয়াকে অস্বাভাবিক হিসেবে বর্ণনা করে ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমে অভিযোগ করে যে, ভারতীয় উগ্র হিন্দুত্বাদীরাই তাকে হত্যা করে, যেহেতু তিনি মালেগাঁও বোমা হামলা এবং 'সমঝোতা' ট্রেনে বোমা বিস্ফোরণ ও অগ্নিসংযোগ সংক্রান্ত ঘটনার তদন্তের দায়িত্বে ছিলেন। তদন্তে অন্যান্যের মধ্যে এসব হামলার সাথে শ্রীকান্ত প্রসাদ পুরোহিতের জড়িত থাকার প্রমাণ বেরিয়ে আসে। লে.কর্নেল পুরোহিত জেনারেল প্রেমনাথের আত্মঘাতি দলের সদস্য ছিলেন। রমেশ উপাধ্যা নামক জনৈক মেজর ও লে.কর্নেল পুরোহিতের সাথে অভিযুক্ত হন। সন্ত্রাস বিরোধী স্কোয়ার্ড 'সমঝোতা এক্সপ্রেস' এ সন্ত্রাসী হামলা এবং মালেগাঁওতে বোমা হামলার সাথে আরো দুইজন কর্নেল জড়িত থাকার কথা ঘোষণা করে। এটিএস হিন্দু সন্ত্রাসীদের নেটওয়ার্ক সম্পর্কে শীঘ্রই আরো বিস্তারিত তথ্য প্রকাশের ঘোষণা দেয়। ঠিক ঐ সময়ে মুম্বাইয়ে বোমা হামলা ঘটে। এই ঘটনার প্রাক্কালে এটিএসকে প্রদত্ত সরকারী সাহায্যর সহযোগিতা প্রদান হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। কারকারিকে প্রায় প্রতিদিনই অজ্ঞাত স্থানে হতে হত্যার হুমকি দেয়া শুরু হয়। তাকে হত্যার নকশা এমনভাবে তৈরি হয়, যাতে হত্যাকান্ডের দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে পাকিস্তানের ওপর বর্তানো যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই আত্মঘাতি পাঠককেই দায়ী করা হয়। এই ঘটনায় লে. কর্নেল পুরোহিতের সাথে পঞ্চমারিতে মোতায়েনকৃত প্যারাসুট রেজিমেন্টর বাঘাদিত্য জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম জানিয়েছে সাবেক সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল কাপুর সন্ত্রাসী কার্যক্রমের সাথে সেনা কর্মকর্তাদের জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করেননি।[২]

---

[২] দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা, ১৮ এপ্রিল, ২০০৯।

www.pathagar.com

মালেগাঁওতে বোমা হামলায় ছয়জন মুসলমান নিহত হন। মহারাষ্ট্র 'এটিএস' মালেগাঁও বোমা হামলা মামলার তদন্ত চালিয়ে আদালতে পেশকৃত ৪০০০ পৃষ্ঠার চাজশীর্টে ঐ হামালার সাথে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী সংগঠনসমূহের জড়িত থাকার প্রমাণাদি উল্লেখ করে। ১০ জন পুরুষ ও একজন মহিলাকে এই মামলার আসামী হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এরা হলো কর্মরত লে.কর্নেল শ্রীকান্ত প্রসাদ পুরোহিত, হিন্দু সাধুমহন্তী অম্রিতানন্দ ওরূপে দয়ানন্দ পান্ডে, সাধ্ববী প্রজ্ঞাসিং ঠাকুর, শিবনারায়ণ সিং, শ্যাম বাওয়ার লাল সাহু, অবসারপ্রাপ্ত মেজর রমেশ শিবাজি উপাধ্যা, সমীর কুলকারনি, রাকেশ দত্তরাম, অজয় রাহিকার প্রমুখ। মেজর রমেশ উপাধ্যা ভারতীয় সংঘ পরিবারের সামরিক শাখা 'অভিনব ভারত' এর সাথে যুক্ত।

পুরোহিত নেতৃত্বাধীন চক্রের দায়িত্ব ছিল মুসলিম স্থাপনার ওপর হামলা চালিয়ে তার দায়-দায়িত্ব ছিল মুসলমানদের ওপর চাপিয়ে দেয়া। মুসলিম স্থাপনার ওপর পরিচালিত প্রতিটি হামলার পর এই মর্মে প্রচার চালানো হয় যে, মুসলমানরা বোমা তৈরী কিংবা ভারতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে হামলা চালানোর জন্য বোমা বহন করে নিয়ে যাওয়ার সময় বোমা বিস্ফোরণ ঘটে মুসলিম স্থাপনা ধ্বংস হয় কিংবা মুসলমান মারা যায়। বোমা হামলার পরপরই অজ্ঞাত ব্যক্তি কোন মুসলিম সংগঠনের পক্ষ থেকে ফোন করে হামলার দায়িত্ব স্বীকার করত। বাস্তবে ঐসব ফোনকারী ছিল হিন্দু এবং মুসলমানদের ওপর হামলার দায়িত্ব চালানোর উদ্দেশ্যে মুসলিম ব্যক্তি ও সংগঠনের নাম ব্যবহার করে। এ ধরনের ভূয়া সংবাদ-প্রাপ্তির সাথে সাথে পুলিশ ভারতের বিভিন্ন স্থান হতে সম্পূর্ণ নিরাপরাধ মুসলমানদের গ্রেফতার করে স্বীকোরুক্তিমূলক জবানবন্দি নেয়ার জন্য চরম নির্যাতন চালানো হয়। ভারতীয় সাময়িক 'ফ্রন্টলাইন' জানিয়েছেন, উগ্রবাদী হিন্দু সন্ত্রাসীরা মুসলিম মসজিদে হামলা চালিয়ে মুসলমানদেরকেই হামলার জন্য দায়ী করে।

'ফ্রন্টলাইন' জানায় নভেম্বর ২০০৩: মহারাষ্ট্রের পরবাহানিস্থ মোহাম্মদীয়া মসজিদের ভেতর বোমা বিস্ফোরণ ঘটে।

আগষ্ট ২০০৪: মহারাষ্ট্রের জালনাস্থ কাদেরীয়া মসজিদের ভেতর বোমা বিস্ফোরিত হয়। একই বছর মহারাষ্ট্রের মীরজাউল-উলুম মাদ্রাসায় বোমা বিস্ফোরণের ফলে অনেক ছাত্র জখম হয়।

২৯ সেপ্টেম্বর ২০০৯: মহারাষ্ট্রের মালেগাঁওতে মুসলিম অধ্যুষিত বিক্ষুক

www.pathagar.com

এলাকায় বোমা বিস্ফোরণে পাঁচজন নিহত এবং ৮৯ জন আহত হয়।[৩]
জিজ্ঞাসাবাদের সময় লে. কর্নেল পুরোহিত স্বীকার করে যে, ২০০৮ সনের ২৯ সেপ্টেম্বর সি.মি অফিসের সন্নিকটে বোমা পাতার জন্য সেসব ধরনের কৌশলগত সাহায্য করেছিল।
দ্বিতীয়বারের মতো নিদ্রাছন্ন অবস্থায় জিজ্ঞাসাবাদে সে স্বীকার করে যে, ফরিদাবাদ-ভিত্তিক সন্ত্রাসী চক্র 'অভিনব ভারত' এর আধ্যাত্মিক গুরু কর্তৃক আর্দিষ্ট হয়ে সে ব্যক্তিগতভাবে মালেগাঁও হামলা পর্যবেক্ষণ করেছিল। পুরোহিত এবং 'অভিনব ভারত' এর সাফল্য এখানেই যে তারা মুসলিম বিরোধী হামলায় মুসলমানদেরকেই ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছিল। মালেগাঁও হামলায় পুরোহিত মাত্র ২৫ হাজার রূপী ব্যয় করেছিল।[৪]
সে স্বীকার করে সে, কাশ্মীরী মুসলিম অধ্যুষিত পুনার একটি এলাকা হতে সে আরডিএক্স বিস্ফোরক সংগ্রহ করে। সম্ভবত: এটাও ছিল তার মুসলমানদের বিরুদ্ধে আরেকটি মিথ্যাচারিতা।
এটিএস দাবী করে যে, ২০০৭ সনের ১৭ ফেব্রুয়ারী পাকিস্তানগামী 'সমঝোতা' এক্সপ্রেস এ বোমা বিস্ফোরণে ব্যবহৃত আরডিএক্স বিস্ফোরক সে ভগবান নামক জনৈক সন্ত্রাসীকে সরবরাহ করে যে হামলায় নিহত ৬৮ জন যাত্রীর অধিকাংশই ছিল পাকিস্তানী নাগরিক। সরকারী উকিল অজয় মিশ্র বলেন, 'অভিনব ভারত'এর কোষাধ্যাক্ষ লে.কর্নেল পুরোহিতকে আড়াই লাখ রূপী প্রদান করে। কানিপুর হতে গ্রেফতারকৃত স্বঘোষিত পুরোহিত মহন্ত অমিতানন্দ দেব ঔরূপে দয়ানন্দ পান্ডে স্বীকার করে যে, তার নির্দেশে কর্নেল পুরোহিত মালেগাঁওতে ব্যবহৃত আরডিক্স বিস্ফোরক সেনাবাহিনীর অস্ত্রভান্ডার থেকে সংগ্রহ করেছিল। তথ্যমতে পান্ডে ভূপাল, জবলপুর এবং ফরিদাবাদে বোমা বিস্ফোরণ-পূর্ব সব গোপন বৈঠকে উপস্থিত ছিল। অতীব সর্তকতার সাথে অভিযানগুলো তদারকি করে এবং অবৈধ পন্থায় আসা অর্থায়নেও ছিল তার দায়িত্ব। বিশ্বাস করা হয় যে, ভারতের জাতীয় প্রতিরক্ষা একাডেমী থেকে ঝরে পড়া পান্ডে এমন দু'জন অভিযুক্তদের সহযোগিতা করেছিল, যারা আত্মগোপন করেছে। এদের একজন ছিল রামজি কালসাঙ্গারা যে মালেগাঁও

---

[৩] ANUPAMA KATAKAM, Frontline chennal, India, November 22 to December 5, 2008.
[৪] Times of India, 13 November, 2008.

www.pathagar.com

সামের ডাঙ্গায় অন্য সন্ত্রাসী প্রজ্ঞা সিং ঠাকুরের নিজস্ব মোটর সাইকেলে বোমা পেতেছিল। চার্জশীটে সর্বাধিক ভীতিকর ও অবাক করার মতো প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, ভারতকে পুরোপুরি হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করার উদ্দশ্যে পুরোহিত ইসরাইলে একটি প্রবাসী সরকার গঠনের চক্রান্তে জড়িত ছিল।[৫]

পুরোহিতের পরামর্শ ছিল – ভারতের সেনাবাহিনীর সদস্য সংখ্যা ১৪ লাখ থেকে বাড়িয়ে এক কোটিতে উন্নীত করা। প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর নাম হবে যুদ্ধমন্ত্রী। পান্ডের পরামর্শ ছিল পাকিস্তানের নাম উল্লেখ করা উচিত নয়, যেহেতু তাদের পরিকল্পনায় এটা অখন্ড ভারতের অন্তর্ভূক্ত।

বিদেশনীতির প্রশ্নে পুরোহিতের পরামর্শ, হারানো ভূখন্ড উদ্ধার কিংবা নিয়ন্ত্রণ রেখাকে আন্তর্জাতিক সীমানা হিসেবে মেনে না নেয়া পর্যন্ত ভারত যুদ্ধে লিপ্ত এমন ঘোষণা দেয়া হোক। সে ইসলামী ও খ্রিষ্টান আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে বৌদ্ধ ও হিন্দুদের সমন্বয়ে ঐক্য গড়ে তোলার পরামর্শ দেয়।

অন্যদিকে পুরোহিত বাংলাদেশে সন্ত্রাসী গ্রুপ গঠনের উদ্দেশ্যে কিছু সংখ্যক হিন্দুকে জোগাড় করে। প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানের উদ্দেশ্যে পুরোহিত কলিকাতায় বাংলাদেশী হিন্দু সন্ত্রাসীদের একটি সভায় অংশ নেয়ার আমন্ত্রণ জানায়। এসব কিছু প্রমাণ করে যে, সে তার অজ্ঞাত ভারতীয় এবং এর বাইরের, সম্ভবত: ইসরাইলী, প্রভুদের কাছ থেকে শক্তি সমর্থন পাচ্ছিল।

২৯ সেপ্টম্বর (২০০৮) মালেগাঁও বোমা বিস্ফোরণের তদন্তে প্রমাণ মেলে যে, গ্রেফতারকৃত আসামীরা হিন্দুদের ওপর কথিত নির্যাতনের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য বাংলাদেশে স্লীপার সেল পাঠাতে চেয়েছিল। পাঁচ বছর আগে সন্ত্রাসী কার্যক্রমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এমন ৫৪ জন সন্ত্রাসীকে পুলিশ এ পর্যন্ত সনাক্ত করতে পেরেছে। প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রশিক্ষণার্থী সন্ত্রাসীদের বলা হয়েছিল যে, বাংলাদেশে হিন্দুদেরকে যথাযথ অধিকার দেয়া হয় না।[৬]

'অভিনব ভারত'এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা সমীর কুলকার্নিকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় এই তথ্য বেরিয়ে আসে। উল্লেখ্য যে, মালেগাঁও বিস্ফোরণে নিহত ছয় জনের মধ্যে একজন আসামীও ছিল। কুলকার্নি পুলিশকে জানায় যে, সংগঠনটি দ্রুত বিস্তৃতি লাভ এবং সারা দেশে প্রায় পাঁচ হাজার সদস্য ছিল। তাছাড়া

---

[৫] দৈনিক নয়া দিগন্ত, ঢাকা, ২২ জানুয়ারী, ২০০৯।

[৬] Times of India, Malegoan accused wanted cells in Bangladesh, New Delhi, 29 December, 2008.

www.pathagar.com

বাংলাদেশেরও বেশ ক'জন সদস্য ছিল। 'অভিনব ভারত' এর কর্মীদেরকে হিন্দুদের ওপর হামলার প্রতিশোধ নেয়ার প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং তাদেরকে 'চুপ' থাকতে বলা হয়। কেবলমাত্র নির্দেশ দেয়ার পরই তাদেরকে কাজে নামতে বলা হয়। বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর কথিত হামলা সম্বন্ধে তাদের মস্তিষ্ক ধোলাই করা হয় এবং কর্মীরা বাংলাদেশে একটি শাখা খুলতে চেষ্টা করেছিল। কালকার্নিক আটক হবার খবর শোনামাত্র 'অভিনব ভারত' এর বাংলাদেশী সন্ত্রাসীরা ভারত থেকে পালিয়ে বাংলাদেশে চলে আসে।[৭] পুলিশ জানতে পেরেছে যে, বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের কয়েকজন গোপন বৈঠকে অংশ নেয়ার জন্য ভারতে গমন করে।[৮]

সুলেখা ডট কম (অক্টোবর ২৫,২০০৮) জানায় যে, এটিএস মালেগাঁও বোমা বিস্ফোরণ ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে অবসরপ্রাপ্ত মেজর প্রভাকর কুলকার্নিসহ দু'জন সাবেক সেনা কর্মকর্তাকে আটক করে। কেন্দ্রীয় হিন্দু সামরিক শিক্ষা পরিষদ (Central Hindu Military Education Society) কর্তৃক পরিচালিত নাসিকস্থ বনসলা সামরিক মহাবিদ্যালয়ে যাবার আগে কুলকার্নি সামরিক টেরিটোরিয়াল আর্মীতে ১২ বছর চাকরি করেছিল। আর অন্য কর্মকর্তারা কাজ করত সামরিক গোয়েন্দা শাখায়। আটককৃত হিন্দু চরমপন্থী প্রজ্ঞাঠাকুর, শিব নারায়ন সিং, কালসানগ্রাম প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় সেনা কর্মকর্তাদের নাম বেরিয়ে আসে। কুলকার্নি ও উপাধ্যাকে একটি সামরিক স্কুল পরিচালনার জন্য সন্দেহ করা হয়।[৯]

ভারতের কর্মরত এবং সাবেক সেনা কর্মকর্তাদের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত ও জড়িত থাকার বিষয়টি অশনি সংকেত বিশেষ। এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, ভারতীয় সেনাবাহিনীতে সাম্প্রদায়িক উগ্রবাদীদের ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘঠেছে। সমালোচকদের বিশ্বাস, ভারতীয় হিন্দু পরিষদ, আরএসএস, বজরং দল, বিজেপি প্রভৃতি যুগ যুগ ধরে অবিরাম হিন্দুত্ববাদী মতবাদের মাদকতা প্রচারের কারণে এ ধরনের উগ্রতা ও হিংস্রতা সময়ের ব্যবধানে পুলিশ, সেনাবাহিনী ও শিক্ষা বিভাগের মতো স্পর্শকাতর বিভাগেও ছড়িয়ে পড়েছে।*

---

[৭] পূর্বোক্ত।

[৮] পূর্বোক্ত।

[৯] http.www.hindustantimes.com//StoryPage.aspx?section Name=Homepage=4cccf94-a9f7-baa3-fb8091fa9a34&Headline= Malegaon+blast%3a+2+ex-Army+men+held+

www.pathagar.com

www.pathagar.com

৪ ব্যাপক গণহত্যা

- মূল রূপকার
- ছদ্মবেশী খুনী
- হত্যাকান্ড কিভাবে বাস্তবায়িত হয়
- সরকারের ভূমিকা
- সুদূরপ্রসারী প্রভাব
- বিভিন্ন মহলের প্রতিক্রিয়া
- বিডিআর পুর্নগঠন
- কার্যক্রম তদন্ত
- কিছু পরামর্শ
- উপসংহার

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মূল রূপকার

যে কোন খুন-খারাবীর মতো লোমহর্ষক ঘটনায় জড়িত আধিপত্যাবাদী মূল হোতার পরিচিত প্রায়ই গোপন থেকে যায়। এটা কেবল যুগ যুগ ধরেই নয়, বরং শতাব্দীর পর শতাব্দীর পরেও জানা যায় না। বহু ঐতিহাসিক গুপ্ত, এমনকি প্রকাশ্য হত্যা সামরিক অভ্যুত্থান, অস্বাভাবিক মৃত্যু প্রভৃতির মূল উদ্যোক্তা বা চক্রান্তকারী সাধারণতঃ অজানা বা অচিহ্নিত রয়ে গেছে। কেননা এসব ঘটনা এমন দক্ষতা ও নৈপুণ্যতার সাথে ঘটানো হয়েছে যে, তাদের সংশ্লিষ্ঠতা প্রমাণের কোন সূত্রই পাওয়া যায়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মাধ্যমে এসব ঘটানো হয়। ফলে মূল হোতাকেই সনাক্ত করা দুরূহ হয়ে পড়ে। ঘটনার জন্য এমনসব হেতু ব্যবহার করা হয় যে, ঘটনার মূল উদ্দেশ্য ও নায়ক আড়ালে চলে যায়। মানুষ কেবল তাৎক্ষণিক কারণ ও সরাসরি জড়িতদের নিয়ে টানাটানি করে। পিলখানায় সেনা কর্মকর্তাদের নির্মম হত্যাকান্ডের নেপথ্য নায়করা তেমন পদ্ধতি ব্যবহার করলেও তাদের তাৎক্ষণিক তৎপরতা, প্রকাশ্য মন্তব্য, অতীত অপকর্ম প্রভৃতি তাদের সংশ্লিষ্ঠতাকে জনসমক্ষে উম্মোচিত করেছে। তা ছাড়া বাংলাদেশ এবং এর সেনাবাহিনীর প্রতিপক্ষ কে, কারা ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশের অস্তিত্ব-বিরোধী, এই হত্যাকান্ডের চূড়ান্ত সুবিধাপ্রাপ্ত (বেনিফিশিয়ারী) কে, কে এই ঘটনার সাথে সাথেই অতিমাত্রায় তৎপরতা দেখিয়েছে ইত্যাদি বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঐ অপশক্তিকে সনাক্তকরণ অতি সাধারণ মানুষের পক্ষেও দুরূহ নয়। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের মানুষও পিলখানার নির্মম হত্যাকাণ্ডের মূল হোতাকে চিহ্নিত করতে এক মিনিট সময়ও ব্যয় করেনি। কেননা তারা জানে ঐতিহাসিকভাবে কারা তাদের শত্রু, কারা ১৯৭২ সন হতে তাদেরকে জ্বালাচ্ছে, তাদের সুখ-সমৃদ্ধিকে বার বার বাধাগ্রস্থ ও ব্যাহত করছে।

নানাবিধ চক্রান্তের মাধ্যমে আমাদেরকে দরিদ্র করে রাখার কারণে আমাদের নীতি-নির্ধারকদের মধ্যে আমাদের অস্তিত্ববিরোধী অপশক্তির সেবাদাসদের উপস্থিতির ফলে, সর্বোপরি কূটনৈতিক বাধ্যবাধকতার প্রেক্ষিতে সরকারীভাবে ঐ অপশক্তির নাম ঘোষিত হচ্ছে না। পিলখানায় সেনা কর্মকর্তাদের হত্যার ব্যাপারে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো মূল অপশক্তিকে আড়াল করে পরস্পরকে দোষারোপ করছে। ক্ষমতাসীন সরকারের বক্তব্য হলো, সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্যই এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে। বিরোধীদলের অভিযোগ

www.pathagar.com

হলো, প্রতিবেশী ভারত সরকারের ভেতরে অবস্থানকারী তার মিত্রদের সহযোগিতায় বাংলাদেশ সেনা বাহিনীকে দুর্বল করতে, দেশে গৃহযুদ্ধ সৃষ্টি করতে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে ভারতীয় সৈন্য পাঠিয়ে এদেশকে ছায়ারাষ্ট্রে পরিণত করতে এই নির্মম হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে। অন্যদিকে ভারত তার অপরাধ ঢাকার উদ্দেশ্যে এই ঘটনার পরপরই এর জন্য পরিকল্পনা গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই'কে দায়ী করেছে। সাথে সাথে বাংলাদেশ সরকারের কতিপয় মন্ত্রী এবং ভারতীয় সাহায্যপুষ্ট সংবাদ মাধ্যম ভারতীয় অভিযোগের অনুকূলে তত্ত্ব প্রচারে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে জনৈক বিদগ্ধ প্রাবন্ধিক লিখেছেন, "বাংলাদেশ সরকার এই নারকীয় ঘটনার তদন্ত করলেও সরকারকে তাদের মূল শত্রু ভারতের চক্রান্ত খতিয়ে দেখতে হবে যে, নব নির্বাচিত সরকারের কাছ থেকে ভারত ট্রানজিট ও বন্দর সুবিধা , জয়েন্ট টাস্কফোর্স প্রভৃতি দাবী করছে। মূল সত্য হলো ভারত যেকোন মূল্যে বাংলাদেশের সম্পদ লুটে নিতে চায়। যেহেতু শেখ হাসিনা ওয়াজেদ ভারতপন্থী রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের নেতা, তাই ভারতীয় গোয়েন্দা চক্রের হোতারা বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় নিয়োজিত সেনা কর্মকর্তাদের মনস্তত্ত্বে ভীতির সঞ্চার করে ভারতীয় বার্তা অনুধাবনার্থে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর ওপর অপূরণীয় ক্ষতি চাপিয়ে দেয়। বিডিআর বিদ্রোহ ও কর্মকর্তাদের হত্যাকান্ড ভারতের উদ্দেশ্যেমূলক চক্রান্ত বিশেষ, যা আড়াল করার পন্থা হিসেবে সন্দেহের তীর পাকিস্তানের 'আইএসআই'এর দিকে ছুঁড়ে দেয়।[১]

সম্ভবত বহু অব্যক্ত জটিল কারণে শেখ হাসিনা সরকার বিডিআর গণহত্যার মূল চক্রের সংশ্লিষ্ঠতার বিষয়ে তদন্তানুষ্ঠান থেকে বিরত থেকেছেন। কিন্তু আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি সরকারের উচিত জাতীয় স্বার্থে কমপক্ষে সরকারী রেকর্ডে সংরক্ষণের জন্য পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চালিয়ে আমাদের সে-ই শত্রু চিহ্নিত করা উচিত যে এই বিপর্যয় ঘটিয়েছে, যাতে বর্তমান সরকার এবং তার উত্তরসূরীরা, সার্বিকভাবে দেশের সমুদয় জনগণ, এ ধরনের দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার পুনরাবৃত্তি ব্যর্থ করতে ঐ শত্রু সম্পর্কে সজাগ থাকে। বিডিআর সদর

[১] Sultan M Hali. BDR Mutiny : An India Conspiracy, Bangladesh Open Source Intelligence Monitors, 27 March, 2009.

www.pathagar.com

দফতরের এই বিপর্যয় এতো স্পষ্ট ও খোলামেলা যে, বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা কিংবা অন্য যেকোন স্থানের পথচারীকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় এই নির্মম হত্যাকান্ডের নেপথ্য চক্র কে, সে অতি সহজেই বলবে, 'এটা হলো ভারত'। ভারত এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটিয়েছে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ব্যুহকে দুর্বল করত: তা ভেঙ্গে দিতে গৃহযুদ্ধ শুরু করতে যাতে যুদ্ধরত যে কোন পক্ষের আমন্ত্রণে ভারত বাংলাদেশ দখল করে নিতে পারে।

এটা স্বাভাবিকভাবে বিশ্বাস করার সঙ্গত কারণ রয়েছে যে, যে দেশটি আমাদর অস্তিত্বে বিশ্বাস করেনা, আমাদের স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধি প্রত্যাশা করেনা এবং আমাদেরকে পঙ্গু ও অচল করার জন্য অবিরাম চক্রান্তে লিপ্ত, সে-ই বিডিআর সদর দফতরে এ অমানবিক কান্ড ঘটিয়েছে।

বিডিআর সদর দফতরে গণহত্যার মূল হোতাদের পরিচয় উন্মোচন করে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সংসদে বলেছিলেন, তারাই এই ঘটনার চক্রান্ত পাকিয়েছে যারা বাংলাদেশকে একটি করদ রাজ্যে এবং প্রধানমন্ত্রীকে মুখ্যমন্ত্রীতে নামিয়ে আনতে চায়। তারা আমাদের দেশপ্রেমিক সশস্ত্র বাহিনীকে নির্মূল করতে চায়।

ভারতের সংশ্লিষ্ঠতা

রাজনৈতিক ও সামরিক বিশ্লেষক ও পর্যবেক্ষকদের অভিযোগ, বহুবিধ কূট-চক্রান্ত ও উদ্দেশ্যকে সামনে লেখে পিলখানায় এ হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়। বিদ্রোহের নারকীয় রূপ এই সত্যকে উদ্ঘাটিত করে যে, ইহা কেবল বিডিআর জোয়ানদের সমস্যা-সংশ্লিষ্ট দাবী কিংবা সেনা কর্মকর্তা বিরোধী মানসিকতা বা অনুভূতির জন্যই ঘটেনি, ঐ অজুহাতগুলোকে বরং সেনা কর্মকর্তাদেরকে হত্যা করার ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। বিডিআর সদর দফতরে যা ঘটেছে, তা স্বত:স্ফূর্ত বিদ্রোহ ছিলনা। ইহা ছিল আমাদের সেনাবাহিনী নিশ্চিহ্ন করার আমাদের শত্রুদের পূর্বপরিকল্পিত চক্রান্তের অংশ বিশেষ। কারা এ শত্রু?

পর্যবেক্ষক মহল, এমনকি গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ মনে করে যে, পিলখানা সেনাকর্মকর্তা নিধনের মূল হোতা হলো ভারত। ভারতীয় নীতি-নির্ধারকদের মন্তব্য ও বক্তব্য এবং সমর প্রস্তুতি, বিশেষত: ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রণব মূখার্জীর বাংলাদেশে তথাকথিত ভারতীয় শান্তি-মিশন পাঠানোর প্রস্তাব এবং

www.pathagar.com

ইসলামী জঙ্গীদের এ ঘটনার সাথে জড়িয়ে ভারতীয় প্রচার মাধ্যমের প্রচারণা এই হত্যাকান্ডের সাথে ভারতের সংশ্লিষ্ঠতা প্রমাণ করে।

অপরাধ বিজ্ঞানে অতি প্রচলিত একটি প্রবাদ রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপরাধী কৃত অপরাধের সাথে তার সংশ্লিষ্ঠতার কিছু প্রমাণ রেখে যায়। বিডিআর বিদ্রোহ তথা হত্যাকান্ডের হোতারাও তাদের সংশ্লিষ্ঠতা গোপন রাখতে পারেনি। পিলখানা হত্যাকান্ডের অব্যবহতি পরেই ভারতের অযাচিত স্বেচ্ছাপ্রণোদিত প্রস্তাব এ ঘটনার সাথে ভারতের জড়িত থাকার সাক্ষ্য বহন করে। এসব প্রস্তাব যদি গ্রহণ কিংবা বাস্তবায়িত হয়,তা কেবল বাংলাদেশকে ভারতের গোলামে পরিণত করার প্রক্রিয়াকেই জোরদার করবে। এই প্রস্তাবগুলো হলো : (১) বিডিআর এর জন্য অর্থ প্রদান, (২) বাংলাদেশে যে কোন ধরনের সাহায্য প্রদান, (৩) পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ভারতীয় সেন্য প্রেরণ, (৪) বিডিআর পুনর্গঠনে সহযোগিতা প্রদান।

পিলখানা গণহত্যায় ভারতীয় সংশ্লিষ্ঠতার প্রতি ইঙ্গিত করে বন্দীদশা হতে উদ্ধারকৃত জনৈক সেনা কর্মকর্তা একটি বেসরকারী টিভি চ্যানেলের সাথে সাক্ষাৎকারকালে এই বিপর্যয়ের সাথে বিদেশী শক্তি জড়িত ছিল অভিযোগ করেছেন। তার মতে, এটা ছিল বেশ সুচিন্তিত সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা। ইহা কোনভাবেই বঞ্চনার প্রতিক্রিয়া বা বিডিআর সদস্যদের বিরক্তির বহির্প্রকাশ নয়। পশুবৎ নির্মমতার ব্যাপকতা কিংবা মৃত সেনা কর্মকর্তাদের প্রতি অপমানজনক অশোভনীয় নির্দয় আচরণ এই ইঙ্গিত দেয় যে, কোন বিডিআর সদস্যই তাদের নিহত উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে কোনভাবেই এমন কুৎচিত ব্যবহার করতে পারেনা।[২] এমন বর্বর নির্দয়তা কেবল বিদেশী হত্যাকারীরাই উদ্দেশ্যেমূলকভাবে করতে পারে। নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি নজর দিলেই এই গণহত্যার সাথে ভারতের সরাসরি জড়িত থাকার অভিযোগটি পরিষ্কার হয়।

ভারতীয় সৈন্য মোতায়েন : কলিকাতার প্রধান দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকার (ফেব্রুয়ারী ২৬, ২০০৯) এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রণব মুখার্জী টেলিফোনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে আলাপকালে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে বিস্ময়কর প্রস্তাব দিয়ে বলেন, ভারত

[২] মোকাররম হোসেন, দৈনিক নয়া দিগন্ত, ঢাকা, ৭ মার্চ, ২০০৯।

www.pathagar.com

বিডিআর'এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বাংলাদেশকে প্রদান করতে প্রস্তুত রয়েছে। একই দৈনিক একই সংখ্যায় জানিয়েছে, ভারতীয় কর্মকর্তাদের সাথে আলাপকালে প্রণব মুখার্জি জানিয়েছেন,পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য বাংলাদেশকে প্রয়োজনীয় যেকোন সাহায্য প্রদানে ভারত প্রস্তুত রয়েছে। 'যেকোন ধরনের সহযোগিতা' বলতে বাংলাদেশে ভারতীয় সৈন্য পাঠানোর ভারতীয় ইচ্ছার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা অভিযোগ করেছেন। এই দুটো স্বেচ্ছাপ্রণোদিত প্রস্তাবই এ অভিযোগ প্রমাণে স্বব্যাখ্যীয়, ভারত এই বিপর্যয় হতে ফায়দা লুটার চক্রান্তে লিপ্ত ছিল। কারণ ভারতই এ বিপর্যয় ঘটিয়েছে, যা বাংলাদেশকে সুনামির মতো ঝাকুনি দিয়েছে। বাংলাদেশ এ সমস্যা সমাধানে কোন দেশ থেকে আর্থিক কিংবা অন্যকোন ধরনে সহযোগিতা চায়নি। তা হলে প্রণব মুখার্জি কেন 'বিডিআর' এর জন্য অর্থ প্রদানের আকস্মিক এবং এককভাবে প্রস্তাব উত্থাপন করে। বিশ্বে এমন বহু দেশ রয়েছে যারা ভারতকে কয়েক শতবার কিনতে পারে। তাদের সাথে বাংলাদেশের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তাদের কেউই এমন অবাক-করা প্রস্তাব প্রদান করেনি। ভারত বাস্তবে বাংলাদেশের মতোই দরিদ্র। প্রায় ৩৩ শতাংশ ভারতীয় এখনো অনেক বাংলাদেশীদের তুলনায় দরিদ্রতর। এমন একটি ফকির-রাষ্ট্র কেন বিডিআর এর জন্য অর্থ প্রদানে প্রস্তুত থাকার কথা জানিয়েছে? এটা কি স্বার্থবিহীন? এমন সহযোগিতা প্রদানের আগ্রহের পেছনে কি কোন গোপন মতলব নেই?

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য "যে কোন ধরনের সহযোগিতা " দরকার তা প্রদানে তার দেশ প্রস্তুত, এ কথা বলে প্রণব মুখার্জি কিসের ইঙ্গিত দিয়েছেন? এ ধরনের প্রস্তুতি কি বাংলাদেশের ভারতীয় সৈন্য প্রেরণের ইঙ্গিত বহন করেনা? সৈন্য ছাড়া একটি সশস্ত্র বিদ্রোহ দমনের জন্য অন্য আর কোন ধরনের সাহায্য প্রয়োজন? পিলখানায় বিডিআর বিদ্রোহ ও গণহত্যার সুযোগ ব্যবহার করে সাহায্যের নামে প্রণব মুখার্জি স্পষ্টভাবে বাংলাদেশে ভারতীয় সৈন্য মোতায়েনের গোপন কুমতলব ও চক্রান্ত প্রকাশ্যে নিয়ে আসলেন। প্রণব মুখার্জি প্রকাশ্যে ভারতীয় ইচ্ছে খোলাসা করতে দ্বিধাবোধ করেননি যে, শেখ হাসিনা বিব্রতকর অবস্থায় পড়লে ভারত তাকে উদ্ধার না করে অলস বসে থাকবেনা। আসল কথা হলো ভারত ১৯৭২ সনে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করেছে। চাপের মুখে বাংলাদেশ হতে সৈন্য

www.pathagar.com

প্রত্যাহারে বাধ্য হবার প্রতি ইংগিত করে ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি জৈল সিং কলিকাতা থেকে প্রকাশিত অধুনালুপ্ত 'সানডে' (২৭ জুলাই ১৯৮৭) সাময়িকীর সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ১৯৭২ সনে বাংলাদেশ হতে দ্রুত ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার সুবিবেচনা-প্রসূত ছিলনা। এ ধরনের প্রত্যাহার ভারতের স্বার্থের পরিপন্থী ছিল বলে মন্তব্য করে তিনি বলেন, "We could not protect the interest of country withdrawing troops hurriedly." (দ্রুত সৈন্য প্রত্যাহার করে আমরা দেশের স্বার্থ রক্ষা করতে পারি নি।)

ভারতীয় নীতি-নির্ধারকরা মনে করে বাংলাদেশকে ভারতের হাতের মুঠায় রাখতে হলে এদেশে ভারতীয় সৈন্য স্থায়ীভাবে মোতায়েন রাখতে হবে। এই লক্ষ্যার্জনের জন্য ভারত বিভিন্ন ধরনের চক্রান্ত এঁটে যাচ্ছে। আন্ত:সীমান্ত অপরাধ ও সন্ত্রাস দমনে দক্ষিণ এশীয় 'যৌথ ট্রাস্কফোর্স' 'যৌথ সীমান্ত পাহারা' প্রভৃতির আড়ালে ভারত বাংলাদেশ ভূখন্ডে ভারতীয় সৈন্য মোতায়েনের চেষ্টা করছে। কলিকাতার দৈনিক 'টেলিগ্রাফ' (২৬ ফেব্রুয়ারী ২০০৯) এক প্রতিবেদনে ভারতের আসল মতলব আরো স্পষ্ট করেছে। নতুন দিল্লীকেন্দ্রিক ভারতীয় কর্মকর্তাদের উদ্ধৃত করে পত্রিকাটি জানিয়েছে, ভারত বাংলাদেশে 'শান্তি মিশন' পাঠানোর পরিকল্পনা করছে। বাংলাদেশ সম্মত হলে ঢাকা-কলিকাতার মধ্যে চলাচলকারী বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী ট্রেন পাহারা দেয়ার জন্য ভারত তার সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ (সিআরপি), রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স বা বিএসএফ পাঠানোর প্রস্তাব বিবেচনা করবে। বাংলাদেশে তথাকথিত শান্তি মিশন পাঠানোর কারণ ব্যাখ্য করে পত্রিকাটি লিখছে, আগে বিডিআর মৈত্রী ট্রেনের নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। এখন বিডিআর সদস্যদের ওপর সেনাবাহিনীর কোন আস্থা নেই। আবার বিডিআর'ও সেনাবাহিনীকে বিশ্বাস করেনা। পত্রিকাটি জানায় এই কারণেই মৈত্রী ট্রেনের যাত্রী, ইঞ্জিন, মালামাল প্রভৃতি রক্ষার জন্য ভারত কমপক্ষে মৈত্রী ট্রেনের নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে ভারতীয় সৈন্য পাঠাতে চায়।

সর্ব প্রথম খবর প্রচার : রয়টার, এপি, এএফপি, বিবিসি, ভয়েজ অব আমেরিকা, সিএনএন, আল-জাজিরা, এমনকি বাংলাদেশী টিভি চ্যানেলগুলোকে পেছনে ফেলে ভারতীয় ব্যক্তি মালিকানাধীন টিভি চ্যানেল সিএনএন-আইবিএন বাংলাদেশ সময় দুপুর ১২টায় ১৩ মিনিটে (২৫মে) সর্বপ্রথম বিডিআর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল শাকিল আহমদের নিহত

www.pathagar.com

হবার খবর প্রচার করে। বাংলাদেশী কোন টিভি বা রেডিও চ্যানেল তাদের ঘরের ভেতরে ঘটা এমন লোমহর্ষক নারকীয় ঘটনার খবর পায়নি। এমনকি পরবর্তী দিন অর্থ্যাৎ ২৬ ফেব্রুয়ারী (২০০৯) বাংলাদেশের কোন দৈনিক এমন খবর প্রকাশ করেনি। অর্থ্যাৎ তারা এমন খবর পায়নি। তাহলে এই স্বাভাবিক কিন্তু জটিল প্রশ্ন জাগে কার মাধ্যমে ভারতীয় টিভি চ্যানেলটি এমন স্পর্শকাতর অথচ যথার্থ খবরটি তাৎক্ষণিক সংগ্রহে ও প্রচারে সক্ষম হয়েছিল। এর সহজ উত্তর হলো, জেনারেল শাকিল ও তার সহকর্মীদের হত্যার সময় বিডিআর সদর দফতরে ভারতীয় কিলার কিংবা গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা উপস্থিত ছিল, যারা বিডিআর মহাপরিচালকের নিহত হবার সত্যতা নিশ্চিত করে। পিলখানা হত্যাকান্ডে ভারতীয় সংশ্লিষ্টতা গোপন করার উদ্দেশ্যে ভারতীয় টিভি চ্যানেল সিএনএন-আইবিএন, এনটিভি, এবং টেলিগ্রাফ, হিন্দুস্থান টাইমস, আনন্দবাজার পত্রিকা প্রভৃতি পিলখানা হত্যাকান্ডের জন্য প্রধান দুটি বিরোধী দল বিএনপি-জামাত চক্রকে দায়ী করে। কিভাবে ভারতীয় টিভি চ্যানেল বা পত্রিকার সাংবাদিকরা ভারতে বসে তাৎক্ষণিক জানতে পারে যে, এই হত্যাকান্ডের সাথে বিএনপি-জামাত জড়িত ছিল? ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমের এমন আচরণ থেকে বুঝা যায়, তারা কি বলবে তা আগে থেকেই প্রস্তুত করা ছিল।

একমাত্র সুবিধাভোগী: সাধারণত: মনে করা হয়, কোন দেশে সংঘটিত কোন দুর্ঘটনা-দুষ্কর্ম হতে যে দেশটি সুবিধা কুড়ায়, সে দেশটিই ঐ ঘটনার মূল অনুঘটক। পিলখানা হত্যাকান্ডসহ বাংলাদেশের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া যেকোন দুর্যোগের তাৎক্ষণিক ও একমাত্র সুবিধাপ্রাপ্ত দেশ হলো ভারত। বাস্তব পরিস্থিতি এবং অন্যান্য তথ্য-প্রমাণ বিশ্লেষণ করে তথ্যাভিজ্ঞমহল দাবী করেন যে, পিলখানা বিপর্যয় ভারতই ঘটিয়েছে। তাদের মতে ভারতীয় নীতি-নির্ধারক ও সংবাদ মাধ্যমের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া, তাদের উদ্দেশ্যেমূলক অবাঞ্চিত ও কুৎসিত প্রস্তাব এই গণহত্যার সাথে ভারতের জড়িত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করছে। ঢাকার অভিজাত ইংরেজি দৈনিক 'দ্য বাংলাদেশ অবজার্ভার' তার সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখেছে:

"Now here is a conspiracy, if ever there was one, the mutiny was staged by the Indian intelligence agencies in order to create an abnormal situation for sending Indian troops. But this theory is

www.pathagar.com

based on facts that in November 1971 the Bangladesh government in exile had to sign a precondition that said Bangladesh would not raise any regular professional Armed forces. On his return, Sheikh Mujibur Rahman defied the precondition and went ahead and raised the Armed forces. So was the BDR mutiny a part of this longstanding Scheme."

(এখন এখানে একটিই চক্রান্ত, যদি তেমনটি কখনো থেকে থাকে, তা হল ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা (বাংলাদেশে) ভারতীয় সৈন্য প্রেরণের উদ্দেশ্যে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য বিডিআর বিদ্রোহ ঘটিয়েছে। এই তত্ত্ব এই বাস্তব সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, ১৯৭১ সনে প্রবাসী সরকারকে এমন পূর্বশর্ত (যুক্ত চুক্তি) স্বাক্ষর করতে হয়, যাতে বলা হয়, বাংলাদেশ কোন পেশাদার নিয়মিত সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলবে না। (পাকিস্তান থেকে) ফিরে এসে শেখ মুজিবুর রহমান ঐ পূর্বশর্ত অগ্রাহ্য করে সশস্ত্র বাহিনী গঠনে এগিয়ে যান। সুতরাং বিডিআর বিদ্রোহ ঐ দীর্ঘ সময় ধরে লালিত চক্রান্তের অংশ বিশেষ।

দৈনিক অবজারভার তার সম্পাদকীয় মন্তব্যে বাংলাদেশের সর্বশ্রেণী-পেশার মানুষের অনুভূতি, আবেগ ও বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটিয়েছে। টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া এবং সুন্দরবন থেকে সিলেট পর্যন্ত যেকোন বাংলাদেশীকে যদি এমন প্রশ্ন করা হয় যে, কারা বাংলাদেশের ওপর এমন বজ্রাঘাতসম আঘাত হেনেছে। উত্তরে অভিন্ন ধ্বনিই বেরিয়ে আসবে – ভারত এবং তার গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ এবং তাদের স্থানীয় সেবাদাসরা এই মর্মান্তিক ঘটনার নেপথ্য নায়ক।

'দৈনিক অবজারভার' যার সম্পাদক জনাব ইকবাল ছোবহান চৌধুরী আওয়ামী লীগের বিশ্বস্ত মিত্র, প্রশ্ন রেখেছে, বিডিআর বিদ্রোহ কি বিডিআর এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে নেতৃত্বশূন্য করার অংশবিশেষ, যাকে ভারত তার জন্য মাথাব্যথা ও বিপদ বলে বিবেচনা করে।

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীকে 'বিপদজনক' হিসেবে বিবেচনা করার পেছনে ভারতের পক্ষ্যে অনেকগুলো কারণ রয়েছে। 'অবজার্ভার' এর মতে, পাকিস্তান আমলে ভারত পূর্ব পাকিস্তান-সংলগ্ন সীমান্ত পাহারা দেওয়ার জন্য বার্ষিক ৩৫ হাজার কোটি রূপী ব্যয় করত। ইহা ব্যাপকভাবে প্রত্যাশিত ছিল যে, পূর্ব

www.pathagar.com

পাকিস্তান পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হলে এই বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় বন্ধ হবে। এই উদ্দেশ্যেই ভারত প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারকে স্বাধীন বাংলাদেশে কোন পেশাদার নিয়মিত সশস্ত্র বাহিনী গঠন করা হবে না, এমন প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য করে। এই প্রচেষ্টার বহুবিদ উদ্দেশ্যে ছিলঃ এর পূর্ব সীমান্তে ভীতির অবসান ঘটানো, বাংলাদেশকে ভারতীয় থাবার নিচে রাখা, যখনই ভারত চাইবে সে সময় বাংলাদেশ দখল করা । ঢাকা থেকেই প্রকাশিত সাময়িকী 'সাপ্তাহিক' (৫, মার্চ ২০০৯) বাহ্যত-অজ্ঞাত এই হোতার প্রতি ইঙ্গিত করে প্রশ্ন করেছে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর দুর্বলতা আরো ব্যাপকতর করে কে উপকৃত হবে? সেনাবাহিনীকে অপেশাদারী বিপদজনক কাজের দিকে ঠেলে কে সুবিধা লুটে নিতে চায়? সেনা কর্মকর্তা ও বিডিআর জোয়ানদের মধ্যে শত্রুতা ও দ্বন্দ্বের সুবিধা কে পাবে? পূর্ব পরিকল্পিত চক্রান্ত-সৃষ্ট লোমহর্ষক গণহত্যার কারণে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর ভাব-মর্যদা ক্ষুন্ন করে কারা সুবিধা প্রাপ্ত হবে? জনগণ, রাজনীতিবিদ ও সশস্ত্রবাহিনীর মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে এবং দেশকে অরক্ষিত ও পাহারাহীন রেখে কাদের স্বার্থসিদ্ধি হবে? আমাদের সশস্ত্র বাহিনী জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করেছে। সশস্ত্র বাহিনীকে দুর্নীতিবাজ হিসেবে চিহ্নিত করে কার স্বার্থ অর্জিত হচ্ছে?

পিলখানা গণহত্যার প্রকৃত সুবিধাভোগী হলো ভারত। দেখা যাক এ নির্মম হত্যাকান্ডের মাধ্যমে ভারত কিভাবে লাভবান হচ্ছে? পিলখানা হত্যাকান্ডের মাধ্যমে ভারতের কমপক্ষে দু'টো সমান্তরাল উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়েছেঃ সেনা কর্মকর্তাতের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন ও অবমূল্যায়নের পরিবেশ এবং তাদের ওপর মানসিক মনস্তাত্তিক চাপ সৃষ্টি করা । তাছাড়া এই হত্যাকান্ড আমাদের সামগ্রিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিশেষতঃ ভারতের সাথে দীর্ঘ সীমান্তে নজরদারীতে ভীষণ নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। সাবেক বিডিআর মহাপরিচালক অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল আনোয়ার হোসেন দৈনিক ইত্তেফাক এর সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তের প্রায় সবটাই ভারতের সাথে। এই সীমান্ত অরক্ষিত ও নজরদারিহীন থাকলে কে উপকৃত হবে?[৩]

[৩] দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ৩ মার্চ ২০০৯।

www.pathagar.com

পিলখানা হত্যাকান্ডের পর ভারতীয় দুস্কৃতিকারীদের বাংলাদেশী গরু, ছাগল, মহিষ, শস্য ইত্যাদি লুটের ঘটনা আশংকাজনকভাবে বেড়ে গেছে। সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী বাংলাদেশীদের মধ্যে যারা ইতোপূর্বে ভারতীয় দুস্কৃতকারীদের অপকর্মের প্রতিবাদ করেছিল তাদেরকে হত্যা করা হয়। যেসব বাংলাদেশী একদা বিডিআর জোয়ানদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিএসএফ'এর হামলা এবং চোরাচালানীদের প্রতিহত করেছে, এখন আত্মরক্ষায় শঙ্কিত হয়ে তারা একেবারে নিরব হয়ে গেছে। নির্যাতন ও হয়রানির ভয়ে এখন সীমান্তবাসী বাংলাদেশীরা ভারতীয় সন্ত্রাসী বা বিএসএফ এর গুলিতে নিহত স্বজনদের লাশ দাবী করেনা।

বাংলাদেশ ভূখন্ড হতে কোন প্রতিরোধ না থাকায় ভারত এখন স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বস্তিবোধ করছে। পিলখানা হত্যাকান্ড সম্পূর্ণরূপে যে ভারতীয় স্বার্থের অনুকূলে গিয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিডিআর'এর সিংহসম অবস্থান এখন মেষ শাবকের পর্যায়ে নেমে এসেছে। ভারত পিলখানা বিপর্যয়ের একমাত্র সুবিধাভোগী। কেউ জানেনা বিডিআর এবং সেনাবাহিনী তাদের পূর্বকার মনোবল, সাহস, কর্ম-প্রেরণা, ক্ষিপ্রতা ও দক্ষতা কবে ফিরে পাবে? কবে তারা আমাদের সীমান্ত ও দেশ রক্ষার শক্তি, দৃঢ়তা অর্জন করবে? কোন কোন বিশ্লেষক বিশ্বাস করেন, বিডিআর বিদ্রোহের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের মূল কারণ পদুয়া-বড়াইবাড়ীতে ভারতীয় পরাজয়ের প্রতিশোধ হলেও এর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল যে কোন অজুহাতে, এমনকি ঢাকা-কলিকাতার মধ্যে চলাচলকারী মৈত্রী ট্রেন পাহারার আবরণে হলেও শান্তি মিশনের নামে বাংলাদেশে ভারতীয় সৈন্য গ্রহণে বাংলাদেশকে রাজী করানো। কথিত শান্তি মিশনের মূল উদ্দেশ্য ছিল এই বাহিনী দখলদার বাহিনী হিসেবে কাজ করবে এবং বিডিআর জোয়ান ও সেনাবাহিনীর মধ্যে বিরোধ ও দ্বন্দ্বের আরো অবনতি ঘটিয়ে ভারতীয় বাহিনীর অবস্থানকে চিরস্থায়ী করবে। এর মাধ্যমে ভারত দ্বিবিধ সুবিধা প্রাপ্তির অপেক্ষায় ছিল। এগুলো হলো: ভারতের করিডোর প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করা এবং বাংলাদেশের নিজস্ব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ পঙ্গু করে ধ্বংস করা। ইহা ছিল ১৯৭১ সনে মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের ওপর চাপিয়ে দেয়া জবরদস্তিমূলক চুক্তির বাস্তবায়ন মাত্র, যাতে বলা হয়েছিল বাংলাদেশের কোন নিয়মিত পেশাদার সেনাবাহিনী থাকবেনা, বরং বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ভারতীয় বাহিনীই নিশ্চিত করবে। ভারতে গঠিত প্রবাসী সরকারের সাথে

www.pathagar.com

স্বাক্ষরিত ৭ দফা চুক্তির সামান্য অংশই স্বাধীনতার পর বাস্তবায়িত হয়েছিল।[৪]

সমর প্রস্তুতি : বাংলাদেশে বিডিআর বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে ভারতের সমর প্রস্তুতি নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে বিদ্রোহ থেকে ফায়দা লুটার চক্রান্ত থেকেই ভারত এ বিদ্রোহ ঘটিয়েছিল। বিডিআর বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে ভারতের সমর প্রস্তুতির বিবরণ 'হিন্দুস্থান টাইমস' 'দ্য টেলিগ্রাফ'সহ অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমে বেশ গুরুত্ব সহকারে প্রচার করে। ২ মার্চ, ২০০৯ 'হিন্দুস্থান টাইমস' এক প্রতিবেদনে লিখেছে, বাংলাদেশে মানবিক কারণে হস্তক্ষেপ করার জন্য ভারতীয় সৈন্যদের প্রস্তুত রাখা হয়। বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন আসামের জোড়াহাট বিমান ঘাঁটিতে বেশ কিছু যুদ্ধ বিমান প্রস্তুত ছিল। সেখানে রেড এলার্ট (সর্বোচ্চ সর্তকতা) জারী করা হয়। আগ্রা থেকে বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত এক ব্রিগেড প্যারাস্যুট বাহিনী কলিকাতার নিকটবর্তী কালাইকুন্ডায় আনা হয়। বাংলাদেশে একটি আভ্যন্তরীণ গোলযোগ চলাকালীন ভারতের এই সমর প্রস্তুতির রহস্য কি পিলখানার খুনীদের, বিশেষত: মুখোশ পরিহিতদের, উদ্বার করা যারা রহস্যজনকভাবে বিডিআর সদর দফতরে প্রবেশ করে এই লোমহর্ষক হত্যাকান্ড ঘটিয়েছিল। উল্লেখ্য যে, সাত বছর ধরে নেপালে মাওবাদী বিদ্রোহ কিংবা ২৬ বছর যাবত শ্রীলংকার গৃহযুদ্ধের সময় ভারত কখনই এমন সমর প্রস্তুতি নেয়নি। এ সমর প্রস্তুতি এই সত্যতা উদঘাটন করেছে যে, বিডিআর বিদ্রোহকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে ভারত বাংলাদেশে সৈন্য প্রেরণের চক্রান্তে লিপ্ত ছিল। এই কারণে ভারত তার সেনাবাহিনীকে সতর্কাবস্থায় প্রস্তুত রেখেছিল। ভারত সুনিশ্চিত ছিল যে কোন মুহূর্তে ভারতীয় সৈন্য প্রেরণের জন্য বাংলাদেশ হতে আমন্ত্রণ বা অনুরোধ আসবে। তথ্যাভিজ্ঞমহল জানিয়েছেন, ৫০তম ইনডিপেণ্ডেন্ট প্যারাস্যুট বিগ্রেড এর এক ব্যাটালিয়ন (এক হাজারের বেশী সদস্যবিশিষ্ট) রবিবার (২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০০৯) আগ্রা হতে বিরাটাকারের বিমানঘাঁটি কালাইকুণ্ডায় রাতারাতি বিমান যোগে আনা হয়। পরিস্থিতি বিবেচনা করে অরো সৈন্য আনার প্রস্তুতি ছিল। বিডিআর জোয়ানদের কাছ থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের চৌকিগুলো ক্রমাগতভাবে

[৪] MBI Munshi, The BDR Mutiny- revenge for Padua & Boraibari incident, march 02, 2009-httpwww.hewsfrombangladesh.net/view?hidrecord=249915

www.pathagar.com

দখল করে নেয়ার প্রেক্ষাপটে সর্তকতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে এই উদ্যোগ নেয়া হয়।[৫]

'দ্য টেলিগ্রাফ' জানায়, ভারত শেখ হাসিনাকে উদ্বার করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে সৈন্য প্রেরণে প্রস্তুত ছিল। ভারত অতি দ্রুততার সাথে প্রস্তুতি সম্পন্ন করে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্যারাস্যুট রেজিমেন্টকে রাতারাতি আগ্রা থেকে পশ্চিম বাংলায় আনা হয়। বিমান বাহিনীকে কলিকাতা এবং আসামের গৌহাটিতে সর্বোচ্চ সর্তক অবস্থায় রাখা হয়।[৬]

বিদ্রোহীদের যোগাযোগ : সময়ের বিবর্তনে প্রামাণ্য তথ্য বেরিয়ে আসছে যে, বিদ্রোহীরা তাদের সীমান্তবর্তী মিত্রদের সাথে গণহত্যা চলাকালীন এবং তার আগে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখে। এতে প্রমাণিত হয় যে, এ বিদ্রোহ আসলে সুসংবদ্ধ চক্রান্তের ফসল। এতদসংক্রান্ত বিভিন্ন যোগাযোগের তথ্য ইতোমধ্যে বেরিয়ে এসেছে। এগুলো একত্রে সন্নিবেশিত করলে ষড়যন্ত্রের বিষয়টি বাস্তব হিসেবে প্রমাণিত হয়।[৭]

বাংলাদেশের বিভিন্ন দৈনিকে এমন খবর এসেছে যে, বিএসএফ তাদের সহযোগিতা চাওয়ার জন্য বিডিআর জোয়ানদের কাছে এসএমএস'এর মাধ্যমে পরামর্শ দিয়েছিল। গণহত্যা চলাকালীন বিএসএফ'এর এসএমএস' এ বলা হয়, "সেনাবাহিনীর সদস্যরা তোমাদের সীমান্ত চৌকিগুলো দখল করে নেবে। তোমাদের সাহায্য করার জন্য দয়া করে আমাদেরকে আহ্বান কর।" তৌহিদের সেল ফোন পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, সে বেশ কিছু সংখ্যক উচ্চপদস্থ ভারতীয় কর্মকর্তাদের সাথে নিয়মিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করত। বিভিন্ন সুত্র নিশ্চিত করেছেন যে, তৌহিদ ঐ নারকীয় দিনে তার ভারতীয় মুরুব্বী ও সহযোগিদের সাথে ৩০০ (তিনশত) বারের বেশী সেলফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করেছিল। ভারত যে এই চক্রান্তের মূল হোতা তা প্রমাণের জন্য আর কি ধরনের প্রামাণ্য তথ্যের প্রয়োজন?

---

[৫] Bangladesh Mutiny : India moves more troops to WB, March 4, 2009, http//timesofIndia.indiatimes.com/India/Bangladesh-mutiny-india-moves more-troops-to-WB/articleshow/4220361.cms

[৬] The Telegraph, Kolkata, India, 28 February, 2009.

[৭] Sultan M. Hali. BDR Mutiny : An India Conspiracy, Bangladesh Open Source Intelligence Monitors, 27 March, 2009.

www.pathagar.com

বিডিআর বিদ্রোহীদের গ্রেফতারে অনীহা : ২৮ ফেব্রুয়ারী (২০০৯) ভারতীয় দৈনিক 'দ্য টেলিগ্রাফ'এর এক প্রতিবেদনে বলা হয় ঢাকা নয়াদিল্লীকে বিডিআর এর বিদ্রোহী জোয়ানদের নিরস্ত্র করে বাংলাদেশে প্রেরণের অনুরোধ জানিয়েছে। বিভিন্ন সীমান্ত পথে বহু বিডিআর বিদ্রোহী ভারতে পালিয়ে যায়। এই উদ্দেশ্যে তারা সীমান্তে মোতায়েনকৃত বিএসএফ সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করে। বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ ভারতকে জানিয়েছে যে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিদ্রোহীদের ভারতীয় সীমান্ত পর্যন্ত তাড়া করেছিল। গ্রেফতার এড়িয়ে অনেকেই ভারতীয় ভূখন্ডে ঢুকে পড়ে। দৈনিকটির মতে, প্রায় সাতশত বিডিআর বিদ্রোহী পলাতক রয়েছে। কিন্তু ভারত পলায়নরত বিদ্রোহীদের আটকে সামন্যতম উৎসাহ কিংবা ইচ্ছা প্রদর্শন করেনি। যদিও যুক্তরাষ্ট্রও এতদ অঞ্চলের স্থিতিশীলতার স্বার্থে ভূমিকা রাখার জন্য ভারতকে পরামর্শ দিয়েছিল। বাংলাদেশ বিষয়ে জনৈক ভারতীয় বিশেষজ্ঞকে উদ্ধৃত করে দৈনিকটি জানিয়েছে যে, বিদ্রোহজনিত অবস্থার জন্য বাংলাদেশের প্রতি সহানভূতিশীল হওয়া সত্বেও ভারত অন্যরা (মানে আমেরিকা) কি বলেছে সে ভিত্তিতে নয়, বরং ভারত নিজস্ব ইচ্ছে ও স্বার্থানুয়ী কাজ করবে।[৮]

'টেলিগ্রাফ' জানিয়েছে, সীমান্তের ৩০টি পয়েন্টে বিডিআর বিদ্রোহীরা বিএসএফ'এর সাথে আশ্রয়ের জন্য যোগাযোগ করেছিল। এসব পয়েন্ট পশ্চিম বঙ্গ, আসাম, মেঘালয় ও ত্রিপুরা সীমান্তে অবস্থিত। কোন কোন পয়েন্টে বিডিআর বিদ্রোহীরা ভারতে আশ্রয় চেয়ে বিএসএফ'র কাছে চিঠি লিখেছে।

উপসংহারে দৈনিকটি জানায়, ভারত আন্তর্জাতিক চাপে কোন কিছু করবেনা। ভারত তার সার্বিক স্বার্থ বিবেচনা করেই সিদ্ধান্ত নিবে।

উপরোক্ত প্রতিবেদন এই সতত্য নিশ্চিত করেছে যে, খুনীদের অনেকেই ভারত আশ্রয় পেয়েছে এবং ভারত কোনভাবেই তাদেরকে বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তর করতে প্রস্তুত নয়। ভারতের এই অবস্থান নিশ্চিত করে যে ভারত এই গণহত্যার একমাত্র রূপকার।

মায়ানমারের সাথে বাংলাদেশের ২০৮ কি.মি. স্থল এবং ৬৩ কি.মি. নৌ-সীমান্ত রয়েছে। এই সীমান্তে বেশ কিছু সংখ্যক চৌকি রয়েছে। কোন বিডিআর সদস্যই মায়ানমার সীমান্ত রক্ষী নাসাকা'র সাথে যোগাযোগ করেনি

---

[৮] ডঃ রেজোয়ান সিদ্দিকী, উপ-সম্পাদকীয়, দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা, ৪ মার্চ, ২০০৯।

www.pathagar.com

কিংবা মায়ানমারে ঢুকে পড়েনি। অথবা মায়ানামারে আশ্রয় চায়নি। তাছাড়া মায়ানমারে তার সৈন্যদেরকেও সর্তক অবস্থায় থাকতে বলেনি, কিংবা বাংলাদেশে সাহায্যের নামে সৈন্য পাঠাতে চায়নি, বা ভারতের মতো বিডিআর পুনর্গঠনে ইচ্ছা প্রকাশ করেনি। মায়ানমারের সংবাদ মাধ্যম পিলখানা বিপর্যয় প্রসঙ্গে কোন কুৎসিত কিংবা অনাকাঙ্খিত মন্তব্যও করেনি। প্রশ্ন উঠেছে, বিডিআর বিদ্রোহীরা কেন ভারতে প্রবেশ করেছে এবং নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছে। বিডিআর বিদ্রোহীরা ভারতে এ জন্যই আশ্রয় নিয়েছে যে, তারা নিশ্চিত জানতো এতে তারা কোন ধরনের বিপদে পড়বেনা। কিন্তু যদি তারা মায়ানমারে পলায়ন করে, তবে তাদেরকে চরম বিপদের মুখোমুখি হতে হবে। ভারতের অতি উৎসাহী স্বেচ্ছাপ্রণোদিত প্রস্তাব, বিডিআর বিদ্রোহীদের ভারতে পলায়ন, তাদেরকে পাকড়াও করতে ভারতের অনুৎসাহ প্রভৃতি বিডিআর বিদ্রোহ এবং সেনা কর্মকর্তা হত্যায় ভারতের জড়িত থাকার বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে।

বিশ্লেষক ও বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, বিডিআর বিদ্রোহীদের ভারতে আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব-পরিকল্পিত না হয়ে তাৎক্ষণিক হলে তারা মায়ানমারেও প্রবেশ করত। কিন্তু তারা মায়ানমারে যায়নি। তাদের ভারতে পলায়ন এবং তাদেরকে স্বাগত জানাতে ভারতের সদ্বিচ্ছা প্রমাণ করে যে, সব কিছুই ছিল পূর্ব পরিকল্পিত ও প্রস্তুতিমূলক। পিলখানা বিপর্যয়কে ব্যবহার করে ভারত বাংলাদেশের কাছ থেকে দীর্ঘ দিন ধরে ঝুলে থাকা সুবিধা-চাহিদা আদায়ের জন্য চাপ প্রয়োগ করে। ভারতের ভূমিকা থেকে বাংলাদেশ সরকারকে তার আসল শত্রু'র চক্রান্ত অনুধাবন করতে হবে। ভারত সদ্য নির্বাচিত আওয়ামী লীগ সরকারের কাছ থেকে ট্রানজিট ও বন্দর সুবিধা এবং জয়েন্ট ট্রাস্কফোর্সসহ অন্যান্য চাহিদা পূরণের প্রত্যাশা করে। মূল বাস্তবতা হলো, ভারত যে কোন মূল্যে বাংলাদেশের সম্পদ লুটে নিতে চায়। শেখ হাসিনা ওয়াজেদের আওয়ামী লীগ ভারত-ঘেষা হবার প্রেক্ষিতে ভারতীয় গোয়েন্দা কর্মকর্তারা বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীতে সর্বাধিক মাত্রার ভীতি সৃষ্টি করে ভারতীয় বার্তা পৌছিয়ে দিতে চায় যে, ভারত উদ্দেশ্যেমূলকভাবে এই বিদ্রোহ ও গণহত্যা

www.pathagar.com

ঘটিয়ে ধূর্ততার সাথে এর দায়দায়িত্ব পাকিস্তানের আইএসআই'এর ওপর বর্তিয়ে নিজেকে আড়াল করতে চেয়েছে।[৯]

বিডিআর জোয়ানদের কতিপয় ন্যায্য দাবীকে অজুহাত হিসেবে অতি গোপনে ব্যবহার করে ভারত বিডিআর বিদ্রোহ সংঘঠনে সফল হয়। শেখ হাসিনা মাত্রাতিরিক্ত সময় নিয়ে খুনীদের হত্যাকান্ড চালিয়ে নিরাপদে পালিয়ে যেতে সুযোগ করে দিয়েছেন– খালেদা জিয়ার এমন অভিযোগ যথার্থ। পিলখানায় সেনাবাহিনী বিরোধী এই হত্যাকান্ডের মূল লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা সক্ষমতাকে ধ্বংস করে বাংলাদেশকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে রাখা। ভারত বাংলাদেশে তার সৈন্য মোতায়েন করতে চায়, শ্রীলংকায় যা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। অন্যদিক ভূটানে সফল হয়েছে। আর একই কায়দায় সিকিম তো দখলই করেছে । ভারত ইতোমধ্যেই বাংলাদেশে শান্তি মিশন প্রেরণের প্রস্তাব দিয়েছে।[১০]

কতিপয় ভারতীয় নীতি-নির্ধারক, গণমাধ্যম ও তাদের বাংলাদেশী সহযোগীরা পিলখানার হত্যাযজ্ঞকে জেএমবি ধরনের সন্ত্রাসী চক্রের সাথে জড়ানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তদন্তে এ ধরনের অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়েছে। বরং গ্রেফতারকৃত এবং সন্দেভাজনদের অনেকেই আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের অন্তর্ভূক্ত। এসব চক্রের অনেকেই চাঁদাবাজি, টোল আদায়, চোরাচালান, সন্ত্রাস, হত্যা, অগ্নিসংযোগ এবং অন্যান্য অপরাধ কর্মের সাথে আগে থেকেই জড়িত ছিল এবং বাংলাদেশে অবস্থা বেগতিক দেখলে এরা ভারতে পালিয়ে যায়। ২০০১ সনে বিএনপি ক্ষমতায় আসলে এরা গ্রেফতার এড়ানোর জন্য ভারতে আশ্রয় নেয়। কলিকাতা এবং পশ্চিম বঙ্গের আরো কয়েকটি জেলা এবং ত্রিপুরা বাংলাদেশী অপরাধীদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়। মির্জা আজম, জাহাঙ্গীর কবির নানক, শামিম ওসমান, জয়নাল হাজারী, আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ প্রমুখ ভারতে নিরাপদে অবস্থান করে। এদের অনেকেই বাংলাদেশে 'র' এর 'চর' হিসেবে কাজ করছে। এ ধরনের

---

[৯] Sultan M. Hali. BDR Mutiny : An India Conspiracy, Bangladesh Open Source Intelligence Monitors, 27 March, 2009.

[১০] Dr. K.M.A Malik, The Sugar-coated Poison: India's offer of 'help' to restructure BDR, Bangladesh Open Source Intelligence Monitors, 6 April, 2009.

www.pathagar.com

অভিযোগের অনুকূলে প্রামাণ্য তথ্য উপস্থাপন কঠিন হলেও ইহা সর্বজনজ্ঞাত যে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল, বুদ্ধিজীবী মহল, আইন ব্যবসায়ী, সংবাদ মাধ্যম, সাংস্কৃতিক অঙ্গন, এনজিও, ব্যবসায়ী শ্রেণী, এমনকি ধর্মীয় দল ও প্রতিষ্ঠানে 'র' এর নেটওয়ার্ক রয়েছে। বেসামরিক প্রশাসন, সশস্ত্রবাহিনী, বিডিআর এবং গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ 'র'এর ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘঠেছে।[১১]

কারণসমূহ

যুক্তিবিদ্যায় সর্বজনজ্ঞাত একটি কথা রয়েছে, কোন কিছুই কিছু ছাড়া ঘটেনা। প্রতিটি ঘটনার পেছনে যথাযথ কারণ বিদ্যমান থাকে। পিলখানায় হত্যাযজ্ঞের ক্ষেত্রে এই প্রবাদসম বাক্যটি বেশ প্রযোজ্য। এই হত্যাকান্ডের জন্য দায়ী অনেকগুলো কারণ বিভিন্ন মহল থেকে বিভিন্নভাবে এসেছে। তিনটি তদন্ত কমিটির মধ্যে দু'টো ইতোমধ্যেই তাদের প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিয়েছে। এই গ্রন্থ মুদ্রণের সর্বশেষ পর্যায়েও তৃতীয় কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়নি। সেনাবাহিনী কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন জমা দেয়া হলেও তার কোন অংশই জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়নি। অন্যদিকে স্বরাষ্টমন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটির ৩০৯ পৃষ্ঠার প্রতিবেদনের মধ্যে মাত্র সাত পৃষ্টা প্রকাশ করা হয়েছে। জমাকৃত দু'টি প্রতিবেদনই সঙ্গত কারণে পিলখানা বিপর্যয়ের অন্তর্নিহিত কারণ খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে আরো তদন্তের পরামর্শ দিয়েছে। তদন্ত কমিটি এবং সংবাদ মাধ্যম এই হত্যাকান্ডের পেছনে যে সব সাধারণ কারণ উল্লেখ করেছে, সেগুলো সম্ভবতঃ এমন রক্তাক্ত হত্যাকান্ড ঘটানোর জন্য যথেষ্ট নয় বলে বিবেচিত হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটি স্বীকার করেছে যে, আধা-সামরিক বাহিনীর এমন নারকীয় তান্ডবের যথার্থ কারণ ও মতলব উদ্ঘাটন ও নির্ধারণে কমিটি ব্যর্থ হয়েছে। সুতরাং সত্যিকারের কারণ উদঘাটনার্থে তদন্ত কমিটি আরো তদন্তের পরামর্শ দিয়েছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটি অবশ্য উল্লেখ করেছে যে, সেনা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিডিআর জোয়ানদের চলমান নেতিবাচক মানসিকতা এবং দাবী অপূর্ণ থাকায় তাদের অসন্তোষ ও বিরক্তি এবং ক্ষোভ এই দুর্যোগের প্রাথমিক কারণ হতে পারে।

---

[১১] Dr. K.M.A Malik, Ibid.

www.pathagar.com

তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, বিডিআর'এর দাবীগুলো বিশ্লেষণ করলে এটাই প্রমাণিত হয় যে, কতিপয় তুচ্ছ ও গুরুত্বহীন দাবী এমন ব্যাপক নির্মম ঘটনা ঘটানোর মূল কারণ হতে পারে না। বিডিআর জোয়ানদের মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়ানোর জন্যই ঐ সব দাবী ব্যবহার করা হলেও সেগুলো বাহানা মাত্র।

তদন্ত কমিটি মনে করে এসব দাবী ব্যবহার করে হত্যাকান্ডের রূপকাররা রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতাকে বিপদগ্রস্থ করার জন্য পেছন থেকে সূতো নেড়েছে। দেখা যাক বিডিআর জোয়ানদের দাবীগুলো কেমন।

নগন্য সুবিধা : পিলখানা বিপর্যয়ের কারণ উদ্ঘাটন করে ঢাকার একটি বাংলা দৈনিক লিখেছে যে, সারা বছর রেশন না দেয়া, বিভিন্ন কর্মসূচী হতে প্রাপ্ত অর্থ বিডিআর জোয়ানদের মধ্যে বিতরণ না করা, সীমান্ত ভাতা বৃদ্ধি না করা, সম্প্রতি পুলিশের জন্য ভিন্ন বেতন কাঠামো চালু করা হলেও বিডিআর'এর জন্য তেমন পদক্ষেপ না নেয়া, ইত্যাদি কারণে বিডিআর জোয়ানদের মনে ক্ষোভ ও বেদনার উদ্রেক করে।[১২]

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সূত্র উদ্ধৃত করে দৈনিকটি জানিয়েছে সব বিডিআর জোয়ান নিয়মিত রেশন সুবিধা পায়না। যদি এই বছর ৬০ শতাংশ বিডিআর জোয়ান রেশন সুবিধা পায়, বাকী ৪০ শতাংশ আগামী বছর এই সুবিধা পাবে। তিন-সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিবার মাসে ছয় কেজি আটা, ৩৬ কেজি চাল, তিন লিটার ভোজ্য তেল এবং তিন কেজি চিনি রেশন হিসেবে পেয়ে থাকে।

চারদলীয় জোটের শাসন কালে শতকরা একশত ভাগ জোয়ানকে ডালসহ সারা বছর ধরে রেশন সুবিধা প্রদানের দাবী উত্থাপিত হয়। কিন্তু দাবী অনুযায়ী কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। পিলখানা বিপর্যয়ের পর শেখ হাসিনা সরকার বিডিআর জোয়ানদের প্রদত্ত রেশনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং সারা বছর ধরে সবার জন্য রেশন প্রদানের ঘোষণা দেয়।

'সমকাল' জানিয়েছে, 'ডাল-ভাত' কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণকারী বিডিআর জোয়ানদের দেয় ভাতা তাদের মধ্যে ভাটোয়ারা করা হয়নি। এই বিপর্যয় ঘটার আগে ২০০৮ সনে অনুষ্ঠিত সংসদীয় নির্বাচনে দায়িত্ব পালনের জন্য প্রাপ্ত ভাতার এক-তৃতীয়াংশ বন্টন করা হয়েছে। সীমান্তে মোতায়েনকৃত

---

[১২] দৈনিক সমকাল, ঢাকা, ২৬ ফেব্রুয়ারী, ২০০৯।

www.pathagar.com

প্রত্যেক বিডিআর জোয়ান সীমান্ত ভাতা হিসেবে মাসিক ২০০ টাকা পায়। এই ভাতা বৃদ্ধির দাবী দীর্ঘ দিন ধরে ঝুলে আছে।

বিডিআর জোয়ানরা মনে করে সেনাবাহিনী থেকে প্রেষণে আসা সেনা কর্মকর্তারা তাদের দাবী-দাওয়ার প্রতি ততোখানি আন্তরিক নন। 'সমকাল' জানিয়েছে, তিনশতের বেশী কর্মকর্তাদের মধ্যে ২৫০ জনের বেশী কর্মকর্তা প্রেষণে সেনাবাহিনী থেকে আসা। দৈনিকটির মতে, এ ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ থেকে মুক্তি পাবার জন্য বিডিআর জোয়ানরা হিংসাত্মক পন্থা বেছে নিয়েছে।

বিডিআর জোয়ানরা সেনা কর্মকর্তাদের পরিবর্তে তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান হতে কর্মকর্তা নিয়োগের, শতভাগ জোয়ানদের রেশন প্রদানের, তাদের বেতন কাঠামো সেনাবাহিনীর আদলে পুন:নির্ধারণ এবং জাতিসংঘ শান্তি মিশনে বিডিআর জোয়ানদের প্রেরণের দাবী জানিয়ে আসছিল। তাছাড়া 'ডাল ভাত' কর্মসূচী পরিচালনা প্রক্রিয়া, বিডিআর এর মালিকানাধীন দোকান পরিচালনায় অস্বচ্ছতা, সেনা কর্মকর্তাদের বিলাসী জীবন যাপন, প্রভৃতি বিডিআর জোয়ানদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টির জন্য দায়ী বলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

শুরু থেকে বলা হয়েছিল যে, বঞ্চনা, বৈষম্য, শোষণ এবং কর্মকর্তাদের অত্যাচার ও কর্তৃত্ব বিডিআর জোয়ানদের বিদ্রোহ ঘটানোতে প্ররোচিত করেছে। কিন্তু নির্মমতা, বর্বরতা, গণহত্যার ব্যাপকতা, নিহত সেনা কর্মকর্তাদের লাশের প্রতি চরম অবমাননার মাত্রা একটি সত্যকেই উন্মোচিত করেছে যে, সমুদয় হৃদয়-বিদারক বিয়োগান্তক ঘটনাটি অতীব সুচিন্তিত ও সাজানো চক্রান্তের অংশ বিশেষ।

সেনা কর্মকর্তাদের নিয়োগ :

বিডিআর জোয়ানদের অন্যতম দাবী ছিল বিডিআর হতে সেনা কর্মকর্তাদের প্রত্যাহার করে পুলিশের মতো বিসিএস ক্যাডারদের তাদের কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ করা হোক। নিন্দুকদের মতে, এ দাবীর নেপথ্য কারণ ছিল সীমান্তে বিডিআর জোয়ানদের অসদোপায়ে অর্থ আয়ের পথ উন্মুক্ত করা, যা সেনা কর্মকর্তাদের উপস্থিতির কারণে কঠিন হয়ে পড়ে।

২০০২ সনের আগে সামান্য সংখ্যক সেনা কর্মকর্তা বিডিআর'এ নিয়োগ পেতেন। এসব সেনা কর্মকর্তারা সময় কাটানোর উদ্দেশ্যে অবসরে যাবার

www.pathagar.com

জন্য অপেক্ষা করতেন। ২০০২ সনের শেষ প্রান্তে মেধা-সম্পন্ন তেজস্বী সেনা কর্মকর্তাদের বিডিআর'এ প্রেষণে নিয়োগ করার পর হতে সীমান্ত পাহারা এবং আন্তঃসীমান্ত অপরাধ ও চোরাচালান পরিস্থিতি বদলে যেতে থাকে। স্মরণযোগ্য যে, ১৯৮০ সনের দিকে চোরাচালানীদের মাধ্যমে ভারত প্রতি বোতল ফেনসিডিল মাত্র দুই টাকায় বাংলাদেশে বিক্রি করতে শুরু করে। আমাদের যুব সমাজ এ মরণঘাতী নেশার প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকলে ভারত এর মূল্য কেবল বৃদ্ধি করেই ক্ষ্যান্ত হয়নি, বরং বাংলাদেশ ভূখন্ড বরাবর অসংখ্য প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য ফেনসিডিল কারখানা গড়ে তোলে, যাতে অতিদ্রুত ব্যাপকভাবে এ নেশা বাংলাদেশে ছড়িয়ে দেয়া যায় । এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে এক ধরনের সীমান্ত অপরাধ।

এ কারণেই বিডিআর'এ সেনাবাহিনীর দক্ষ কর্মকর্তাদের প্রেষণে নিয়োগ দেয়া শুরু হয়। অভিযোগ রয়েছে যে, ২০০২ সনের আগেকার বিডিআর জোয়ানরা চোরাচালান থেকে অর্জিত অবৈধ অর্থের কারণে বেশ সম্পদশালী ছিল। বিডিআর সিপাহী, নায়েক ও হাবিলদারদের এমন সুরম্য দালান-কোঠা ছিল, যা বাইরের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা কেবল স্বপ্নেই ভাবতে পারত। তাদের এ ধরনের সম্পদ অর্জন দেশের স্বার্থ বিসর্জনের মাধ্যমেই সম্ভব হতো। ২০০২ সালের পর চোরাচালান হতে বিডিআর জোয়ানদের প্রাপ্ত অবৈধ অর্থ আগমন ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে। আটককৃত চোরাচালানের অবৈধ মালামাল হতে অবৈধ প্রাপ্তির সুযোগ ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়। ২০০২ সনের আগের ও পরের আটক চোরাচালানকৃত দ্রব্যাদির পরিসংখ্যানের দিকে তাকালেই এর বাস্তবতা পরিলক্ষিত হয়। সেনা কর্মকর্তা নিধনে মুখোশ পরিহিত বিডিআর জোয়ানদের চাকরির বয়স ৫/১০ বছর হবে, যারা চোরাচালান হতে অবৈধ পয়সা পায়নি। তাদের বয়োজ্যেষ্ঠ বিডিআর জোয়ানরা তাদেরকে প্রায়ই বলত, দেখ আমরা সিপাহী থাকাকালীন ঘরবাড়ী করেছি। কিন্তু তোমরা এখন তা করতে পারছনা। কেননা এখন সেনা কর্মকর্তারা পয়সা বানাচ্ছে এবং তোমাদেরকে তার অংশ দিচ্ছেনা। তরুণ জোয়ানদের ক্ষেপানোর জন্য বিদ্রোহের হোতারা এ ধরনের গল্প ফেঁদেছে। অথচ বিডিআর এ সেনা কর্মকর্তাদের নিয়োগের পর হতে বিএসএফ' এর সাথে প্রতিটি সংঘর্ষে বিডিআর বিজয়ী হয়েছিল। কূটনৈতিক দুর্বলতার কারণে সংবাদ মাধ্যমে কেবলমাত্র বিডিআর'এর পক্ষে হতাহতের খবর প্রচার করা

www.pathagar.com

হয়েছে। যতোদিন সেনা কর্মকর্তারা বিডিআর'এর নেতৃত্বে থাকবে ততোদিন বিএসএফ কোনভাবেই এঁটে উঠবেনা, ততদিন ভারত উম্মুক্ত সীমান্ত পাবে না, যা ভারত ১৯৪৭ থেকেই কামনা করছিল। চোরাচালান, জাল কাগুজে মুদ্রা এবং মাদক ও অস্ত্র প্রেরণ, ভারতীয় সন্ত্রাসী ও 'চর'দের নিরাপদ যাতায়াত, সর্বোপরি, বাংলাদেশকে অরক্ষিত রাখার জন্য উম্মুক্ত সীমান্ত ভারতের ভূ-আর্থিক স্বার্থের জন্য অত্যাবশ্যক। অন্যদিকে বিডিআর নেতৃত্বে সেনা কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে আর্থিক ও মনস্তাত্তিক ক্ষেত্রে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ হলো বিডিআর'এর ডিএডি'রা যাদের সবাই বিডিআর থেকে আসা। তারাও ছিল সুশিক্ষিত, কিন্তু সেনা কর্মকর্তাদের কারণে তারা সুবিধা অর্জনে সক্ষম হয়নি।[১৩] এর মানে দাঁড়ালো ভারত এবং বিডিআর এর অধ:স্তন কর্মকর্তা ও বিডিআর জোয়ানদের সেনা কর্মকর্তা-বিরোধী অভিন্ন স্বার্থ এক বিন্দুতে এসে ঠেকেছে।

বিডিআর'এর সেনা কর্মকর্তাদের নেতৃস্থানীয় অবস্থান ও নিয়ন্ত্রণ, তাদের বেতন কাঠামো ও সুবিধাদি সেনাবাহিনীর জন্য প্রযোজ্য নিয়মানুযায়ী প্রদান করা হয়। অপরদিকে সরাসরি বিডিআর'এ নিযুক্তিপ্রাপ্ত বেসামরিক অবস্থান হতে আসা বিডিআর জোয়ান এবং ডিএডিসহ অধ:স্তন কর্মকর্তারা সাধারণ বেতন কাটামো অনুযায়ী আর্থিক ও অন্যান্য সুবিধা পায়। এই বৈষম্য বিডিআর জোয়ান ও অধ:স্তন বেসারকি অফিসারদেরকে সেনা কর্মকর্তা বিরোধী প্রবণতা গঠনে মারাত্নকভাবে প্ররোচিত করে।[১৪]

দুর্নীতি : বিডিআর'এ সাময়িক সময়ের জন্য আসা সেনা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিডিআর জোয়ানরা দুর্নীতির অভিযোগ তোলে। সংবাদ মাধ্যমে বিডিআর বিদ্রোহে যে সব কারণ তুলে ধরা হয়েছে, তা বাস্তবতার পরিপন্থী এবং অতিরঞ্জিত। সমাজের কুচক্রীমহল বিডিআর এর মতো একটি সুশৃংখল বাহিনীতে এমন পাইকারী গণহত্যার প্রকৃত কারণ নির্ণয়ে দ্বিধান্বিত ও

---

[১৩] আমার দেশ, ঢাকা, ২ মার্চ, ২০০৯।

[১৪] B. Rahaman, Bad Omens from Bangladesh, 27 February, 2009, http/www.southasiaanalysis.org/papers31/paper3072.html) The writer is an additional Secretary (Retd), Cabinet Secretariat. Govt of India, New Delhi, & presently= Director, Institutte For Tropical Studies, Chennai, India, E-maill : Seventyone 2@ gmaill.com

www.pathagar.com

উদাসীন। এই নারকীয় বিয়োগান্তক নাটকের মূল হোতাদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান এবং ভবিষ্যতে যেন এমন মর্মভেদী ঘটনার পুনরাবৃত্তি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে ব্যাপক ভিত্তিক তদন্ত হওয়া অত্যাবশ্যক।[১৫]

এক শ্রেণীর বিডিআর জোয়ান, বিশেষত ডিএডি তৌহিদের মতো বিডিআর এর অসামরিক অধঃস্তন কর্মকর্তাদের ক্ষোভ ও শত্রুতার মূল সূত্র হলো বেসামরিক অফিসার ও জোয়ানরা সেনা কর্মকর্তাদের নিয়োগ প্রাপ্তির কারণে চোরাচালান এবং অন্যান্য অপরাধের মাধ্যমে অবৈধ অর্থ উপার্জনের সুযোগ হতে বঞ্চিত হয়। এই কারণেই বিডিআর জোয়ান এবং তাদের অসামরিক কর্মকর্তাদের মনে সেনা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। কতিপয় তুচ্ছ কারণকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে সামনে এনে মূল কারণকে আড়াল করে এমন নারকীয় হত্যাকান্ড ঘটানো হয়।

ভিনদেশী চক্রান্ত ঃ ইতোমধ্যে এই সত্যতা স্পষ্ট হয়েছে বিডিআর বিদ্রোহ তথা গণহত্যা তথাকথিত দুর্নীতিবাজ ও অত্যাচারী অধিনায়কদের বিরুদ্ধে কতিপয় বিডিআর জোয়ানদের প্রতিশোধ নেয়ার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া নয় বরং ইহা ছিল অত্যন্ত নিপূণভাবে অতি শক্তিধর চক্রান্তকারীদের প্রস্তুতকৃত নীল-নকশার উচ্চমার্গীয় কমান্ডো অভিযান, যার উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল এবং এর প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে এলোমেলো করা। বাংলাদেশ-বিরোধী এই অভিযানের তাৎক্ষণিক লক্ষ্য ছিল এর রাষ্ট্র কাঠামোর বিভিন্ন শাখা বিশেষতঃ সশস্ত্র বাহিনী ও সীমান্ত রক্ষী এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে দ্বিধা, অবিশ্বাস, ভীতি ও ঘৃণা সৃষ্টির বীজ বপন। আর এর দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য হলো বাংলাদেশকে গৃহযুদ্ধ পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেয়া, এর প্রতিরক্ষা শক্তিকে পঙ্গু করা, অথবা আরেক সোমালিয়া কিংবা কঙ্গো তৈরি করা যাতে স্বঘোষিত আন্তর্জাতিক বা আঞ্চলিক আধিপত্যবাদীর সামরিক ও অর্থনৈতিক উপস্থিতি ব্যতীত এদেশ শাসনের অযোগ্য হয়ে যায়।[১৬]

ঢাকার প্রাচীনতম ইংরেজী দৈনিক 'দ্য বাংলাদেশ অবজার্ভার'এর সম্পাদকীয় ২০ মার্চ (২০০৯) মন্তব্যে বলা হয়েছে, অধিকাংশ জনগণের কাছে স্ফটিকের মতো স্পষ্ট যে ইহা (বিডিআর বিদ্রোহজনিত সেনা কর্মকর্তা হত্যা) ছিল

---

[১৫] Sultan M. Hali. BDR Mutiny: An India Conspiracy, Bangladesh Open Source Intelligence Monitors, 27 March, 2009.

[১৬] Dr K.M.A Malik, Bangla Mirror, 6 March, 2009.

www.pathagar.com

সুপরিকল্পিত চক্রান্ত। তবে এটা কি সরকারের বিরুদ্ধে নাকি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে তা নির্ণয় করা দুরূহ। কিন্তু বিদ্রোহের ব্যাপকতা ইঙ্গিত দেয় যে, ইহা সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিতৃষ্ণা, বিরক্তি বা বঞ্চণা, কিংবা বিডিআর জোয়ানদের সেনাবাহিনী-বিরোধী অনুভূতি বা মানসিকতা থেকে সৃষ্টি হয়নি।"

প্রধানমন্ত্রী সুস্পষ্টভাবে দাবী করেছেন, সরকারকে হঠানো এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করার জন্যই বিডিআর বিদ্রোহের ফাঁদ পাতা হয়েছে। যদিও শেখ হাসিনা সরকারকে হঠানোর কোন প্রচেষ্টা বাস্তবে পরিলক্ষিত হয়নি। সেনা প্রধান প্রধানমন্ত্রীর সাথে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়েছেন এবং তার সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করেছেন। এমনকি প্রধানমন্ত্রী সেনাকুঞ্জে বিক্ষুব্ধ সেনা কর্মকর্তাদের তোপের মুখে পড়েও নিরাপদে সেনানিবাস থেকে বেরিয়ে এসেছেন। সুতরাং বিডিআর বিদ্রোহ শেখ হাসিনার সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার চক্রান্ত বিশেষ এমন প্রচারণা বা দাবী নিছক অনুমান-নির্ভর ও সন্দেহ-প্রবণ মানসিকতা হতে সৃষ্ট কিংবা আসল কারণ ঢাকা দেয়ার অজুহাত বিশেষ। বামপন্থী রাজনৈতিক ও কলামিষ্ট হায়দার আকবর খান রণো লিখেছেন, তন্ন তন্ন করে খুঁজে সেনা কর্মকর্তা নিধন, লুণ্ঠন এবং নির্মমতার বর্বরতম নজির স্থাপন কোনভাবেই সামরিক অভ্যুত্থানের বৈশিষ্ট্য বহন করে না। অতি তুচ্ছ দাবীকে সামনে এনে ক্ষুদ্র একটি চক্র তাদের উদ্দেশ্যে হাসিল করেছে এবং নিঃসন্দেহে ইহা ছিল লোমহর্ষক ভয়ঙ্কর চক্রান্তের অংশ বিশেষ। নিঃসন্দেহে ইহা ছিল বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে।[১৭]

পিলখানা হত্যার জন্য দায়ী খোঁড়া যুক্তিকে প্রত্যাখান করে বর্ষিয়ান সাংবাদিক ভাষা সৈনিক অধ্যাপক আব্দুল গফুর লিখেছেন, এই বিয়োগান্তক ঘটনা অভিযোগ-সংক্রান্ত বিরক্তি কিংবা ক্ষোভের বহি:প্রকাশ নয়। ইহা এমনকি বিদ্রোহও নয়। বস্তুত: এটা ছিল বরং বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাপনাকে ধ্বংস করার সুপরিকল্পিত চক্রান্ত বিশেষ। বঞ্চণার কারণে যদি কোন অভিযোগ থাকতই, তবে সেগুলো দূরীকরণে যথাযথ উদ্যোগ নেয়া উচিত ছিল। সে ধরনের উদ্যোগ না নিয়ে তারা কেন আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনীর এতো প্রতিভাবান অফিসারদের হত্যা করল? স্বাধীন সার্বভৌম দেশের প্রতিরক্ষা শক্তিকে ধ্বংস করাই ছিল এর লক্ষ্য। বাংলাদেশের সমৃদ্ধি ও

[১৭] হায়দার আকবর খান রণো, উপ-সম্পাদকীয় আমার দেশ, ঢাকা, ১০ মার্চ, ২০০৯।

www.pathagar.com

কল্যাণে বিশ্বাস করে এমন কারো পক্ষে এমন ধ্বংসাত্মক অপকর্ম সম্পন্ন করা সম্ভব নয়।[১৮]

অধ্যাপক আবদুল গফুর বিভিন্ন নেতৃবৃন্দকে উদ্ধৃত করে অভিযোগ করেন, এই ঘটনার পেছনে বিদেশী শক্তি সক্রিয় ছিল। সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ বলেছেন, পিলখানা হত্যাকান্ডের পেছনে আন্তর্জাতিক চক্রান্ত জড়িত ছিল। সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া এই হত্যাকান্ডের পেছনে বাংলাদেশ বিরোধী চক্রের উস্কানী সক্রিয় ছিল কিনা তা তদন্ত করার পরামর্শ দিয়েছেন। আওয়ামী লীগের মুখপাত্র এবং স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়নমন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম জানিয়েছেন সংগৃহীত প্রাথমিক তথ্য প্রমাণাদিতে প্রতীয়মান হয় যে, এর পেছনে বিদেশী শক্তি সক্রিয় ছিল।

বিদ্রোহের ব্যাপকতা : বিডিআর বিদ্রোহ কেবলমাত্র পিলখানাস্থ বিডিআর সদর দফতরে সীমিত ছিল না। বরং এটা বিডিআর'এর কমপক্ষে ৩২টি ইউনিট, ব্যাটালিয়ন ও সেক্টর হেডকোয়ার্টারে ছড়িয়ে পড়ে। খুলনা সেক্টরের বিডিআর জোয়ানরা খুলনা-যশোর মহাসড়ক অবরোধ করে এবং যানবাহনে আগুন ধরিয়ে দেয়। রাজশাহীস্থ বিডিআর সদর দফতরে সারাদিন গোলাগুলি চলে। খাগড়াছড়ি বিডিআর সেক্টর সদর দফতরে গুলিবর্ষণ করা হয়। ফেনীতে অবস্থিত বিডিআর ব্যাটালিয়নে গুলি বর্ষণ হয়। ঐ ব্যাটালিয়নের জোয়ানরা ফেনী-মাইজদী সড়কে অবরোধ তৈরী করে। জয়লস্করে (ফেনী-মাইজদী সড়কে) গুলি বিনিময় হয়। দিনাজপুরের ফুলবাড়ি ও কবিবাড়ি হাটে, সিলেটের সুনামগঞ্জে, চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায়, দিনাজপুরের আমবাড়ীতে, জয়পুরহাটে শমসের নগরে, লালমনির হাটে, নওগাঁওতে, নেত্রকোণায়, সিলেট শহরে, যশোরে, কক্সবাজারে, হিলি ও ঠাকুরগাঁওয়ে, ফটিকছড়িতে, টেকনাফে সড়ক অবরোধ করা হয়। কুষ্টিয়া ও ভেড়ামারার মিরপুরে রেল চলাচল বিঘ্নিত হয়।*

---

[১৮] অধ্যাপক আবদুল গফুর, দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা, ১৯ মার্চ, ২০০৯।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ছদ্মবেশী খুনী

তিনটি তদন্ত কমিটির মধ্যে যদিও দু'টি তাদের প্রতিবেদন স্ব-স্ব কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিলেও বাংলাদেশের জনগণ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় পিলখানায় সেনাকর্মকর্তা হত্যাকারী কিংবা তাদের পৃষ্ঠপোষকদের প্রকৃত পরিচয় এবং জাতীয়তা সম্পর্কে কিছুই জানতে পারেনি। মুখোশ-পরিহিত খুনীদের নির্মম হত্যাকান্ডের ধরন এবং বিডিআর সদর দফতর হতে অজানা গন্তব্যের উদ্দেশ্যে তাদের নিরাপদ পলায়ন প্রমাণ করে তারা উচ্চতর প্রশিক্ষিত, বেপরোয়া ও উদ্বুদ্ধকৃত বিদেশী নাগরিক, যাদেরকে সেনা কর্মকর্তাদের হত্যা করার জন্যই প্রেরণ করা হয়েছিল। সামরিক বিশেষজ্ঞরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, সেনা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিডিআর জোয়ানদের বিরুক্তি ও অভিযোগ সত্ত্বেও তারা তাদের উর্ধতন কর্মকর্তাদের প্রতি এমন নির্মম ও উম্মাদ হতে পারেনা, যাদের অধীনে তারা দীর্ঘদিন যাবত কর্মরত ছিল। ক্ষোভ বশতঃ তারা দুই-তিন জনকে হত্যা করতে পারে, কিন্তু কিছুতেই ৫৭ জনকে নয়, যাদের অধিকাংশই সম্পূর্ণ নিরাপরাধ এবং যারা বিডিআর জোয়ানদের দাবী পূরণে যথাযথ কর্তৃপক্ষ নয়। সুতরাং সেনা কর্মকর্তাদের হত্যার জন্য যুক্তিসম্মত কারণ কিংবা ক্ষোভ তাদের থাকার কথা নয়। বিশ্লেষকরা নিশ্চিত যে, এটা এমন কোন সামরিক অভ্যুত্থান নয় যে, সব সেনা কর্মকর্তাদের হত্যা করলেও তারা পরবর্তী সরকার গঠন করতে পারত। তাদেরকে ভাবতে হয়েছে এই হত্যাকাণ্ড তাদের জন্য কি পরিণতি বয়ে আনবে। সর্বোপরি, পিলখানায় উপস্থিত ১৩৩ জন সেনা কর্মকর্তাদের যদি সবাইকে হত্যা করতে পারত তারপরেও তাদেরকে তাদের অমার্জনীয় অপকর্মের চরম প্রতিফলের ব্যাপারে ভীত সন্ত্রস্ত থাকার কথা। এসব বাস্তবতা একটি সত্যকেই উন্মোচিত করে যে, কোন বাংলাদেশী নাগরিকের পক্ষে তাদের স্ব-স্ব জীবনকে ঝুঁকিতে ফেলে এবং পরিবার পরিজনের ভবিষ্যতকে অনিশ্চয়তায় নিক্ষেপ করে এই নির্মম গণহত্যা চালানো সম্ভব নয়। বাস্তবতা ও মানব মনস্তত্ত্বের গভীর বিশ্লেষণ আমাদেরকে বলে দেয় যে, এমন অকল্পনীয় হত্যাকাণ্ড কেবলমাত্র তাদের দ্বারাই সম্ভব যারা কেবল ভিনদেশীই নয়, বরং তারা নিশ্চিত ছিল যে তাদের কিছুই হবেনা এবং তারা সুনিশ্চিতভাবে সুরক্ষিত থাকবে এবং অভিযানের পর তাদের নিরাপদ পলায়নের শতভাগ নিশ্চয়তা থাকবে।

www.pathagar.com

তদুপরি গ্রেফতারকৃত প্রায় সব আসামীই জিজ্ঞেসাবাদের সময় স্বীকার করেছে যে তাদের উর্ধ্বতন অধিনায়কদের হত্যা করার কোন পরিকল্পনা তাদের ছিল না। তাদেরকে পণবন্দী করে দাবী আদায় করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্যে। তা হলে এসব হত্যাকারী কারা? এতে প্রমাণিত হয় যে, গণহত্যার মূল অনুঘটকরা তাদের চক্রান্ত বাস্তবায়নে বিডিআর জোয়ানদের ক্ষোভ ও দাবীকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে। সরকারীভাবে অঘোষিত চক্রান্তকারীরা তাদের চরদের বিডিআর এ অনুপ্রবেশ করিয়েছে, খুনিদের বিডিআর সদর দফতরে অবাধে প্রবেশের ব্যবস্থা করেছে এবং সেখানে থেকে নিরাপদ পালিয়ে যাবার নিশ্চয়তা দিয়েছে। তারাই বিডিআর'এর মহাপরিচালক এবং তার সহকর্মী সেনা কর্মকর্তাদের পণবন্দী না করে তাদেরকে হত্যা করার নীল-নকশা বাস্তবায়নে পরিস্থিতি সৃষ্টি ও তা নিয়ন্ত্রণ করেছিল।

বিডিআর সদর দফতরে খুন হবার সম্ভবনা থেকে রক্ষা পাওয়া জনৈক সেনা কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ১২-১৪ জনের একদল তরুণ হত্যা অভিযান শুরু করে, যারা অস্ত্রভর্তি বিডিআর এর একটি পিক্আপে চড়ে পিলখানার দরবার হলে এসেছিল।[১]

জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীকে উদ্ধৃত করে প্রিন্ট মিডিয়া জানায়, মেজর জেনারেল শাকিল আহমেদ দরবার হলে বক্তব্য রাখার প্রস্তুতিকালে ছাই রংয়ের একটি অজ্ঞাত ভ্যান কিছু অস্ত্র সমেত বিডিআর হেডকোয়ার্টারে প্রবেশ করে। এক পর্যায়ে ভ্যানটি দরবার হলের দশ গজের মধ্যে অবস্থান নেয়। একটি সুত্র জানিয়েছে, ঐ ভ্যানে ১৫ থেকে ২০টি সীলকৃত বাক্স ছিল। পিলখানার 'আলবেরুনী' নামক দালান ঘরে আত্নগোপন করে বেঁচে যাওয়া জনৈক সেনা কর্মকর্তা জানিয়েছেন, 'বিডিআর'এর এ ধরনের কোন গাড়ী নেই।[২]

অন্যদিকে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বাধীন তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয় ভ্যানটি বিডিআর'এর অন্য একটি প্রকল্পের। কিন্তু বিশ্লেষকরা মনে করেন, যেহেতু সেনা নেতৃত্বাধীন তদন্ত দলটিও স্বাধীনভাবে তদন্ত চালাতে এবং প্রতিবেদন তৈরী করতে পারেনি, প্রতিবেদনে ছাঁই রংয়ের ভ্যানের উপস্থিতি অস্বীকার না করলেও কৌশলে একে বিডিআর'এর একটি প্রকল্পের গাড়ী হিসেবে দেখানো

[১] Dr K. M. A Malik, Bangla Mirror, 6 March, 2009.

[২] সাপ্তাহিক, ঢাকা, ৫ মার্চ, ২০০৯।

www.pathagar.com

হয়। কিন্তু ভ্যানের বহনকৃত সীলকৃত বাক্স সম্পর্কে প্রতিবেদনে কোন মন্তব্য করা হয়নি।

'সাপ্তাহিক' নামক একই সাময়িকীতে উল্লেখ করা হয় যে, ২৫ ফেব্রুয়ারী রাতে সাদা রংয়ের একটি এ্যাম্বুলেন্স বারংবার বিডিআর এর সদর দফতরে প্রবেশ করেছিল। মনে করা হয় যে, তাদের নির্মম অভিযান পরিচালনার জন্য বহিরাগতদের বিডিআর সদরদফতরে আনা-নেয়ার কাজে ঐ গাড়ীটি ব্যবহার করা হয়।

বেঁচে যাওয়া সাক্ষীরা জানিয়েছেন বেসামরিক পোশাক পরিহিত তথাকথিত সৈনিকরাই দরবার হলে প্রথম গুলিবর্ষণ শুরু করে যেখানে অধিকাংশ সেনা কর্মকর্তারা নিহত হয়েছিলেন। বেঁচে যাওয়া কর্মকর্তারা আরো জানিয়েছেন যে, দরবার হলের বাইরে সেনা কর্মকর্তাদেরকে খুঁজে খুঁজে হত্যা করা হয়ছে। হত্যাকারীরা বেসামরিক পোশাক পরিহিত ছিল। গণহত্যা চলাকালীন প্রতিবেদকের সাথে কথা বলার সময় টিভি পর্দায় যেসব জওয়ানের চেহারা দেখা যায়, তারা সম্ভবতঃ ছিল পদাতিক সৈনিক। সাধারণ জওয়ানরা জানতোই না কি ঘটতে যাচ্ছে। তারা প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করার দাবী করেনি এবং তারা আত্মসমর্পণের ব্যাপারে কথা বলছিল। এই নির্মম হত্যাকান্ডের মূল হোতাদের শিখিয়ে দেয়া বুলিই সাধারণ জোয়ানরা পুনরাবৃত্তি করছিল। হত্যাকান্ড শুরু হবার সময় পিলখানায় ১৫ হাজারের কাছাকাছি জোয়ান উপস্থিত ছিল। কিন্তু আত্মসমর্পণকৃত এবং ব্যারাকে ফেরত আসা জওয়ানদের সংখ্যা ছিল মাত্র তিন হাজারের মতো। ৯৮ শতাংশের বেশী বিডিআর জোয়ান পালিয়ে গিয়েছে। যে কেউই মূল রহস্যটি অনুধাবন করতে পারেন। এটা অনুধাবনের জন্য রকেট উদ্ভাবনকারী বৈজ্ঞানিকের মতো অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন নেই। কোন মহল থেকে কোন তথ্য পায়নি এমন সাধারণ জওয়ানরাই তাদের অস্ত্র সমর্পণ করেছে। মূল হত্যাকারীরা দেশ ত্যাগ করার জন্য যথেষ্ট সময় পেয়েছিল। যদি কোন দিন আমরা এই চক্রান্তের পর্দা উন্মোচন করতে পারি, তবে দেখতে পাব যে সেনা কর্মকর্তাদের

www.pathagar.com

হত্যার চক্রান্তকারী বিডিআর জোয়ানরা নয়, তারা ভিনদেশী কোন সেনাবাহিনীর বা বিদেশী কোন বিশেষ বাহিনীর সদস্য।[৩]

আমার মনে হয় জোয়ানদের দিয়ে সাধারণ বিদ্রোহ শুরু করার পর এর কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব হত্যাকারীদের হাতে চলে যায় এবং তারাই হত্যাকান্ড ঘটায়, যা সাধারণ সৈন্যরা রুখতে পারেনি। প্রশ্ন উঠেছে কেন প্রধানমন্ত্রীর সরকারী বাসভবনে যাওয়া ব্যক্তিদের পরিচিত, নাম, পদবী লিপিবদ্ধ করা হয়নি? তাদের সবাই কি বিডিআর এর সদস্য নাকি বিডিআর এর পোশাকের আবরণে বহিরাগত, যাদেরকে হত্যাকান্ড চালানোর অভিযানে প্রেরণ করা হয়েছিল? প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য তার সাথে সাক্ষাৎ করার আগে কেন সদস্যদের যথাযথভাবে তল্লাশী করে তাদের পরিচিত রেকর্ড করা হয়নি? তারা কেন এত বিশ্বযোগ্য ছিল? ভিনদেশী হত্যাকারীদের জড়িত থাকার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যদি বিডিআর সদর দফতর থেকে অন্যান্যদের সাথে বেরিয়ে আসা দুই জন অজ্ঞাত বিদেশী নাগরিকের ব্যাপারে কেউ চিন্তা-ভাবনা করেন। এ দুইজন তরুণ-তরুণী। অন্যান্য পরিবারের সদস্যদের মতো এরাও পিলখানার ভেতরে ছিল। বিদেশী তরুণ স্বতস্ফূর্তভাবে অনর্গল বাংলায় কথা বলেছে। তার ল্যাগেজের সাথে বাধা ট্যাগ দেখে যখনই জনৈক সাংবাদিক তার পরিচিত জানতে চায় সম্ভবত: তার জাতীয় পরিচয় গোপন রাখার উদ্দেশ্যে সাথে সাথে সে ট্যাগটি ছিঁড়ে ফেলে।[৪] অজ্ঞাত এ ভিনদেশীর এমন আচরণ কি সন্দেহজনক কিছুর ইঙ্গিত করেনা? বিডিআর সদর দফতর থেকে বের হয়ে তারা কোথায় গিয়েছিল? তারা এখন কোন দেশে অবস্থান করছে? বাংলাভাষী ঐ যুবক কোন দেশের নাগরিক? আর তার সঙ্গী ভিনদেশী যুবতীই বা কোন দেশের? বিডিআর সদর দফতরে তারা ঐ সময়ে কেন এবং কোথায় অবস্থান করেছিল? এসব প্রশ্নের উত্তর জানতে সরকার চেষ্টা করেনি। চেষ্টা করলে হয়তো এই হত্যাকান্ডের পুরো রহস্যই উদ্ঘাটিত হতো।

প্রশ্ন উঠেছে পিলখানার ভিতরে যারা ছিল, তাদের সবাই কি বাস্তবে বিডিআর জোয়ান, নাকি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বহিরাগত, যাদেরকে স্বার্থান্বেষী চক্রান্তকারীরা

---

[৩] Yasmin Bhiyan, 2 March, 2009 http// www amardeshbd.com/ dailynews/detail_news_index.php?NewsType=bistarit&SectionID=home&NewsID=214002)

[৪] সাপ্তাহিক, ঢাকা, ৫ মার্চ, ২০০৯।

www.pathagar.com

বিডিআর জোয়ানদের পোশাকের আবরণে হত্যাকান্ড চালানোর জন্য পাঠিয়েছিল। সেনা কর্মকর্তাদের নির্মমভাবে হত্যা, তাদের চোখ উপড়ে ফেলা, তাদের মৃতদেহের অবমাননা করা, লাশের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলা, লাশগুলো গণকবরে পুঁতে ফেলা, কিংবা পুড়ে ফেলা কিংবা স্যুয়েরেজের ভেতরে ফেলে দেয়া, তাদের স্ত্রী-কন্যাদের ধর্ষণ করা, মূল্যবান দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করা কোনভাবেই বিডিআর জোয়ানতো দূরের কথা বাংলাদেশী কারোর পক্ষেই সম্ভব নয়। তারা এতো বেশী সেনা কর্মকর্তাকে হত্যা করতে পারে না। কেননা সেনা কর্মকর্তারা তাদের এমন শত্রু ছিলেন না যে, তাদেরকে গণহারে হত্যা করে অবমাননাকর আচরণ করবে। এতে প্রমাণিত হয় হত্যাকারীরা বাংলাদেশী কোন সুশৃঙ্খল বাহিনীর সদস্য নয়, বরং তারা ছিল বহিরাগত মনুষ্যত্ব লোপ পাওয়া উদ্দেশ্যমূলকভাবে লেলিয়ে দেয়া খুনি। এরা হয়তো বিডিআর'এর কিছু ভিন্ন মতাবলম্বীদের সাথে মিশে গিয়েছে, হয়তো বিডিআর সদস্যরা এদেরকে চিনতে পারেনি যে এরা বহিরাগত।[৫]

সাধারণ প্রতিবাদ বা বিদ্রোহের নামে এমন নারকীয় হত্যাকান্ড ঘটানো হবে, অধিকাংশ বিডিআর সদস্যই হয়তো তা জানত না। বিডিআর এর পোশাক পরিহিত কিছু অজ্ঞাত অপরিচিত মুখোশপরা বরিহরাগতদের ছবি বিভিন্ন সংবাদপত্রে এসেছে। অভিযোগ উঠেছে যে, এসব বহিরাগতরাই হত্যা অভিযানে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। কোন কোন মহল এমন দাবীও করেছেন যে, বহিরাগতরাই বিদ্রোহ ও হত্যা অভিযানে নেতৃত্বে দিয়েছে। তারা নিরস্ত্র সেনা কর্মকর্তাদের হত্যা করে ময়লা-ভর্তি নালায় ও স্যুয়েরেজে ফেলে দেয়। তাদের অনেককেই গণকবরে পুঁতে ফেলা হয়। তাদের লাশ পুড়ে ফেলা হয়। তাদের দেহ বুলেট ও বেয়োনেট দিয়ে বিকৃত করা হয়। কোন কোন কর্মকর্তার চোখ উপড়ে ফেলা হয়। মানব-চেহারা বিশিষ্ট এসব পশুরা সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের লাশের ওপরে আনন্দ উল্লাসে নাচতে থাকে। প্রশ্ন উঠেছে এসব খুনীরা কি বাংলাদেশী না বহিরাগত যারা বিডিআর বিদ্রোহের আবরণে সেনা কর্মকর্তাদের হত্যার এজেন্ডা নিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। সৌভাগ্যবশতঃ ৭৬ জন সেনা কর্মকর্তা খুন হবার বিপদ

---

[৫]Mohammad Ataul Hoque, BDR carnage,http//www.thefinancialexpress-bd.com/2009/03/04/06318.html.

www.pathagar.com

থেকে বেঁচে যান। কারণ খুনীরা ঐসব কর্মকর্তাদের চিনতে পারেনি, কেননা তারা তাদের পোশাক খুলে ফেলেছিলেন। তাদের কেউ কেউ শোচাগারে কিংবা খাটের নীচে লুকিয়ে আত্মরক্ষা করেন। অন্যান্যরা বিডিআর জোয়ানদের আন্তরিক সহযোগিতা পান, যারা সেনা কর্মকর্তাদের পরিচয় খুনীদের কাছে প্রকাশ করেনি। মৃত্যুর গুহা থেকে ফিরে আসা অধিকাংশ সেনা কর্মকর্তা পরে জানিয়েছেন যে, বিদ্রোহীদের মধ্যে এমন ভাল ও দ্বিধান্বিত জওয়ান ছিল যারা তাদের এবং পরিবারের সদস্যদের জীবন রক্ষা করেছে।[৬]

অভিযোগ রয়েছে যে, বেশ কিছু (অনেকের মতে ১২ জন) ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার প্রশিক্ষিত ঘাতক বিডিআর জোয়ানদের পোশাক পরে এই নির্মম হত্যাকান্ড সম্পন্ন করে বিডিআর সদর দফতরের ৫নং গেট দিয়ে বিনা বাধায় পালিয়ে যায়। তথ্যাভিজ্ঞমহল জানিয়েছেন, বিডিআর জোয়ানরা কখনও তাদের বস্দের প্রতি এমন নির্দয় ও নির্মম হতে পারে না। তাৎক্ষণিক ক্ষোভে তারা কিছুতেই এতো বিপুল সংখ্যক সেনা কর্মকর্তাদের হত্যা করতে পারে না। তাদের মনস্তত্ব কোনভাবেই তাদেরকে এমন জঘন্য অপরাধে প্ররোচিত করতে পারে না। কেবলমাত্র ভিনদেশী কসাইদের পক্ষেই এমন বর্বর ও হৃদয়হীন হওয়া সম্ভব, যারা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ওপর যেন তাদের দীর্ঘদিনের প্রতিশোধ নিয়েছে।

সেনাবাহিনীর জনৈক উর্ধতন কর্মকর্তা অভিযোগ করেছেন যে, বিডিআর বিদ্রোহের ভিডিও ফুটেজে বহিরাগতদের বিডিআর'এর পোশাক পরিধান করতে দেখা গেছে। পিলখানা হত্যাকান্ডের পরপরই নিয়োগপ্রাপ্ত বিডিআর'এর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম ঢাকার ইংরেজী দৈনিক 'ডেইলী স্টার'এর সাথে আলাপকালে অজ্ঞাত লোকদের প্রসঙ্গে বলেছেন, এরা বিডিআর' এর সাথে সম্পৃক্ত নয়। এই বক্তব্য সরকারের এই অভিযোগকে আরো পাকা-পোক্ত করেছে যে, ইহা ছিল বাইরের চক্রান্ত।[৭]

কোন কোন ঘাতকের প্রতি ইঙ্গিত করে বিডিআর'এর সাবেক মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আনোয়ার হোসেন ঢাকার দৈনিক ইত্তেফাক'এর সাথে এক

---

[৬] Forum– A monthly Publication of 'The Daily Star', Dhaka, April issue, 2009.

[৭] Outsiders in uniform behind BDR Mutiny, The Daily Star, Dhaka, 5 March2009 http//timesofindia.indatimes.com/India/Outsider_in_uniforum_behind_BDR_mutiny/articleshow/4225675.ems.

www.pathagar.com

সাক্ষাতকারে বলেছেন, মুখোশ পরিহিতরা কোন ভাবেই বিডিআর এর জওয়ান হতে পারে না। তারা বিদেশ থেকে এসেছে। তারাই ছিল মূল ঘাতক।[৮]

এটা নিঃসন্দেহে প্রশ্নের উদ্রেক করে যে, ২৮ ফেব্রুয়ারী (২০০৯) লালবাগ থানায় রুজুকৃত মামলায় প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে গমনকারী ১৪ জনের সবাইকে কেন আসামীর তালিকাভূক্ত করা হয়নি। লালবাগ থানার ওসি নবজিৎ খীসা ১৪ জনের মধ্যে মাত্র পাঁচজনকে আসামী করে মামালা দায়ের করেন। প্রশ্ন উঠেছে বাকী নয়জন কি ভারতীয় নাগরিক নাকি স্থানীয় 'চর' যাদেরকে আসামী হিসেবে দেখানো হয়নি। অভিযোগ উঠেছে যে, সরকার উদ্দেশ্যেমূলকভাবে তাদের নাম অজ্ঞাত রেখেছে। সংবাদপত্রে এমন খবর এসেছে যে, ভারত হতে বারজন ব্ল্যাক ক্যাট কমান্ডো হত্যা অভিযানে অংশ নেয়ার জন্য এসেছিল। বহির্গমন ছাড়পত্র ছাড়ই এরা সরাসরি জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের রানওয়েতে চলে যায়।[৯]

ভারতীয় কমান্ডোদের বহির্গমন সুনিশ্চিত করার জন্য একটি এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট চারঘন্টা বিলম্বিত করা হয়। অন্যদিকে একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রমতে বারজন ভারতীয় কুমিল্লা সীমান্ত দিয়ে ভারতে পালিয়ে যায়।*

[৮] দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ৩ মার্চ, ২০০৯।

[৯] দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা, ১৬ মার্চ ২০০৯।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

হত্যাকান্ড কিভাবে বাস্তবায়িত হয়

পর্যবেক্ষক ও বিশ্লেষকরা বিশ্বাস করেন যে, বিডিআর'এর সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষে এঁটে উঠতে না পেরে ভারতীয় নীতি-নির্ধারকরা বিডিআর ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে নির্মূল করার নোংরা পন্থা বেছে নিয়েছে। ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারীর বিপর্যয় সে নীতিরই অংশ বিশেষ। এই উদ্দেশ্যে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' একটি দীর্ঘ মেয়াদী নীল-নকশা তৈরি করে বিডিআর'এর গোয়েন্দা শাখা 'রাইফেলস সিকিউরিটি ইউনিট'এর অধিকাংশ মাঠকর্মীকে হাত করেছে। ভারতীয় খুনীরা সতর্কতা ও সাবধানতার সাথে বিডিআর এ অনুপ্রবেশ করে। 'র' এর পরিকল্পনা মোতাবেক 'ব্ল্যাকক্যাট' কমান্ডোদের ভারত থেকে আনা হয় যারা বিপথগামী বিডিআর জোয়ানদের সাথে মিশে গিয়ে সেনা কর্মকর্তাদের হত্যা করেছে।

চুলছেঁড়া বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, আমাদের শত্রুরা আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেঙ্গে বিডিআর জোয়ানদের ভেতর অনুপ্রবেশ করে। পিলখানা বিপর্যয় বাহ্যতঃ আকস্মিক হলেও সুনিপূর্নভাবে ঘটানো হয়। লাশ গুম করার প্রক্রিয়া এবং খুনীদের নিরাপদে পলায়ন প্রমাণ করে যে, ইহা ছিল অতীব সুপরিকল্পিত চক্রান্ত। সমগ্র অভিযান এতো দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করা হয় যে, একে কোনভাবেই কেবলমাত্র বিদ্রোহ বলা যায় না। সেনাবাহিনী থেকে প্রেষণে নিযুক্ত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিডিআর জোয়ানদের ঘৃণা ও শত্রুতা সৃষ্টি ছিল দীর্ঘ দিনের নীল-নকশা। আমাদের শত্রুরা বিডিআর জোয়ানদেরকে তাদের কমান্ডিং অফিসারদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার জন্য উস্কানি দিয়েছিল, যাতে বাংলাদেশের জনগণ এবং এর বিভিন্ন সংস্থা দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে একে অপরকে হত্যা করতে উদ্যত হয়।

'ট্রাস্কফোর্স'এ জিজ্ঞাসাবাদের সময় গ্রেফতারকৃতরা, বিশেষতঃ ডিএডি তৌহিদ এবং রহিম তাদের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে উল্লেখ করেছে যে, প্রভাবশালী মহলের (প্রভাবশালী বলতে ভারতকে বুঝানো হয়েছে) সদস্যরা ফেব্রুয়ারী ২২ থেকে বিডিআর সদর দফতরে প্রবেশ করেছে এবং তিন থেকে চার দিনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বহিরাগত সদর দফতরে অবস্থান নেয়। গণহত্যা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা বিডিআর সদর দফতরের ভিতরে অবস্থান করছিল। এ খবরটি ঢাকার অধিকাংশ দৈনিকে ৯ মার্চ প্রকাশিত হয়।

www.pathagar.com

সাবেক সেনাবাহিনী প্রধান লে. জেনারেল হারুন-অর-রশীদ একটি দৈনিক পত্রিকার সাথে আলাপকালে বলেছেন, ২৫ ফেব্রুয়ারীতে বিডিআর জোয়ানরা স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে অধিক অস্ত্র বহন করেছিল। এতে প্রতীয়মান হয় যে, পিলখানার দুঃখজনক ঘটনা পূর্ব-পরিকল্পিত।[১]

ঢাকার বিভিন্ন দৈনিক জানিয়েছে, ২৫ মার্চ রাতে বিডিআর সদর দফতর এবং সন্নিহিত এলাকায় বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটানো হয়। সেনাবাহিনীর নেতৃত্বাধীন তদন্ত কমিটি বিদ্যুত বিভ্রাটের সত্যতা স্বীকার করে। বিদ্যুৎ বিভ্রাটের এবং আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে পিলখানার চতুর্দিক হতে প্রত্যাহার করার উদ্দেশ্যে ছিল বিডিআর সদর দফতর হতে লুণ্ঠিত হালকা অস্ত্র, অর্থ, স্বর্ণালঙ্কার ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রীসহ খুনী ও বিদ্রোহীদের পালিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে দেয়া।

হত্যাকান্ডের দ্বিতীয় দিনে পিলখানার বাহির থেকে ডিএডি তৌহিদের কাছে বিডিআর জোয়ানদের সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদানের জন্য বাংলালিঙ্কের ০১৯১-৩১৩-২৯০৪ নম্বর সেলফোনে থেকে কয়েকটি. এসএমএস পাঠানো হয়। ২৬ ফেব্রুয়ারী দুপুর ১২টা ১৮ মিনিটের দিকে একই নম্বর থেকে নিম্নোক্ত বার্তা প্রেরণ করা হয়: বিডিআর নওজোয়ানদের সহযোগিতা ও সমর্থন করুন। তারা আমাদের সীমান্ত রক্ষা করছে। সেনাবাহিনী কেবলমাত্র সরকারী ক্ষমতা দখল করতে পারে। সেনাবাহিনীর চেয়ে বিডিআর'এর অবদান অনেক বেশী। এই এসএমএস অন্যদের কাছে পাঠান।[২]

এই বার্তার ভাষা প্রমাণ করে, কোন নগন্য বিডিআর জোয়ান কিংবা সাধারণ লোক এই বার্তা প্রেরণ করেনি। বরং এমন কোন ব্যক্তি পাঠিয়েছেন, যিনি ভাল ইংরেজী জানেন।

ঢাকার জনৈক প্রখ্যাত সাংবাদিক ও বিশ্লেষক বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে পিলখানা হত্যাকান্ডের পরিকল্পনা, প্রস্তুতি ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত ১১টি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। এগুলো হলো:

১. তদন্তকারীদের সূত্র উল্লেখ করে পত্রিকান্তরে প্রকাশিত একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, গত ১১ জানুয়ারীর মধ্যে ২৫ জন বিদেশী কমান্ডো

[১] দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ১ মার্চ, ২০০৯।

[২] দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা, ৪ মার্চ, ২০০৯।

www.pathagar.com

বিভিন্ন সীমান্ত পয়েন্ট দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। ঢাকায় তাদেরকে যারা অভ্যর্থনা জানায় এবং আশ্রয় দেয় তারা কূটনীতিকের কাভারে কাজ করেছেন।

২. একই সাথে স্থানীয় বিডিআর হতে ১০-১২ জনের একটি ছোট গ্রুপকে রিক্রুট করা হয়, এদের মধ্যে ছিলেন ২জন ডিএডি। এই ১০/১২ জনের দায়িত্ব ছিল ঐ বিদেশী কমান্ডোদের গুপ্তচরের সমন্বয়ক হিসেবে কাজ করা। তিনজন রাজনৈতিক নেতার মাধ্যমে এই ছোট গ্রুপটি কাজ করে এবং হত্যাকান্ডের পূর্ব পর্যন্ত যাবতীয় খবরাখবর সংগ্রহ করে।

৩. অপারেশন চালানোর দিনক্ষণও নির্বাচন করা হয় অনেক ভেবে চিন্তে। তাদের টার্গেট ছিল বিডিআরের সমস্ত সিনিয়র অফিসারদের একসাথে পাওয়া; এসব অফিসার বার্ষিক বিডিআর দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকায় এসেছিলেন।

৪. ষড়যন্ত্রকারীরা প্রথমে অপারেশনের তারিখ ঠিক করে ২৪ ফেব্রুয়ারী। সেদিন বিডিআর দিবসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার Salute নেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সেদিন অপারেশন করতে গেলে সামরিক অফিসারদের মাঝে বেসামরিক অফিসারদের মারা যাওয়া বা Collateral damage এর চিন্তা করে তার ঝুঁকি নেওয়া হয়নি।

৫. ২৪ তারিখে আনুমানিক রাত ১০.৩০ টায় ঢাকার উপকণ্ঠে একটি বাসভবনে বৈঠক হয়। ঐ বৈঠকে বিদেশ থেকে আসা কিলার গ্রুপ, বিডিআরের ঐ ১০-১২ জন এবং দেশের তিনজন তরুণ রাজনীতিবিদ যোগ দেন। ঐ বৈঠকেই পরের দিনের অপারেশনের দিন-ক্ষণ ঠিক হয় এবং তাদেরকে ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ করা হয়। কখন কোন গ্রুপ কোথায় কিভাবে অপারেশন করবে তাও ঠিক করে দেয়া হয়।

৬. ঐ সিদ্ধান্ত মোতাবেক অন্যতম ডিএডি ৪নং গেটে কোন্ কোন্ সেন্ট্রি সকাল থেকে ডিউটিতে থাকবে সেই দায়িত্ব বন্টন করে। বলা বাহুল্য ঐ সব সেন্ট্রিকেই ডিউটিতে বসানো হয় যারা তাদের খাস লোক।

www.pathagar.com

৭. পূর্ব-পরিকল্পনা মত সকাল ৮.১০ মিনিটে বিডিআরের একটি বেডফোর্ড ট্রাকে ৪নং গেট দিয়ে বিদেশী কমান্ডোরা পিলখানা কম্পাউন্ডে প্রবেশ করে। তাদেরকে বহন করার জন্য এক ঘন্টা আগে বেডফোর্ড গাড়ী পাঠানো হয়। ঐ সব গাড়ীর ব্যবস্থা করেছিল ডিএডিরা। কমান্ডোর পরনে ছিল Sports gear। এর কারণ ছিল যাতে অপারেশন শেষ করে যাবার সময় যেন তারা মুহুর্তের মধ্যেই পোষাক পরিবর্তন করতে পারে।

৮. বেডফোর্ড গাড়ীর পেছনে ছিল ছাই রং এর একটি পিকআপ ভ্যান, ভ্যানে ছিল বাইরে থেকে আনা অস্ত্র ও গোলাবারুদ। অপারেশন শুরু করার জন্য একজন বাংলাদেশী কমান্ডোকে দরবার হলে প্রবেশের নির্দেশ দেয়া হয়। তার উপর দায়িত্ব ছিল অপ্রয়োজনে অপ্রাসঙ্গিকভাবে দরবারের সভাপতি ও ডিজি জেনারেল শাকিলের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া। উদ্দেশ্য ছিল বেয়াদবী করে ডিজিকে উত্তেজিত করা।

৯. পরিকল্পনা মত ডিজিকে গুলি করার পর উপস্থিত অন্যান্য অফিসার এই ঘাতককে জাপটে ধরেন। মুহুর্তের মধ্যেই কিলারের একশান গ্রুপ দরবার হলে ঢুকে পড়ে এবং নির্বিচারে গুলি করতে থাকে। ঘাতকদের যে গ্রুপটি কাভার করছিল তারা মুহুর্তের মধ্যেই সমগ্র দরবার হল ঘিরে ফেলে।

১০. এর পর শুরু হয় কিলিং মিশনের দ্বিতীয় পর্বের বাস্তবায়ন। এই পর্বে উদ্যত সঙ্গীনের মুখে অন্যান্য ট্রুপকে ঘাতকের সাথে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়। একটি গ্রুপ অস্ত্রের মুখে মালখানা লুট করে। এর পর তারা অফিসারদের বাসভবন, তাদের পরিবার বর্গের অবস্থান এবং অতীব গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত দলিল পত্র কোথায় আছে তার খোঁজ-খবর নেয়। এসব দলিল পত্রের মধ্যে ছিল সীমান্ত নিরাপত্তা সংক্রান্ত কাগজপত্র এবং সীমান্তে বিডিআর জোয়ানদের মোতায়েনের মানচিত্র। ওরা এসব দলিল লুট করে নিয়ে যায়।

১১. অফিসারদের হত্যা করার প্রথম পর্ব শেষ হওয়ার পূর্বেই তারা

www.pathagar.com

বিডিআররের নিজস্ব গোয়েন্দা শাখা RSU-এর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে RSU'র যোগাযোগ যন্ত্রগুলো দখল করে নেয় এবং নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে।[৩]

উপরোক্ত প্রতিবেদন নি:সন্দেহে এই সত্যতা উদঘাটন করে যে, ভারত সেনা কর্মকর্তাদের হত্যা চক্রান্তের সাথে জড়িতে ছিল: যেহেতু ১. হত্যাকারী দলের সদস্যরা ভারত থেকে এসেছে. ২ তারাই হত্যা অভিযান শুরু করে ৩.তাদের একজন বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারত এবং ৪.তারা সীমান্ত অঞ্চলে বিডিআর জোয়ানদের মোতায়েন সংক্রান্ত মানচিত্রসহ কতিপয় গোপন দলিল পিলখানা থেকে নিয়ে যায়। হত্যাকারীরা বাংলাদেশী হলে এমন গোপনীয় কাগজপত্র নিতো না।

উল্লেখ্য যে, রাজধানীর বুকে এমন নারকীয় ঘটনা ঘটে যাবার সময় চলাফেরায় কোন বিধিনিষেধ কিংবা সন্ধ্যা আইন জারী করা হয়নি। বিডিআর সদর দফতরের ৫নং গেইট' প্রায় সারাক্ষণ খোলা রাখা হয়। অথচ স্বাভাবিক সময়েও সেখানে কারো প্রবেশের বিষয়টি এতো শিথিল ছিল না। অপরাধীদের পালানোর প্রক্রিয়া বন্ধে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়নি। অতীতের সব রেকর্ড ভঙ্গ করে পিলখাানার ভেতরে বার বার মিছিল করতে করতে বহিরাগত সাধারণ মানুষকে আসতে দেখা হয়। খুনী, অপরাধী ও বিদ্রোহীরা এসব মিছিলের সাথে মিশে পিলখানার বাইরে চলে যাবার নিরাপদ সুযোগ পায়। বাহ্যত: কোন কারণ ছাড়াই পিলখানার চতুপার্শ্বের তিন কিলোমিটার এলাকার বাসিন্দাদের তাদের ঘরবাড়ী ত্যাগ করতে বলা হয়। হঠাৎ নির্দেশ পাওয়া ভীত-সন্ত্রস্ত বাসিন্দারা এলাকা ছাড়ার সময় তাদের সাথে পিলখানার বিদ্রোহী ও খুনীসহ অন্যান্য অপরাধীরা নিরাপদ স্থানে পালিয়ে যাবার সুযোগ পায়। পিলখানায় এবং এর সন্নিহিত এলাকায় বিদ্যুৎ না থাকায় রাতে সব অপরাধীর পালিয়ে যাওয়া আরো সহজতর হয়।*

[৩] আসিফ আরসালান (কলমি নাম) দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা, ৮ মার্চ, ২০০৯।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সরকারের ভূমিকা

বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবের দুর্ভাগ্য যে, সরকার পরিচালনায় তিনি তার ঘনিষ্ঠ সহকর্মী, এমনকি মন্ত্রীবর্গের কাছ থেকে আন্তরিক এবং নিঃস্বার্থ সহযোগিতা পাননি। একেবারে মাঠকর্মী থেকে শুরু করে আওয়মী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটি পর্যন্ত মুজিব অনুসারীদের যাকে যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল তা তারা সরকারী সম্পদ আত্নস্মাৎ এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করে আপন ভাগ্য গড়তে ব্যবহার করেছে। তাদের এই বেঈমানী ও দুষ্কর্ম জনগণকে এতো ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত করেছিল যে সময়ের বির্বতনে শেখ মুজিবের গগনচুম্বী জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা শূন্যের কোঠায় নেমে আসে। মুজিবকে দেশের বাস্তব বিরাজমান অবস্থা ও তথ্যাবলী সঠিকভাবে জানানো হতো না। ফলে দেশের প্রকৃত অবস্থা এবং তার সহকর্মী-অনুসারীদের পুকুরচুরি সম্বন্ধে শেখ মুজিব অন্ধকারেই ছিলেন। তাদের বেপরোয়া বাধাহীন দুর্নীতি অস্বচ্ছতা এবং আত্নস্বার্থ সিদ্ধিমূলক তৎপরতা অব্যাহত রাখার জন্য তারা শেখ মুজিবের সাথে প্রতারণামূলক তোষামুদের অভিনয় করে। ফলে তার অনুসারীদের তার বিতর্কিত ও জটিল কর্মসূচী বন্ধ করতে বলা তো দূরের কথা, তাকে পরামর্শ দেয়ার মত মুখ ও নৈতিক সাহস তাদের ছিল না। শেখ মুজিব প্রকাশ্যে চারদিকে চোর দেখেছেন বলে খেদোক্তি করলেও চোরদের কোন বিচার করেননি। ফলে তিনি জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান, যারা ছিল তার মূল শক্তি । পরিবারের অধিকাংশ সদস্যদের সাথে নিহত হবার পর তার মোসাহেব অনুসারীদের কাউকে মুজিব হত্যার প্রতিবাদ করা তো দূরের কথা সামান্য শোক প্রকাশ করতেও দেখা যায়নি, বরং তারা নিজের পদ এবং মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত অবৈধ সম্পদ কিভাবে রক্ষা করা যায়, তা নিয়ে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে খন্দকার মোশতাকের সাথে যোগাযোগ রাখে। মুজিব মন্ত্রীসভার কেউই পদত্যাগ করেনি। মোশতাকের সাথে ব্যক্তিত্বের সংঘাতের কারণে চার জন মন্ত্রীকে কারাগারে থাকতে হয়। তারাও মুজিবের সাথে স্বচ্ছ আচরণ করেনি।

বাস্তব পরিস্থিতি বলছে শেখ হাসিনা প্রায় একই ধরনের সমস্যার মধ্যে দিয়ে চলছেন। তার দলের মন্ত্রীদের ভাব-ভঙ্গি, লাগামহীন কথাবার্তা ও কর্মকান্ড বিশ্লেষণ করলে এই সত্যতা বেরিয়ে আসে যে, হয় তিনি বাস্তবেই তাদের নিয়ন্ত্রণ করেননা, অথবা তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার কোন ক্ষমতা বাস্তব অর্থেই

www.pathagar.com

তার হাতে নেই। নিন্দুকদের মতে, এই কারণেই শেখ হাসিনা এখন 'র' নির্দেশিত পরামর্শ মোতাবেক কাজ করেন ও কথা বলেন। এমনকি তার নিরাপত্তা ও নাকি 'র' নিশ্চিত করে।

পিলখানা হত্যাকান্ডকে ঘিরে সরকারের ভূমিকা ও তৎপরতা প্রমাণ করে বিডিআর'এর সদর দফতরের অভ্যন্তরের ঘটনাবলী হয়তো তাকে সঠিকভাবে জানানো হয়নি, নতুবা তাকে যথাযথ পরামর্শ দেয়া হয়নি। কিংবা জেনে শুনেই তিনি এমন দীর্ঘসূত্রিতা অবলম্বন করেছেন। যার বলি হলেন ৫৭ জন সেনা কর্মকর্তা, যা যুদ্ধকালীন সময়েও কোন দেশে ঘটেনি। তার সহকর্মী কিংবা তিনি যে ব্যাখ্যাই দিন না কেন, সেনা কর্মকর্তাদের রক্ষা কিংবা প্রকৃত খুনীদের পাকড়াও করার ব্যর্থতার দায়-দায়িত্ব কোনভাবেই তিনি এড়াতে পারবেন না। কোন যুক্তিতে ও বিবেচনায় বিদ্রোহ ও খুনের হোতাদের সাথে দেন-দরবারের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে তিনি জাহাঙ্গীর কবির নানক ও মীর্জা আজমের মতো অতীব বিতর্কিত ও প্রতিবেশী দেশের 'চর' হিসেবে নিন্দিতদের বেছে নিলেন। এই দুই ব্যক্তির বয়স, অভিজ্ঞতা এবং পদ-মর্যাদার দৃষ্টিকোণ থেকে আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের তুলনায় কোন পর্যায়েই পড়ে না। সাধারণ মানুষের মধ্যেও এমন প্রশ্ন উঠেছে, তাদেরকে কেন এমন জটিল ও স্পর্শকাতর বিষয় মোকাবেলায় দায়িত্ব দেয়া হল এবং বিদ্রোহী চক্রের কেন তাদের ওপর আস্থা ছিল যে, এমন জঘন্য হত্যাকান্ড ঘটিয়ে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে গিয়ে সেখান থেকে অতীব সম্মানের সাথে আবার পিলখানায় বিজয়ীর বেশে ফেরত আসা যাবে। হত্যাকান্ডের বাহ্যতঃ হোতা ডিএডি তৌহিদের সহপাঠি নানক এবং ভারত-সৃষ্ট জেএমবি প্রধান শায়েখ আবদুর রহমানের পরমাত্মীয় মীর্জা আজম উভয়ই ভারতপ্রেমী হিসেবে সর্বজনবিদিত। ভারতীয় আশীর্বাদপুষ্ট ফখরউদ্দিনের শাসনামলে এই দুজনই ভারতে গিয়ে 'র' এর সাথে তাদের সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় করে। সমালোচকদের অভিযোগ এ কারণেই ভারতীয় গুপ্তঘাতকদের রক্ষা করার উদ্দেশ্যে শেখ হাসিনা তাদেরকে তথাকথিত মধ্যস্থতাকারী হিসেবে দায়িত্ব দেন। 'র‍্যাব' সেল ফোনের রেকর্ড পরীক্ষা করে দেখতে পেয়েছে যে, ২৪ ফেব্রুয়ারী তৌহিদ নানকের সাথে ২০৪ মিনিট কথা বলেছে। কি কথা বলেছিল তারা?

উল্লেখ্য, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ এবং এর প্রধান শেখ হাসিনা তার সরকারকে উৎখাতের জন্য পিলখানায় সেনাকর্মকর্তা হত্যার পেছনে বিরোধী

www.pathagar.com

দলের চক্রান্তকে দায়ী করেছেন। অন্যদিকে বিরোধী দলের অভিযোগ হত্যাকারীদের সাথে ক্ষমতাসীন সরকার ও দলের সংশ্লিষ্টতা ছিল। এ প্রসঙ্গে সেনা কর্মকর্তাদের উদ্ধার কিংবা রক্ষা করতে সরকারের 'ধীরে চলো' পদক্ষেপ কিংবা অনুৎসাহের প্রতি ইঙ্গিত করে বিরোধী দলের অভিযোগ, সরকারই নীল-নকশা মোতবেক খুনীদরে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। এতে এই ইঙ্গিত মেলে যে, সরকার হত্যাকান্ড বন্ধে আন্তরিক ছিল না। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটির দীর্ঘ প্রতিবেদন থেকে পছন্দ মাফিক মাত্র সাত পৃষ্ঠা প্রকাশ করে বিএনপির কিছু নেতার নাম উল্লেখ করে সরকার তার স্বচ্ছতাকেই কেবল প্রশ্নবিদ্ধই করেনি, বরং তদন্ত কমিটি এবং এর প্রতিবেদনের নিরপক্ষেতা ও গ্রহণযোগ্যতাকেও ধূলিস্মাৎ করেছে। বিরোধী শিবির তদন্ত কমিটির পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন জনসমক্ষে প্রচারের দাবী জানিয়ে অভিযোগ করেছে যে, সরকার ও সরকারী দলের সংশ্লিষ্টতা ধামা-চাপা দেয়ার উদ্দেশ্যেই প্রতিবেদনের অতি সামান্যাংশ প্রকাশ করা হয়েছে। এদিকে সেনা কর্মকর্তা নিধনে ক্ষমতাসীন দলের সংশ্লিষ্টতার প্রতি ইঙ্গিত করে জনৈক ভারতীয় কলামিষ্ট লিখেছেন:

"--------- many of the front-ranking Awami League leaders were directly or indirectly involved behind the BDR Mutiny. Meanwhile, two of the most controversial figures, whose names came at the front right after the mutiny, Jahangir Kabir Nanak (presently a state minister for local government ministry) and Mirza Azam (ruling party's whip in the parliament), have suddenly disappeared from the media. It is even reported that, both were ready to flee the country, once the investigation reports were already done. Investigators so far have identified more than 15 Awami League and 8 BNP men held responsible for patronizing or instigating or funding the mutiny. Another city leader of the ruling party named Torab Ali Akhand (who earlier served in BDR) is already being grilled by investigation agencies after arrest. Akhand already mentioned names of a few influential Awami League leaders, including a close relative of the Prime Minister as his patron in the bloody mutiny. He also told interrogators that a few dozens of arms and thousands of rounds of ammunitions as well as ´some´ Arges grenades were taken from

www.pathagar.com

him by some leaders of Bangladesh Chatra League (Student's front of the ruling party) and Jubo League (youth front of the ruling party). Torab was the custodian of looted arms, ammunitions and explosives from BDR headquarters after the mutiny. He also, at the instruction of an influential Awami League leader brought out procession in favor of the mutiny to give encouragement to the mutineers."[১]

(**ভাবানুবাদঃ** বিডিআর বিদ্রোহের পেছনে আওয়ামী লীগের সম্মুখ-সারির বহু নেতা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বিদ্রোহের পরই সংবাদ মাধ্যমের সামনে আসা অতি বির্তর্কিত দুই ব্যক্তি হাসিনা সরকারের স্থানীয় সরকার বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক ও জাতীয় সংসদের হুইপ মীর্জা আজম হঠাৎ সংবাদ মাধ্যম থেকে উধাও হয়ে যান। এমন খবর এসেছে যে, তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন প্রস্তুত হবার পর তারা উভয়েই দেশ ছেড়ে পালাতে উদ্যত হন। তদন্তকারীরা আওয়ামী লীগের ১৫ জন এবং বিএনপি'র ৮ জনকে বিদ্রোহে ইন্ধন কিংবা উৎসাহ প্রদান অথবা অর্থায়নের জন্য দায়ী করেছেন। বিডিআর'এ এক সময়ে কাজ করতেন সরকারী দলের (ঢাকা) মহানগরীর নেতা তোরাব আলী আখন্দকে গ্রেফতারের পরপরই তদন্তকারী সংস্থাগুলো ব্যাপকভাবে তাকে জিজ্ঞেসাবাদ করে। আখন্দ আওয়ামী লীগের এমন কতিপয় প্রভাবশালী নেতার নাম উল্লেখ করেছে, যাদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর জনৈক নিকটাত্মীয় রয়েছেন যিনি এই রক্ষক্ষয়ী বিদ্রোহের পৃষ্ঠপোষক। জিজ্ঞাসাবাদকারী তোরাব আলী আখন্দ আরও জানিয়েছেন যে, শাসক দলের অঙ্গ সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ও যুবলীগের কতিপয় নেতা তার (তোরাব আলী) কাছ থেকে বেশ কয়েক ডজন অস্ত্র এবং হাজার হাজার রাউন্ড বুলেট নিয়ে গেছে। বিদ্রোহের পর লুণ্ঠিত অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং বিস্ফোরক দ্রব্যাদি তোরাব আলীর জিম্মাদারিতে ছিল। জনৈক প্রভাবশালী আওয়ামী লীগের নেতার নির্দেশে বিদ্রোহীদের উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে বিদ্রোহের অনুকূলে সে মিছিল বের করে'॥)

সুনীতা পাল অভিযোগ করেছেনঃ

---

[১] Sunita Paul: American Chronicle March 19, 2009, http://www.americanchronicle.com/articles/view/98062

www.pathagar.com

"An elected government in Dhaka is rather active in salvaging the killers and their patrons instead of ensuring proper investigation and trial. On the other hand, it is also learnt that, investigations are unnecessarily delayed and interfered by the influential members of the government."

(একটি নির্বাচিত সরকার যথাযথ তদন্ত এবং বিচার নিশ্চিত করার পরিবর্তে খুনী এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকদের রক্ষার কাজে বেশী তৎপর। অন্যদিকে সরকারের প্রভাবশালী সদস্যদের হস্তক্ষেপে তদন্ত কাজে অকারণে বিলম্ব ঘটে।)

সুনীতা পাল লিখেছেন:

"Bangladesh Awami League's leader Torab Ali Akhand and his son Leather Liton (a notorious terrorist), BDR Deputy Assistant Director (DAD) Towhid confessed to the interrogators giving details of the conspiracy. According to facts disclosed by them the matter of 'blueprint' to stage the massacre and kill Army officers were already within the knowledge of a number of influential members of the government. They are Sheikh Hasina Wajed's cousin and influential leader of Bangladesh Awami League Sheikh Fazlul Karim Selim; Sheikh Hasina Wajed's nephew and Member of Parliament Sheikh Fazley Noor Taposh and Home Minister Advocate Sahara Khatun.

"Criminal Investigation Department (CID) sources came to know that members of 'angry' BDR men sat in a number of secret meetings at the residence of Sheikh Fazlul Karim Selim and Barrister Fazley Noor Taposh. Holding of such meetings began from October last year. Barrister Taposh assured the BDR men that once his party comes in power, the issue of several demands by the members of Bangladesh's border security forces shall be duly considered. He (Taposh) arranged meetings between the kingpins of BDR massacre with Awami League leader Torab Ali Akhand.

"There are allegations of involvement of Bangladesh Awami League's student wing leader Harunur Rashid Aka, Leather Liton and his brother-in-law Rezaul Karim Razu with the brutal massacre conspiracy as well as of helping the fleeing mutineers.

www.pathagar.com

"¾ (3-4) days after the election and declaration of landslide victory of Bangladesh Awami League, some leaders of BDR met Taposh at his electoral office at Sky Center at Dhaka's Dhanmondi area. Subsequently, the kingpins of BDR massacre met Barrister Taposh's uncle and influential leader of the ruling party, Sheikh Fazlul Karim Selim on February 13, 2009 at 9:00 pm at his residence at Banani residential area in Dhaka, with their demands. He (Sheikh Selim) told them that, the matter was not within his purview and suggested them to contact the Home Minister.

"Later, the BDR men met Home Minister Advocate Sahara Khatun and pressed forward their demands. They went to 'Imperial Rest House' and the residence of the Home Minister at least thrice to meet her. As they could not meet the Home Minister, a written copy of their demands were handed over to the personal secretary to the minister and subsequently, the kingpins were able to communicate with Advocate Sahara Khatun over cell phone on a number of times.

"Later, the kingpins of the massacre prepared a leaflet (which was later distributed inside the BDR headquarters on February 24) and sent copies of it to Barrister Fazley Noor Taposh, Sheikh Fazlul Karim Selim, Home Minister Advocate Sahara Khatun and Prime Minister Sheikh Hasina Wajed.

"Huge volume of counterfeit currency was recovered from a residential hotel named Imperial Guest House in Dhaka, which is owned by the brother of Home Minister Advocate Sahara Khatun. Members of Rapid Action Battalion (RAB) raided the hotel at around 5 pm (Bangladesh Time) on April 10, 2009. Sensing RAB's presence, nephew of the Home Minister, Polash entered into verbal altercations as well physical assault with the members of the elite force. This raid was conducted following statement from some counterfeit money dealers arrested earlier. Huge volume of counterfeit money as well as equipment of making such currency was seized from the hotel. Forgers were arrested along

www.pathagar.com

with the nephew of the Home Minister. But, later, due to 'influence' from the high-ups, Polash was released."[2]

(ভাবানুবাদ : বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নেতা তোরাব আলী এবং তার ছেলে কুখ্যাত সন্ত্রাসী লেদার লিটন ও বিডিআর'এর উপ-পরিচালক তৌহিদ জিজ্ঞাসাবাদকারীদের কাছে (সেনা কর্মকর্তা হত্যার) চক্রান্তের বিশদ বিবরণ দিয়েছে। তাদের দেয়া তথ্যানুযায়ী এই বিপর্যয় এবং সেনা কর্মকর্তাদের হত্যার নীল-নকশা সরকারের বেশ কিছু সংখ্যক প্রভাবশালী সদস্যদের আগে থেকেই জানা ছিল। এরা হলেন শেখ হাসিনার ফুফাতো ভাই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতা শেখ ফজলুল করিম সেলিম, শেখ হাসিনার ভাতুষ্পুত্র (মরহুম শেখ ফজলুল হক মনির ছেলে) সংসদ সদস্য শেখ ফজলে নূর তাপস এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এডভোকেট সাহারা খাতুন।

"সি আই ডি সূত্রগুলো জানতে পেরেছে যে, ক্ষুব্ধ বিডিআর জোয়ানদের নেতৃস্থানীয় কিছু সদস্য শেখ ফজলুল করিম সেলিম এবং ব্যারিস্টার ফজলে নূর তাপসের বাসভবনে একাধিক গোপন বৈঠক বসে। ২০০৮ সনের নভেম্বর থেকে এসব বৈঠক শুরু হয়। ব্যারিস্টার তাপস বিডিআর জোয়ানদের এই আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, তার দল ক্ষমতায় আসলে বিডিআর জোয়ানদের বিভিন্ন দাবী যথাযথভাবে বিবেচনা করা হবে। তাপস আওয়ামী লীগ নেতা তোরাব আলীর সাথে বিডিআর সদর দফতরে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের বৈঠকের ব্যবস্থা করেন।

"নির্মম হত্যাকান্ডের চক্রান্তে এবং বিদ্রোহীদের পালিয়ে যেতে সহায়তার সাথে আওয়ামী লীগের ছাত্র শাখা ছাত্রলীগ নেতা হারুন-অর-রশিদ, লেদার লিটন, তার ভগ্নিপতি রেজাউল করিম রাজু জড়িত ছিল।

"সাধারণ নির্বাচন এবং আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয় ঘোষিত হবার ৩/৪ দিন পর বিডিআর জোয়ানদের কিছু নেতা ধানমন্ডি এলাকায় তাপসের নির্বাচনী কার্যালয় স্কাই সেন্টারে সাক্ষাত করে। পরবর্তীকালে ১৩ ফেব্রুয়ারী (২০০৯) রাত ৯টায় ব্যারিস্টার তাপসের চাচা ও প্রভাবশালী আওয়ামী লীগ নেতা শেখ ফজলুল করিম সেলিমের বনানীস্থ বাসভবনে পিলখানা হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত বিডিআর জোয়ানদের মধ্যকার হোতাদের সাথে তাদের দাবী

---

[2] Sunita Paul, Is there any government in Bangladesh? April 11, 2009, http://www.americanchronicle.com/articles/view/98062.

www.pathagar.com

দাওয়ার বিষয়ে এক বৈঠকে বসেন। শেখ সেলিম তাদেরকে জানান যে বিষয়টি তার দায়িত্বের আওতার মধ্যে নয়। তাই তিনি তাদেরকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেন।

"পরবর্তীতে বিডিআর জোয়ানদের হোতারা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এডভোকেট সাহারা খাতুনের সাথে সাক্ষাত করে তাদের দাবীসমূহ তার কাছে তুলে ধরে। তারা তার সাথে সাক্ষাত করতে ইমপ্যারিয়াল রেস্ট হাউসে এবং তার বাসভবনে গিয়েছিল। তার সাথে সাক্ষাত করতে না পেরে এসব মোড়লরা তাদের দাবীনামার একটি লিখিত কপি মন্ত্রীর একান্ত সচিবের কাছে হস্তান্তর করে। পরবর্তীকালে এরা সেলফোনে বেশ ক'বার মন্ত্রীর সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম হয়।

"পরে হত্যাকান্ডের হোতারা একটি প্রচারপত্র (লিফলেট) তৈরি করে (যা ২৪ ফেব্রুয়ারী বিডিআর সদর দফতরের অভ্যন্তরে বিলি করে) এর কপি ব্যারিস্টার ফজলে নূর তাপস, শেখ ফজলুল করিম সেলিম, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এডভোকেট সাহারা খাতুন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে পাঠায়।

"স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এডভোকেট সাহারা খাতুনের ভাইয়ের মালিকানাধীন ইমপেরিয়্যাল গেস্ট হাউজ থেকে প্রচুর পরিমাণ জাল মুদ্রা উদ্ধার করে। র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) সদস্যরা ১০ এপ্রিল ৯ (২০০৯) বিকেল ৫টার দিকে হোটেলটিতে হামলা করে। র‍্যাব' সদস্যদের উপস্থিতি টের পেয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ভাতিজা তাদের সাথে বাক-বিতন্ডায় এবং হাতাহাতিতে লিপ্ত হয়। জাল মুদ্রা লেনদেন করে আগে গ্রেফতারকৃত অপরাধীদের কাছ থেকে তথ্য পেয়েই র‍্যাব হোটেলটি ঘেরাও করেছিল। হোটেলটি হতে বিপুল অঙ্কের জাল মুদ্রা এবং মুদ্রা তৈরীর সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ভাতিজাসহ জালিয়াত চক্রকে গ্রেফতার করা হলে উর্ধ্বতন মহলের চাপে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়।")

অভিযোগ উঠেছে যে, পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকারী নীতি ও উদ্যোগ সেনা কর্মকর্তা নিধনকারীদের অনুকূলে ছিল। খুনীদের ভীত-সন্ত্রস্ত করতে পারে সরকার তেমন কোন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। বরং তারা নির্ভয়ে তাদের লোমহর্ষক নির্মম দুষ্কর্ম চালানোর সুযোগ পায়। একটি সশস্ত্র ও রক্তাক্ত বিদ্রোহ রাজনৈতিক পন্থায় দমনের আজগুবী তত্ত্ব হাজির করানো হয়। এর ফলে খুনীরা পর্যাপ্ত সময় পেয়ে সেনা কর্মকর্তাদের খুঁজে খুঁজে হত্যা করার পর তাদের লাশ নানা প্রক্রিয়ায় গুম করে পিলখানা থেকে নির্বিঘ্নে কেটে পড়ার

www.pathagar.com

সুযোগ পায়।

রহস্যজনক কারণে সেনা কর্মকর্তাদের উদ্ধার কিংবা তাদের জীবন অথবা কোন কোন কর্মকর্তার স্ত্রী-কন্যাদের মান-ইজ্জত রক্ষায় কোন প্রচেষ্টা চালনো হয়নি। যথাযথ নির্দেশেনার অভাবে সরকার, সচিবালয়, সংসদ, প্রশাসন, সশস্ত্রবাহিনী, পুলিশ, র‍্যাব, প্রভৃতি প্রায় দুই দিন ধরে গণহত্যা, ধর্ষণ অথবা লুণ্ঠন বন্ধে কোন ভূমিকাই রাখতে পারেনি কিংবা ইচ্ছে করেই তেমন পদক্ষেপ নেয়নি।

সম্ভবত: মধ্যস্থতাকারীরা পিলখানার অভ্যন্তরে আসলে কি ঘটেছে তার পূর্ণাঙ্গ তথ্য হয়তো প্রধানমন্ত্রীকে জানায়নি। অথবা তিনি সব কিছু জেনে শুনেই নিরব থেকেছেন। কেন প্রধানমন্ত্রী বিডিআর মহাপরিচালককে ছাড়া বিদ্রোহীদের সাথে কথা বলতে রাজী হলেন? সাক্ষাৎ করতে আসা বিদ্রোহীদের কেন ভিভিআইপি'দের মতো সশস্ত্র পাহারায় প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে আনা হয়েছিল? প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে আসা ব্যক্তিবর্গের দেহ তল্লাসী একটি আবশ্যিক করণীয় রীতি। কিন্তু রহস্যজনক কারণে ১৪ জন বিদ্রোহী প্রতিনিধির ক্ষেত্রেই আবশ্যিক রীতি উপেক্ষিত হয়েছে। তাদের নাম, পদবী, ঠিকানা ইত্যাদি পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে প্রবেশের সময় লিপিবদ্ধ করা হয়নি। অর্থ্যাৎ প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে আসা বিদ্রোহীদের কোন তথ্যই সংরক্ষণ করা হয়নি। ১৪ জনের অধিকাংশেরই কোন ছবি ধারণ করা হয়নি। আলোচনার পর প্রধানমন্ত্রী বিদ্রোহী নেতা ডিএডি তৌহিদকে বিডিআর'এর প্রধান হিসেবে নিয়োগ দিয়ে সবার জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। ভিভিআইপি'র মর্যাদা নিয়ে বিদ্রোহীরা বিডিআর সদর দফতরে ফিরে আসে। অভিযোগ উঠেছে যে, শেখ হাসিনা বিডিআর এর মহাপরিচালক কিংবা অন্যান্যরা কোথায় কিভাবে কেমন আছেন – তেমন কোন খোঁজ-খবর তিনি বিদ্রোহীদের কাছ থেকে জানতে চাননি। এসবই নি:সন্দেহে রহস্যজনক যা হত্যাকান্ডের সাথে সরকারের সংশ্লিষ্টতার ইঙ্গিত দেয়। আরো প্রশ্ন উঠেছে, কেন বিডিআর সদর দফতরকে চরম দু:সময়ে সারারাত অন্ধকারে রাখা হয়েছিল। আসলে কার নির্দেশে পুরো পিলখানা ও আশেপাশের এলাকার বিদ্যুত সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়? এ বিভ্রাট যদি যান্ত্রিক কিংবা কোন অন্তর্ঘাতমূলক দুষ্কর্ম অথবা মানব-সৃষ্ট কারণেই হয়েই থাকে, সরকার স্বাভাবিকভাবেই অনতিবিলম্বে বিদ্যুত

www.pathagar.com

পুন:সংযোগের ব্যবস্থা করবে – এটাই প্রত্যাশিত, তা অন্য কোন গ্রীড থেকে এনেই হোক কিংবা এমনকি জেনারেটরের মাধমেই হোক। হাজার হাজার বিডিআর জোয়ানদের বিদ্রোহ-কবলিত একটি দুর্যোগপূর্ণ এলাকা সরকার কোন বিবেচনায় সারা রাত অন্ধকারে রেখেছিল? বিডিআর সদর দফতর এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় সারারাত বিদ্যুত পুন:সংযোজন না করার ঘটনা এমন ইঙ্গিতবহ যে সরকারের ভেতরের কোন চক্র সেনা কর্মকর্তাদের হত্যাকান্ডের পুরো নীল-নকশার সাথে সরাসরি জড়িত ছিল এবং তারাই লাশগুলো গুম করা, কিংবা পুঁতে ফেলা, কিংবা ঘাতকদের পালিয়ে যাবার জন্যই পুরো এলাকা নিস্প্রদীপ রেখেছিল। কেউ অনুধাবন করতে পারেনি কেন সেনাবাহিনীকে তাদের ব্যারিকেডকে পূর্ব অবস্থান থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে সরিয়ে নিতে বলা হয়েছিল। বেসামরিক জনগণ পিলখানা হতে ২০টির বেশী এ্যাম্বুলেন্স যাতায়াত করতে দেখেছে। আসলে ঐ এ্যাম্বুলেন্সগুলোতে কারা যাতায়াত করছিল কিংবা এ্যাবম্বুলেন্সগুলো কি বহন করছিল? উল্লেখ্য, ঠিক ঐ সময়ে সরকারী হিসেবে হতাহতের সংখ্যা ছিল মাত্র সাতজন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, বিদ্রোহীদের সারারাত ধরে পালিয়ে যাবার নিরাপদ ব্যবস্থাই শুধু করা হয়নি, এমন কাউকে নিরাপদে পালিয়ে যাবার সুযোগ দেয়ার জন্য সরকারী পাহারার ব্যবস্থা করা হয়। কারা ছিল ঐসব এ্যাম্বুলেন্সে সরে যাওয়া ব্যক্তি? হাজার হাজার বিদ্রোহীদের পালিয়ে যাবার সুযোগ দেয়ায় এটাই প্রমাণিত হয় যে, এই হত্যাকান্ডের সম্পূর্ণ ব্যাপার পূর্ব-পরিকল্পিত নাটকের দৃশ্যপট বা কৌশল বিশেষ, যা বাস্তবে রূপায়িত করতে গিয়ে খুনীরা আমাদের রাজধানীর বুকে একটি অংশকে বর্বরোচিত কসাইখানায় পরিণত করে। সুতরাং এমন মন্তব্য অতিরঞ্জিত কিংবা অনভিপ্রেত নয় যে বিদ্রোহীদেরকে মূলত: পালিয়ে যেতে সহায়তা দেয়া হয়েছিল। হয়তো তা ছিল নাটকেরই একটি অংশ।[৩]

বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সরকারের টিমে-চলা ও হেলা-ফেলা নিষ্ক্রীয় ভূমিকা, সেনা কর্মকর্তাদের জীবন রক্ষায় ব্যর্থতা, সর্বোপরি, খুনীদের পালিয়ে যেতে দেয়ার ঘটনা, উপরোক্ত মন্তব্যের প্রতিফলন। বিডিআর সদর দফতরে সেনা অভিযানের কোন সম্ভবনা না থাকা সত্ত্বেও স্থানীয় এমপি ব্যারিস্টার ফজলে নূর

[৩] Yasmin Bhiyan, March 02, 2009 http//www amardeshbd.com/ dailynews/detail_news_index.php?NewsType=bistarito&SectionID= home&NewsID=214002.

www.pathagar.com

তাপস বাহ্যত: জীবন ও সম্পদ রক্ষার নামে মাইকিং করে বিডিআর সদর দফতরের বাইরের তিনবর্গ কিলোমিটার এলাকার বাসিন্দাদেরকে তাদের ঘরবাড়ী ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। প্রশ্ন উঠেছে, রাজধানীর একজন এমপি, যেখানে সরকারের অবস্থান, সরকারী নির্দেশ না পেয়ে অকারণে জনগণকে তাদের ঘরবাড়ী ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবার নির্দেশ দিতে পারেন কিনা? ঢাকার একটি দৈনিক জানিয়েছেন, হাজারীবাগ-ধানমন্ডি নির্বাচনী এলাকার এমপি তাপস বিডিআর সদর দফতরের তিন কিলোমিটার ব্যাসার্ধের স্থানীয় জনগণকে নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন। ফলে বিডিআর সদর দফতরের পার্শ্ববর্তী ব্যাপক এলাকা সন্ধ্যা নামার আগেরই খালি হয়ে যায়। অভিযোগ উঠেছে যে, এই সুযোগ ব্যবহার করে হাজার হাজার বিডিআর জোয়ান সদর দফতর থেকে পালিয়ে যায়। সরেজমিনে পরিদর্শনে দেখা গেছে যে, বিডিআর সদর দফতরের দেয়ালের ভেতরে গণকটুলী স্কুলে পাশ্ববর্তী শোচাগারের ভেতর ও বাইরে বিডিআর জোয়ানদের অসংখ্যা পোশাক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। মনে করা হচ্ছে, বিডিআর জোয়ানরা পরিচয় গোপন করার উদ্দেশ্যে পালানোর আগে তাদের সরকারী পোশাক খুলে ফেলে। র‍্যাব সদস্যরা কামরাঙ্গীর চর, হাজারীবাগ, মোহাম্মদপুর ও সাভারে দুইশত পলায়নরত বিডিআর জোয়ানকে গ্রেফতার করে। আর বিডিআর সদর দফতরে মাত্র ৪২৬ জন বিডিআর জোয়ান থেকে যায়।[৪]

বিআর সদর দফতরের বাহির থেকে আসা মিছিলের বারবার ভেতরে-বাইরে যাতায়াতের ব্যাপারটিও খুনীদের অনুকূলে ভূমিকা রাখে। ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মীরা এসব মিছিলে দলের অনুকূলে শ্লোগান দিয়ে বার বার সদর দফতরে প্রবেশ করে। গণহত্যা থেকে রক্ষা পাওয়া লে.কর্নেল শাম্স (যাকে এখন অনেকেই হত্যাকারীদের 'চর' মনে করেন) জানিয়েছেন, ২৬ ফেব্রুয়ারী দুপুরে একটি মিছিল বিডিআর সদর দফতরের ৫নং গেট দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে। বিডিআর সদস্যরা এই মিছিলের সাথে মিশে যায়। মিছিলের সাথে মিশে তারা বিডিআর সদর দফতরের বাইরে চলে যায়।

---

[৪] দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা, ৩ মার্চ, ২০০৮।

www.pathagar.com

অভিযোগ উঠেছে, বিডিআর সদর দফতরের পাশ্ববর্তী এলাকায় সান্ধ্য আইন জারী না করে কেন স্থানীয় অধিবাসীদের ঘরবাড়ী ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়। এর ফলে বিদ্রোহীদের পালানো সহজতর হয়। যাতে কেউ বেরিয়ে যেতে না পারে সেজন্য কেন বিডিআর সদর দফতরের চার পাশে পুলিশ র‍্যাব সদস্য কিংবা সেনা সদস্য মোতায়েন করা হয়নি। সরকার মূলতঃ রহস্যময় ও বিপরীত পদক্ষেপ নেয়, যা খুনী অপরাধীদের পাকড়াও করতে সরকারের অনীহা, অনাগ্রহ ও কপটতাকে উন্মোচিত করেছে।

পিলখানা বিপর্যয় রোধে সরকারের ব্যর্থতা ভাগ্য-বিড়ম্বিত সেনা কর্মকর্তাদের উদ্ধারে অনীহার দায়-দায়িত্ব ক্ষমতাসীন সরকার ও সরকারী দলের কোন কোন ব্যক্তিকে যুগ যুগ ধরে বহন করতে হবে।*

www.pathagar.com

সুদূরপ্রসারী প্রভাব

এটা অনিস্বীকার্য সত্যি যে, প্রত্যেক ক্রিয়ারই কিছু তাৎক্ষণিক ও সুদূরপ্রসারী প্রতিফল থাকে। যে কোন অন্তর্ঘাতমূলক কিংবা সন্ত্রাসী তৎপরতা, বিশেষত: পিলখানা বিপর্যয়ের মতো এমন নারকীয় ঘটনা ঝোঁকের মাথায় কিংবা উদ্দেশ্যেহীনভাবে বাংলাদেশের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়নি। পিলখানা হত্যাকান্ডের অনুঘটকরা এই নারকীয় বিপর্যয় ঘটাতে বিপুল অর্থ ও দীর্ঘ সময় ব্যয় করেছে, যার প্রতিকূল ভোগান্তি বাংলাদেশকে দীর্ঘদিন ধরে পোহাতে হবে। এটা বাংলাদেশের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাপনা, অর্থনীতি, এমনকি সামাজিক ও জাতীয় সংহতির ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে।

বিডিআর বিদ্রোহের আড়ালে বিডিআর সদর দফতরে অকস্মাৎ, কিন্তু সুপরিকল্পিত এই মরণঘাত বহুবিধ সুদূরপ্রসারী ক্ষতিকারক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ঘটানো হয়েছে। নিম্নে তেমনি কিছু ক্ষতিকারক উদ্দেশ্যে বর্ণিত হলো :

১. বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কাঠামোকে বিপদাপন্ন করা।
২. সীমান্তকে অরক্ষিত করা ।
৩. বিডিআর'কে ধ্বংস, অযোগ্য, অকার্যকর ও নিষ্ক্রীয় করা।
৪. প্রতিরক্ষার প্রধান দু'টি বাহিনী বিডিআর ও সেনাবাহিনীকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে মুখোমুখি করানো।
৫. চোরাচালানকে বহুমুখী ও ব্যাপকতর করা ।
৬. প্রতিভাবান যুবকদেরকে সেনাবাহিনীতে যোগদানে নিরুৎসাহিত করা।
৭. সেনাবাহিনীকে নেতৃত্বহীন ও অধিনায়কত্বহীন করা ।
৮. প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন শাখার মধ্যে পারস্পারিক বিদ্বেষ, অবিশ্বাস, সন্দেহ, ঘৃণা ও শত্রুতা সৃষ্টি করা।
৯. ভারতীয় সামরিক অভিযান চালানোর মতো আভ্যন্তরীণ গোলযোগ সৃষ্টি করা।
১০. প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাপনার সব শাখার সদস্যদের মনোবল, নৈতিকতা, দেশপ্রেম এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য জ্ঞান দুর্বল করা।
১১. পুনর্গঠনের নামে বিডিআর'এর ভেতরে 'চর' ঢুকিয়ে দেয়া।
১২. বাংলাদেশীদেরকে একরোখা, উশৃঙ্খল, বেপরোয়া এবং কলহপ্রিয় জাতি হিসেবে চিহ্নিত করে নিজেরা নিজেদের শাসন করতে ব্যর্থ বলে প্রমাণ করা।

www.pathagar.com

১৩. বাংলাদেশকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয়া।

মূল্যবান জীবনহানি :

পিলখানায় ঘটে যাওয়া নির্মম হত্যাকান্ড বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো যা বিভিন্নভাবে বাংলাদেশের জন্য চরম বিপর্যকর ঘটনা বিশেষ। এর সবচেয়ে নারকীয় দিক হলো ৫৭ জন চৌকষ, মেধাবী ও দক্ষ, সর্বোপরি, প্রতিশ্রুতিশীল সেনা কর্মকর্তার নির্মম মৃত্যু। ২৫ ফেব্রুয়ারীর ঐ অপয়া দিবসে পিলখানায় ১৩৩ জন সেনা কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। এদের মধ্যে ৮৬ জন বিডিআর সদর দফতর পিলখানাতেই কর্মরত ছিলেন । বাকী ৪৭ জন বিডিআর এর বিভিন্ন সেক্টর, ব্যাটালিয়ন ও ইউনিট হতে বিডিআর সপ্তাহ উপলক্ষে সদর দফতরে জড়ো হন। ভিনদেশী এবং তাদের স্থানীয় 'চর'দের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশ গ্রহণের কারণে শহীদ হওয়া ৫৭ জন সেনা কর্মকর্তাদের নাম হলো ঃ

মেজর জেনারেল শাকিল আহমেদ, এনডিসি, পিএসসি
বিগ্রেডিয়ার জেনারেল আবদুল বারী, এনডিসি, পিএসপি
বিগ্রেডিয়ার জেনারেল জাকির হোসেন
কর্নেল মুজিবুল হক
কর্নেল আসাদুজ্জামান
কর্নেল মোহাম্মদ মশিউর রহমান
কর্নেল খুদরত এলাহী রহমান শফিক, এনডিসি, পিএসসি
কর্নেল আক্তার হোসেন, পিএসপি, জি প্লাস
কর্নেল মোঃ রেজাউল কবির, এএফডব্লিউসি, পিএসসি
কর্নেল নাফিজউদ্দিন আহমেদ, পিএসসি
কর্নেল কাজী এমদাদুল হক, পিএসসি (কমান্ডো)
কর্নেল বিএম জাহিদ হোসাইন, পিএসসি
কর্নেল সামসুল আরেফিন আহমেদ, পিএসসি
কর্ণেল এমডি নকিবুর রহমান, পিএসসি
কর্নেল কাজি মোয়াজ্জেম হোসাইন
কর্নেল গুলজার উদ্দিন আহমেদ, পিএসসি
কর্নেল মোঃ শাখাওয়াত ঈমাম, পিএসসি, জি প্লাস

www.pathagar.com

কর্নেল মোঃ এমাদাদুল ইসলাম, পিএসসি
কর্নেল আফতাবুল ইসলাম, পিএসসি
লে.কর্নেল ইনশাদ ইবনে আমিন, জি+
লে.কর্নেল সামুছুল আযম, পিএসসি
লে. কর্নেল গোলাম কিবরিয়া মোঃ নিয়ামত উল্লাহ, পিএসসি
লে.কর্নেল মোঃ বদরুল হুদা
লে.কর্নেল এলাহী মঞ্জুর চৌধুরী
লে.কর্নেল এনায়েতুল হক, পিএসসি
লে.কর্নেল আবু মুছা মোঃ আইয়ুব কায়সার, পিএসসি
লে. কর্নেল মোঃ সাইফুল ইসলাম
লে. কর্নেল মোঃ লুৎফর রহমান, পিএসসি
লে.কর্নেল মোহাম্মদ সাজ্জাদুর রহমান
লে.কর্নেল কাজী রবি রহমান
লে.কর্নেল লুৎফর রহমান খান, এমপিএইচআইএল
মেজর মোহাম্মদ মকবুল হোসাইন
মেজর মোঃ আব্দুস সালাম খান
মেজর হোসেন সোহেল শাহনেওয়াজ
মেজর কাজী মোসাদ্দেক হোসেন
মেজর আহমেদ আজিজুল হাকিম
মেজর মোহাম্মদ সালেহ
মেজর কাজী আশরাফ হোসাইন
মেজর মাহমুদ হাসান
মেজর মোস্তাক মাহমুদ, পিএসসি
মেজর মাহমুদুল হাসান
মেজর হুমায়ুন হায়দার, পিএসসি
মেজর মোঃ আজহারুল ইসলাম, পিএসসি
মেজর হুমায়ুন কবির সরকার
মেজর খালিদ হোসাইন
মেজর মাহবুবুর রহমান
মেজর মিজানুর রহমান

www.pathagar.com

মেজর মোহাম্মদ মাসুম-উল-হাকিম
মেজর সৈয়দ ইদ্রিস ইকবাল
মেজর মোঃ রফিকুল ইসলাম,এক্স-এইসি, (জেএজি)
মেজর আবু সৈয়দ গাজ্জালী দস্তগীর
মেজর মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন
মেজর মমিনুল ইসলাম সরকার
মেজর মোস্তফা আসাদুজ্জামান
মেজর এস এম মামুনুর রহমান
মেজর এস.এ.এম. মামুনুর রহমান
ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ তানভির হায়দার নূর, এক্স আর্টি
ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ মাজহারুল হায়দার।[১]

এই হত্যাকান্ডের ফলে সেনাবাহিনী এবং বিডিআর'এ চরম নেতৃত্ব শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে। এই শূন্যতা পূরণ করতে বেশ কয়েক বছর লাগবে এবং এতে বিপুল অর্থ ও সময় ব্যয় করতে হবে। সীমান্ত রক্ষা বাহিনীতে নিয়োজিত সুশৃংখল ও চৌকস সেনা কর্মকর্তাদের হত্যার কারণে উভয় পক্ষের জোয়ান ও কর্মকর্তারা দীর্ঘদিন ধরে নৈতিক দৈন্যতা ও দেউলিয়াত্বে ও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবেন। তাদের মানসিক শক্তি ও নৈতিক সাহস হ্রাস পাবে। দায়িত্ব পালনে তারা উৎসাহ পাবেনা। তাদের তেজোস্বিতা হ্রাস পাবে। তারা প্রায়ই 'মনমরা' আত্নভোলা এবং উদাসীন থাকবে। আগত বহু বছর ধরে বিডিআর বাস্তব অর্থেই নেতৃত্বহীন থাকবে। বিডিআর'এর আগের তেজী শৌর্য-বীর্য সহজে পুনরুদ্ধার হবে না। সীমান্ত অঞ্চলে নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা এবং নজরদারী অকার্যকর হয়ে পড়বে। এর ফলে ভারত সীমান্তে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সুযোগ পাবে। এমন একটি পরিস্থিতি জন্য ভারত বহুদিন যাবত অপেক্ষা করেছিল। অন্যদিকে পিলখানায় আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক সেনাবাহিনী তার মেধাধী ও চৌকষ কর্মকর্তাদের এক তৃতীয়াংশকে হারিয়েছে। ফলে সেনাবাহিনী স্বাভাবিকভাবেই দুর্বল ও অকার্যকর হয়ে পড়বে। দেশ রক্ষার প্রধান শক্তি সেনাবাহিনী হলেও সহযোগী বাহিনী হিসেবে বিডিআর, পুলিশ, র‍্যাব, আনসার, গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী বিশেষ ভূমিকা রাখে। বিডিআরকে

[১] Bangladesh Defense Journal, Dhaka, June, 2009.

www.pathagar.com

সর্বক্ষেত্রে নিষ্ক্রীয় এবং সেনাবাহিনীকে দুর্বল করে চক্রান্তকারীরা মূলত: আমাদের প্রতিরক্ষাব্যুহকে নড়বড়ে করে দিয়েছে।

প্রতিকূল প্রভাব:

পিলখানা হত্যাকান্ডের তাৎক্ষণিক বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় সরকারীভাবে ২৬ মার্চ (২০০৭) এর স্বাধীনতা দিবসের চিরায়ত কুচকাওয়াজের কর্মসূচী বাতিল হয়ে যায়। মন্ত্রীপরিষদ সভায় এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সরকার সেনাবাহিনীর কর্তৃত্বাধীনে এমন অনুষ্ঠান আয়োজনে সম্ভবত: নিরাপদ মনে করেনি। ১৯৭২ সন থেকে অনুষ্ঠিত হওয়া এই কুচকাওয়াজ হলো স্বাধীনতা দিবসের মূল আকর্ষণ । এই কুচকাওয়াজ বাতিল হওয়া তারই ইঙ্গিত বহন করে। এর মাধ্যমে সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি পরোক্ষভাবে হলেও সরকারের অবিশ্বাস প্রতিফলিত হয়েছে।

পিলখানা হত্যাকান্ডের সুদূরপ্রসারী অপপ্রচারের প্রতি ইঙ্গিত করে ঢাকার একটি নেতৃস্থানীয় দৈনিক পত্রিকার সাথে সাক্ষাতকারে বিডিআর' এর সাবেক মহাপরিচালক মেজর জেনারেল ফজলুর রহমান বলেছেন, পিলখানা হত্যাকান্ডের পর আমাদের সীমান্ত বলতে গেলে প্রায় সম্পূর্ণই অরক্ষিত হয়ে গেল। বিডিআর জোয়ানদের মনে এক ধরনের অবিশ্বাসের সূচনা হয়েছে। তাদের মনোবল একবারেই ভেঙ্গে পড়েছে। তারা নিজেরাই নিরাপত্তা হীনতায় ভুগছে।[২]

পিলখানা হত্যাকান্ডের অনুঘটকরা উদ্দেশ্যেহীনভাবে এই দুষ্কর্ম ঘটায়নি। এ ঘটনা ঘটানোর পেছনে তাদের পূর্ব নির্ধারিত কতিপয় ভূ-আর্থিক রাজনৈতিক কৌশলগত উদ্দেশ্যে ছিল। বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাপনায় বিডিআর সম্মুখসারির বাহিনী হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই এ দুষ্কর্মের পৃষ্ঠপোষকদের প্রধান লক্ষ্য ছিল একে দুর্বল ও নির্মূল করা। অবশ্য এই গণহত্যা হতে অন্যান্য আরো কিছু অতিরিক্ত ফায়দা লুটার উদ্দেশ্য তাদের ছিল।

ঢাকার সবচেয়ে প্রভাবশালী বাংলা পত্রিকা দৈনিক 'ইত্তেফাক' জানিয়েছে যে, পিলখানা বিপর্যয়ের অনুল্লেখ্য অনুঘটকদের বেশ কিছু উদ্দেশ্যে ছিল যা তাদেরকে এই নির্মম হত্যাকান্ড ঘটাতে উদ্বুদ্ধ করেছে। এগুলো হলো আমাদের সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনীর ভেতর বহির্দেশীয় গোয়েন্দা

---

[২] আ.ত.ম ফজলুর রহমান, দৈনিক নয়া দিগন্ত, ঢাকা, ২২ মার্চ, ২০০৯।

www.pathagar.com

সংস্থার 'চর' ঢুকানোর পরিবেশ তৈরী করা, বাংলাদেশের সামরিক ও বেসামরিক বাহিনীকে আন্তর্জাতিকভাবে উচ্শৃংখল হিসেবে প্রমাণ করা, যারা বিডিআর পুনর্গঠনে অর্থ যোগাবে কিংবা প্রশিক্ষণ দেবে বিডিআর এর ওপর তাদের পূর্ণ কর্তৃত্ব ও প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করা, জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা বাহিনীতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও অন্যান্য বাহিনীর অংশগ্রহণ বন্ধ করা, তরুণদের সেনাবাহিনীতে প্রবেশ নিরুৎসাহিত করা, আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে দুর্বল করা।[৩]

আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর মর্যাদা ও অবস্থানকে ধূলিস্মাত করে ভেঙ্গে দেয়াই ছিল এই প্রতিশোধার্থক হত্যাকান্ডের মুখ্য উদ্দেশ্যে। তাই সবাই অনুভব করেন যে, বাংলাদেশের দুশমনরা আমাদের কাছে এই ভীতিকর বার্তা পৌঁছিয়ে দিয়েছে যে, কেমন অমানবিক ও নিষ্ঠুরভাবে আমাদের সেনা কর্মকর্তাদের হত্যা করা যায়, বেয়ানট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তাদেরকে ক্ষত-বিক্ষত করে গণকবরে পুঁতে ফেলা যায়, কিংবা তাদেরকে পুড়িয়ে ফেলা যায়, তাদের বাসা-বাড়ী লুন্ঠন এবং স্ত্রী-কন্যাদের ধর্ষণ করা যায়।

ভাব-মর্যদার ক্ষুন্ন করা

পিলখানা হত্যাকান্ডের উদ্দেশ্যে ছিল বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে অকেজো ও বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের মান-মর্যদা ক্ষুণ্ন করে এদেশে বিদেশী বিনিযোগ বন্ধ করে তা প্রতিবেশী দেশের দিকে ঘুরিয়ে দেয়া। বাংলাদেশ হতে বিদেশে বিনিয়োগকারীদের সরিয়ে রাখার জন্য ভারত যারপরনাই চেষ্টা করছে। ভারত তার প্রশিক্ষিত বেতনভূক 'চর'দের ব্যবহার করে বাংলাদেশের কল-কারখানা ও যানবাহনে সন্ত্রাসী ও অন্তর্ঘাতমূলক হামলা চালায়। বাংলাদেশ-বিরোধী অপপ্রচার, বিশেষত গার্মেন্টস শিল্পে ধর্মঘট, অগ্নিসংযোগ, রাস্তা ও মহাসড়ক অবরোধ, শ্রমিক অসন্তোষ, প্রভৃতির লক্ষ্য হলো বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগ বন্ধ করা। বাংলাদেশে সস্তা শ্রম এবং বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও কেবল ভারতীয় অপ্রচার এবং লেলিয়ে দেয়া সন্ত্রাসী কার্যক্রমের কারণে আশানুরূপ বিনিয়োগ আসতে পারছেনা। ভারত চাচ্ছে দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে বিনিয়োগ করতে চায়, এমন সব বিনিয়োগকারীরা

[৩] দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ৩ মার্চ, ২০০৯।

www.pathagar.com

কেবলমাত্র ভারতেই বিনিয়োগ করুক, যাতে আন্তর্জাতিক বাজার সম্পূর্ণরূপে ভারতের নিয়ন্ত্রণে থাকে।

এই কারণে ভারত সর্বদা বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় হতে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে চায়। ভারত আমাদের ভূটানের অবস্থানে নামিয়ে আনতে চায়, যাতে বৈদেশিক যোগাযোগ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ভারতের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। ভারত চায়নি বাংলাদেশ ভারতের প্রভাবমুক্ত হয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলুক। ভারতের প্রত্যাশা বাংলাদেশ কেবল ভারতের ছায়া-রাষ্ট্র হিসেবে ভারতকেই অনুসরণ করুক, যেমনটি ভূটান করছে, এবং এর আগে সিকিম যেমনটি করত। বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের কোন কূটনৈতিক মিশন থাকা দরকার নেই, ভারতীয় মিশনগুলোই ঐ দায়িত্ব সম্পন্ন করবে। পিলখানায় সেনা কর্মকর্তাদের খুনের মাধ্যমে ভারত তার দীর্ঘ দিনের লালিত চক্রান্ত বাস্তবায়নে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। এই নির্মম হত্যাকান্ড আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে হতবাক করেছে। পিলখানায় ঘটে যাওয়া সাম্প্রতিক ঘটনায় বাংলাদেশকে সাহায্য প্রদানকারী শীর্ষতম দেশ জাপান বিস্মিত এবং হতাশ হয়েছে। জাপানীরা বাংলাদেশ সফল বাতিল করেছে ।[৪]

কেবল জাপানাই নয় বিডিআর সদর দফতরের এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, চীন, মধ্যপ্রাচ্যসহ সারা বিশ্বের বন্ধুভাবাপন্ন দেশসমূহ হতাশ ও বিস্মিত হয়েছে। এই হত্যাকান্ডের মাধ্যমে বহির্বিশ্বে আরো একবার প্রমাণিত হলো যে, বাংলাদেশ কলহপ্রিয় বিশৃংখল জাতি, যারা বর্বর মানব-সুলভ এমন অমানবিক হত্যাকান্ড ঘটাতে পারে। ১৯৭১ সনে পাকিস্তান সেনাবাহিনী এমন নির্মমতাই চালিয়েছিল। কিন্তু এই হত্যাকান্ড বাংলাদেশীরাই ঘটিয়েছে।[৫]

প্রতিপক্ষকে নির্মূলকরণ

পিলখানায় হত্যাকান্ডের ব্যাপারে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো পরস্পর বিরোধী অভিযোগ উত্থাপন করেছে। এই বিপর্যয়ের জন্য তারা একে অন্যকে দায়ী করছে। বিরোধী দলের অভিযোগ, সরকার পিলখানার হত্যাকান্ডকে

---

[৪] Abdur Rahman; Our Reputation at Risk, The Bangladesh Observer, Dhaka, 20 March, 2009.

[৫] পূর্বোক্ত।

www.pathagar.com

বিরোধীদলীয় নেতা-কর্মীদের নির্মূল করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বয়ং অভিযোগ করেছেন যে, তার সরকারের পতন ঘটানোর উদ্দেশ্যেই এই হত্যাকান্ড ঘটানো হয়েছে। তার মন্ত্রীরাও প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে তাদের অভিযোগের তর্জণী বিরোধী দলের দিকেই তাক করেছেন। অন্যদিকে ভারতের অর্থায়িত প্রিন্ট ও ইলকট্রনিক মিডিয়া, সর্বোপরি, ভারতীয় প্রচার মাধ্যমে এই হত্যাকান্ডের দায়-দায়িত্ব জামাত-বিএনপি চক্রের ওপর চাপিয়ে দিতে অহোরাত্রি প্রচারণা চালিয়েছে। জামাতপন্থী হিসেবে পরিচিত ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাককে পিলখানা হত্যাকান্ডের ব্যাপারে সিআইডি'র তদন্তকারী কর্মকর্তাদের সামনে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হাজির হতে লিখিত নির্দেশ প্রেরণের মাধ্যমে সরকারের আসল উদ্দেশ্যে বেরিয়ে আসে।

অন্যদিকে বিএনপি দলীয় সাবেক সংসদ সদস্য নাসির উদ্দিন পিন্টুকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্টের প্রেক্ষিতে গ্রেফতার করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ৩০৯-পৃষ্ঠার ঐ প্রতিবেদনের মাত্র সাত পৃষ্ঠা জনসমক্ষে প্রচার করা হয়েছে, যেখানে নাসিরউদ্দিন পিন্টুর নাম রয়েছে বলে সরকার পক্ষ দাবী করেছে। বিরোধী দলগুলোর অভিযোগ, সরকার উদ্দেশ্যেমূলকভাবে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন গোপন রেখে সরকার দলীয় নেতা-কর্মীদের এই হত্যাকান্ডে জড়িত থাকার বিষয়টি ধামাচাপা দেয়ার চক্রান্ত করছে, কিন্তু বিরোধীদলকে ঘায়েল করার জন্য সুবিধাজনক অংশটুকু প্রকাশ করেছে । অদ্যাবধি অপ্রকাশিত সিআইডি'র তদন্তে আরো বিরোধী দলীয় নেতা-কমীদের নাম অন্তর্ভূক্ত করার উদ্দেশ্যেই ঐ তদন্ত কর্ম সম্পাদনে অযথা বিলম্ব করেছে বলে বিরোধী দলগুলো বারবার অভিযোগ তুলেছে। তদন্ত কমিটিগুলোর সমন্বয়কারী বাণিজ্যমন্ত্রী এই কমিটির প্রতিবেদন জুলাই মাসের মধ্যে জমা দেয়ার কথা বললেও এ গ্রন্থ মুদ্রণের জন্য ছাপাখানায় প্রেরণ (ডিসেম্বর ১৬, ২০০৯) পর্যন্ত তা প্রকাশ করা হয়নি। যদিও কমিটি গঠন কালে সরকার প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য সময় বেঁধে দিয়েছিলেন।

গৃহযুদ্ধ

পিলখানা হত্যাকান্ডকে কেন্দ্র করে ভারত সরকারের তৎপরতা, প্রস্তাব বিশেষতঃ শেখ হাসিনাকে উদ্ধারের জন্য স্ব-প্রণোদিত দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, সর্বোপরি,

www.pathagar.com

সমর প্রস্তুতি কেবল প্রশ্নবিদ্ধই নয়, বরং ভীতিজনক আগ্রাসী মানসিকতার বহির্প্রকাশ। এসব কিছুর বিশ্লেষণ, পারিপার্শ্বিক বাস্তবতা ও আলামত এবং ক্ষমতা প্রদর্শনের অহমিকাবোধ একটি নিরেট সত্যকে উন্মোচিত করেছে – ভারত পিলখানা হত্যাকান্ডের মূল রূপকার। এই তান্ডবের হোতাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল সশস্ত্রবাহিনী ও সাধারণ জনগণকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে গৃহযুদ্ধের সূচনা করা। বাংলাদেশ-বিরোধী অবস্থানের জন্য কুখ্যাতি অর্জনকারী জনৈক ভারতীয় কলামিষ্ট ভারতীয় চক্রান্তের মূল উদ্দেশ্যেকে ভিন্নভাবে সামনে এনে লিখছে, 'বিদ্রোহীদের হাতে এতগুলো সেনা কর্মকর্তার এমন পৈশাচিকভাবে খুন হবার বিষয়টি এই বাস্তবতার ইঙ্গিত দেয় যে, এতে সেনাবাহিনী ক্ষুব্ধ হয়ে সারা দেশে বিডিআর'এর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে।[৬]

বাংলাদেশে গৃহযুদ্ধের সূচনা করে এর অর্থনীতিকে পঙ্গু করা, সড়ক যোগাযোগ ব্যাহত ও অবকাঠামো ধ্বংস করা, সর্বোপরি সামাজিক বিশৃংখলা ও হানাহানির মাধ্যমে জীবন ও সম্পদহানি করার মাধ্যমে বাংলাদেশে সামরিক অভিযান চালানোর মতো পরিবেশ তৈরী করা।

এমন অভিযোগ উঠেছে যে, কোন কোন ভারতীয় নীতি নির্ধারক বাংলাদেশ সীমান্তকে মুক্তাঞ্চলে পরিণত করার উদ্দেশ্যে বিডিআরকে নির্মূল করতে চেয়েছিল, যাতে ভারতীয় সন্ত্রাসী ও খুনীরা অবাধে বাংলাদেশে যাতায়াত করতে পারে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল দ্বিতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশে সেনাবাহিনীকে পথে নামিয়ে আনা। তারা নিশ্চিত ছিল যে, সেনা কর্মকর্তাদের খুন হতে দেখে পুরো সেনাবাহিনী অবশ্যই প্রতিক্রিয়া দেখাবে, এমনকি সরকার উৎখাতে উদ্যত কবে। সেই সুযোগে শেখ হাসিনাকে উদ্ধার করার অজুহাতে ভারতীয় সৈন্যরা বাংলাদেশে ঢুকে পড়লে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হবে। স্বাভাবিকভাবেই শক্তিধর ভারত সে যুদ্ধে জয়লাভ করে চিরস্থায়ীভাবে ভারতীয় সেনারা বাংলাদেশ নামক ভারতের আশ্রিত রাজ্যে অবস্থান করবে।[৭]

চক্রান্তকারীদের বিশ্বাস ছিল, পিলখানায় সেনা কর্মকর্তাদের হত্যাকান্ডের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সেনাবাহিনী বিডিআর জোয়ানদের ওপর ঝাঁপিয়ে

---

[৬] Bangladesh After the Revolt, Hiranmay Karlckar, Consultant Editor, The Pioneer, Sair, Volume 7, No. 37, 23 March, 2009.

[৭] Shah Ahmad Reza, The Weekly Rising Sun, Dhaka, 30 March, 2009.

www.pathagar.com

পড়বে, যা সারাদেশে ছড়িয়ে থাকা বিডিআর এর ইউনিট, ব্যাটালিয়ন ও সেক্টরসমূহে ছড়িয়ে পড়বে। এভাবে সেনাবাহিনী দু'টো বিবাদমান শিবিরে বিভক্ত হয়ে যাবে। একাংশ সেনাবাহিনীর ঐতিহ্যগত শৃঙ্খলার অধীনে থাকবে, অন্যাংশ শৃঙ্খলা ভেঙ্গে প্রতিশোধ নিতে প্রবৃত্ত হবে। উভয় পক্ষই পরস্পরের বিরুদ্ধে রক্তাক্ত সংঘর্ষে লিপ্ত হবে। পুরো দেশে মারাত্মক বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য দেখা দেবে। পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটানোর জন্য ভারত উভয় পক্ষকে ইন্ধন যোগাবে আর শান্তি পুনঃস্থাপনরে নামে ভারতীয় সেনাবাহিনী তথাকথিত শান্তি মিশনের আবরণে বাংলাদেশে প্রবেশের যুক্তি খুঁজে পাবে।[৮]

উম্মুক্ত সীমান্ত

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঊষালগ্ন থেকে ভারত সরকারের প্রত্যাশা ছিল বাংলাদেশ নাম-মাত্র পতাকা-সর্বস্ব সীমান্ত-বিহীন মানচিত্র নিয়ে ভারতের অধীন কাগজে-কলমে স্বাধীন থাকবে, যাকে পাহারা দেয়া কিংবা রক্ষা করার জন্য কোন কার্যকর পেশাদার বাহিনী থাকবেনা। অর্থাৎ ভারত এমন বাংলাদেশ চেয়েছিল, যার সীমান্ত ভারতের জন্য সব সময় উম্মুক্তে থাকবে, যাতে ভারতীয় নাগরিক, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, নিম্নমানের সামগ্রী ও সরঞ্জাম, জালমুদ্রা, মাদকদ্রব্য অস্ত্র গোলাবারুদ বাধাহীনভাবে বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পারে । অন্য দিকে বিদেশ হতে কেনা জ্বালানী ও ভোজ্য তেল, কলকারাখানা ও গাড়ির যন্ত্রাংশ, বিলাসদ্রব্য, সোনা-রূপা বাংলাদেশ হতে ভারতে পাচার হতে পারে। গত ৩৮ বছর ধরে অবিরাম প্রচেষ্টার পরেও ভারত যেসব লক্ষ্যে পুরোপুরি পৌঁছাতে পারেনি। পিলখানা হত্যাকান্ড সে লক্ষ্যে পৌঁছার সর্বশেষ প্রচেষ্টা বিশেষ। ঐ হৃদয়-বিদারক ঘটানার পরে বাংলাদেশ সীমান্ত মূলত ফাঁকা হয়ে যায়। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের সশস্ত্রবাহিনী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পরিস্থিতি মোকাবেলা করে সীমান্তে পাহারা জোরদার করে অবাধ চোরাচালান প্রতিহত করে, বাংলাদেশ সীমান্তের নিকটবর্তী ভারতীয় অঞ্চলে বহু সমাজ বিরোধী অপরাধী, সর্বোপরি, চোরাচালানী বসবাস করে। এরা অবাধে বাংলাদেশে প্রবেশ করতে শুরু করে। স্থানীয় বাংলাদেশীদের উদ্ধৃত করে সংবাদ মাধ্যম জানায়, সমগ্র

[৮] ডঃ রেদোয়ান ছিদ্দিক, উপ-সম্পাদকীয়, দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা, ১৮ মার্চ, ২০০৯।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত চোরাচালানীদের জন্য পুরোপুরি মুক্ত হয়ে যায়। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, এক শ্রেণীর পুলিশ স্থানীয় রাজনৈতিক মোড়লদের সাথে আঁতাত করে বাংলাদেশে ভারতীয় অবৈধ ও নিষিদ্ধ পণ্যের বন্যা বইয়ে দেয়। ঢাকার 'দৈনিক জনতা' (৩ মার্চ ২০০৯) জানায় 'লাইনম্যান' নামে পরিচিত স্থানীয় প্রশাসনের প্রভাবশালীরা লাখ লাখ টাকা আদায় করে জয়পুর হাট জেলার পাঁচবিবি এলাকার সীমান্ত পথগুলো চোরাচালানীদের কাছে ইজারা দেয়। পিলখানার হত্যাকান্ডের পর সীমান্ত পথগুলো প্রায় অরক্ষিত ও নজরদারিহীন হয়ে পড়ে। চোরাচালানীদের সিন্ডিকেট হিলি রেল স্টেশনে বসে সেলফোনের মাধ্যমে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের কাছে চোরাচালানকৃত মালামালের নাম ও পরিমাণ-সংখ্যা উল্লেখ করে অর্ডার দিত। এসব অবৈধ সামগ্রী এক ঘন্টার মধ্যে চাহিদা প্রদানকারীদের কাছে পৌঁছে যেত। মূল্য কম হবার কারণে বিপুল সংখ্যাক ভারতীয় সেলফোন সেট বিনা বাধায় বাংলাদেশে প্রবেশ করে। অতীতের সব নজির ভঙ্গ করে বিপুল পরিমাণ ফেনসিডিল, লবণ, পাথর মিশ্রিত পটাশ সার বাংলাদেশে চলে আসে। উল্লেখ্য যে, বিডিআর এর নেতৃত্বে সেনা কর্মকর্তারা থাকায় বিডিআর এর অসৎ সদস্যরা সাধারণত চোরাচালানীদের সাথে আঁতাত করার তেমন সুযোগ পেত না। পিলখানা হত্যাকান্ডের মোড়লদের সাথে ভারতীয় মাড়োয়ারি, চোরাচালানী সিন্ডিকেট এবং বিপথগামী বিডিআর কর্মকর্তাদের কোন যোগসাজোস ছিল কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

পিলখানা হত্যাযজ্ঞের পর সীমান্তব্যাপী বিডিআর জোয়ানদের নজরদারী এবং কঠোরতা আগের মতো নেই বললেই চলে। সাধারণ বিডিআর জোয়ানরা তাদের কর্মস্পৃহা হারিয়ে ফেলেছে। অনেকেই মানসিক চাপে এবং ভীতিকর দুশ্চিন্তায় রয়েছে। কখন সেনা কর্মকর্তাদের হত্যাকান্ডের সাথে জড়িয়ে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয় – এমন একটা ভীতি সব সময় তাদের তাড়িয়ে বেড়ায়। ঢাকার ইংরেজি দৈনিক 'দ্য নিউ এজ' জানিয়েছে এ অবস্থার সুযোগ নিয়ে চোরাকারবারী এবং তাদের সহযোগীরা অবাধে ভারতীয় নিষিদ্ধ দ্রব্যাদি নিয়ে আসছে। সীমান্ত অঞ্চলে চলাচলকারী আন্তঃনগর ট্রেনগুলো চোরাচালানকৃত সামগ্রী আনয়নে মুখ্য বাহন হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। পিলখানা বিপর্যয়ের আগে সেনা কর্মকর্তাদের পরিচালনাধীন বিডিআর প্রায় প্রত্যহ কোটি টাকা মূল্যের চোরাচালানকৃত দ্রবাদি আটক করত। বিডিআরকে নিষ্ক্রীয় করার

www.pathagar.com

পর ২৬ ফেব্রুয়ারী থেকে ২৬ এপ্রিল পর্যন্ত অতি নগন্য পরিমাণ চোরাচালানকৃত মালামাল আটক করা হয়েছে । বিডিআর জোয়ানদের তীব্র হতাশার কথা উল্লেখ করে 'নিউ এজ' সীমান্তে মোতায়েনকৃত বিডিআর জোয়ানদের বাস্তব অবস্থা তুলে ধরে। পত্রিকাটি সীমান্ত-সংলগ্ন কোম্পানীগঞ্জ, জয়ন্তিয়াপুর, গোয়াইনঘাট, কানাইঘাট, জকিগঞ্জ প্রভৃতি উপজেলার অধিবাসীদের উদ্ধৃত করে জানিয়েছে যে, বিডিআর জোয়ানরা তাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ থাকার কারণে স্ব-স্ব দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারছেনা।

তামাবিল সীমান্তে সংগ্রামপুঞ্জী বিডিআর ক্যাম্পের নিকটবর্তী শান্তি নগরের জনৈক স্থানীয় ব্যবসায়ী জানিয়েছেন, জোয়ানরা যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন না করায় বিভিন্ন ধরনের সামগ্রীর চোরাচালান আশংকাজনকভাবে বেড়ে গেছে। বিডিআর'এর সূত্রমতে বিডিআর'এর সিলেট সেক্টর হেডকোয়ার্টারের কর্মকর্তারা সীমান্ত প্রহরীদের কর্মতৎপরতার জবাবদিহীতার প্রতি তেমন কঠোর নন। অবশ্য সিলেট সেক্টরের অধীনে ২১ ব্যাটালিয়নে অপারেশন অফিসার মেজর বেনজির দাবী করেছেন, তাদের সীমান্তে নজরদারী এবং চোরাচালানী বন্ধের অভিযান স্বাভাবিক রয়েছে।

যশোর প্রতিনিধি জানান, বেনাপোল চেকপোষ্টে মোতায়নকৃত জোয়ানরা তাদের ভবিষ্যত নিয়ে উদ্বিগ্নতা ও ভীতির মধ্যে থেকে দায়িত্ব পালন করছে। বেনাপোল স্থল বন্দরে বেশ কিছু পুলিশ জানিয়েছেন, বিডিআর জোয়ানরা গ্রেফতার হবার সম্ভবনার ভয়ে সন্ত্রস্ত, যদিও সীমান্তে মোতায়নকৃত বিডিআর সদস্যরা বিদ্রোহে জড়িত ছিল না। বিডিআর জোয়ানরা তাদের চাকরির নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন, যেহেতু সরকারের বিডিআর পুণর্গঠনের আওতায় হয়তো তারা চাকুরিচ্যুত হতে পারেন। সীমান্তে পাহারারত জনৈক জোয়ান জানিয়েছেন, এমন আশা পোষণ করা ছাড়া আমাদের কিছুই করার নেই যে, সরকার যা করবেন তাতে আমাদের মঙ্গলই হবে। আরেক জন জোয়ান বলেছেন, এমন প্রত্যাশা ছাড়া আমরা কি করতে পারি যে, বিদ্রোহের সাথে জড়িত ছিলনা এমন জোয়ানদের ক্ষতি হতে পারে তেমন পদক্ষেপ সরকার নেবেন না। বেনাপোল সীমান্তে ১৩টি চৌকিতে ৮০ জন বিডিআর জোয়ান মোতায়েন রয়েছেন। এই অঞ্চলের জনৈক শ্রমিক নেতা 'নিউ এজ' কে জানান সীমান্তজুড়ে সব বিডিআর জোয়ানরা তাদের ভবিষ্যত নিয়ে ভীতি-সন্ত্রস্ত্র।

www.pathagar.com

'নিউ এজ' এর লালমনিরহাট সংবাদদাতা জানিয়েছেন, সীমান্তবর্তী এই জেলার প্রায় সব বিডিআর জোয়ানই বিডিআর পুনর্গঠনের কথা শুনে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। লালমনিরহাটের মোঘলঘাট সীমান্ত শিবিরের বিডিআর জোয়ানদের উদ্বিগ্ন থাকতে দেখা গেছে। জনৈক জোয়ান বললেন, বিডিআর পুনর্গঠনে তারা সন্তুষ্ট নন।

দূর্গাপুরের আদিতমারি ও বানিয়াতি সীমান্ত চৌকির জোয়ানরা বলেছেন, সীমান্তবর্তী জেলাসমূহে তারা সমস্যার মধ্যে রয়েছেন। কারণ বিদ্রোহের পর স্থানীয় বাসিন্দরা তাদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেছেন।[৯]

ঢাকার একটি বাংলা দৈনিক জানিয়েছে, বিভিন্ন সীমান্ত পথ বিশেষত: দিনাজপুরের বিরামপুর, গোরাঘাট প্রভৃতি দিয়ে ভারতীয় নিষিদ্ধ পণ্য বানের মতো বাংলাদেশ প্রবেশ করছে। দৈনিকটি জানিয়েছে, বিডিআর ও পুলিশ ভারতীয় চোরাচালানকৃত পণ্যের ২৫ শতাংশও আটক করতে পারছেনা। দৈনিকটির অভিযোগ, ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারীতে পিলখানা বিপর্যয়ের পরবর্তীতে সৃষ্ট পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে চোরাকারবারীরা অবাধে ভারতীয় নিষিদ্ধ দ্রব্য বাংলাদেশে চোরাচালান করছে। জুন মাসের প্রথমার্ধে (জুন ১-১৫) পুলিশ ও বিডিআর জোয়ানরা তিন কোটি টাকা মূল্যমানের ফেনসিডিল, প্রসাধন সামগ্রী, ইস্পাত, নিম্নমানের ওষুধ ও সার প্রভৃতি ভারতীয় নিষিদ্ধ পণ্য আটক করে। একই সময়ে অর্ধডজনের বেশী চোরাকারবারীকে আটক করা হয়। কিন্তু এদের মূল হোতারা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে যায়।[১০]

সৌভাগ্যক্রমে সেনাবাহিনীর ত্বরিৎ তৎপরতায় রাতারাতি অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে। কালবিলম্ব না করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিডিআর এর শূন্যতা পূরণের উদ্দেশ্যে দ্রুত সেনা সদস্যদেরকে সীমান্তে পাঠানো হয়। ফলে সীমান্তে চোরাচালান ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। ২০০৮ সনের এপ্রিল মাসের তুলনায় ২০০৯ এর এপ্রিল মাসে চোরাচালনের ঘটনা ও ব্যাপকতা অনেক লক্ষ্যনীয়ভাবে কম ছিল।

বিডিআর জোয়ানদের প্রতি অবিশ্বাস ও নিরাপত্তাহীনতাজনিত শংকা বিভিন্ন সেক্টর ও ব্যাটালিয়নে মোতায়েনকৃত সেনা কর্মকর্তাদের দীর্ঘদিন ধরে তাড়িয়ে

---

[৯] The New Age, Dhaka, 24 May, 2009.

[১০] দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা, ১৯ জুন, ২০০৯।

www.pathagar.com

বেড়ায়। বিডিআর সদর দফতরে সাংবাদিক সম্মেলনে বিডিআর এর অপারেশন ও প্রশিক্ষণ শাখার পরিচালক কর্নেল জাহাঙ্গীর কবির তালুকদার বলেছেন যে, মোতায়েনকৃত বিডিআর জোয়ানদের প্রতি আস্থার অভাবে রাজধানীর বাইরের ৫৪টির মধ্যে ১৪টি স্থানে নিযুক্ত সেনা কর্মকর্তারা রাতে কর্মস্থলে অবস্থান করাকে নিরাপদ বলে মনে করেন না।[১১]

এসব সেক্টর ও ব্যাটালিয়নের সদর দফতর যশোর, খুলনা, টেকনাফ, বিডিআর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বায়তুল আমান বলিয়াপাড়া, নাইখংছড়ি প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত।[১২]

কর্নেল বলেন, ঐসব স্থানে নিয়োজিত সেনা কর্মকর্তারা দিনের বেলা কর্মস্থলে কাজ করেন এবং সরকারী ভাবে প্রদত্ত কর্মস্থলের বাসগৃহ ত্যাগ করে অন্যত্র রাতি যাপন করেন।

অরক্ষিত সীমান্ত মাদক ও অস্ত্রচোরাচালানী ও সাধারণ মানুষ অবাধে ব্যবহার করছে। জঙ্গী, নক্সাল ও উত্তর-পূর্ব ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদীরা এই সীমান্ত ব্যবহার করবে। তারা এখন উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে বাংলাদেশে কিংবা নেপাল থেকে বার্মায় নির্ভয়ে যাতায়াত করতে পারে।[১৩]*

---

[১১] The Daily Star, Dhaka, 19 June, 2009.

[১২] আমার দেশ, ঢাকা, ১৯ জুন, ২০০৯।

[১৩] Jyoti Rahman, Forum -- a monthly publication of 'The Daily Star', Dhaka, April, 2009.

www.pathagar.com

বিভিন্ন মহলের প্রতিক্রিয়া

বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনী, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে দুর্বল করে এর অস্তিত্ব বিপন্ন করার উদ্দেশ্যে পিলখানায় বিডিআর সদর দফতরের এ বিপর্যয় ঘটানো হয়েছে। বাংলাদেশী জনগণ বিশেষত: সামরিক বিশেষজ্ঞ ও বিশ্লেষকরা এ বিপর্যয়ের পেছনে একটি অদৃশ্য বিদেশী শক্তির চক্রান্ত সক্রিয় ছিল বলে মনে করেন। বিডিআর'এর সাবেক মহাপিরচালক মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রেজ্জাকুল হায়দার একটি বাংলা সাময়িকীর সাথে এক সাক্ষাতকারে বলেছেন, আমি কোনভাবেই বিশ্বাস করতে পারছিনা যে, বিডিআর জোয়ানরা তাদেরকে নেতৃত্ব ও পরিচালনাকারী সেনা কর্মকর্তাদেরকে এমন নির্দয়ভাবে হত্যা করতে পারে। জোয়ানদের দাবীতে এমন কিছু ছিল না, যার প্রেক্ষিতে তারা আইন হাতে নিয়ে তাদেরকে খুন করতে পারে। এর সাথে অবশ্যই কোন (চক্রান্তকারী) জড়িত ছিল।[১]

বিডিআর গঠনে সেনা কর্মকর্তাদের অবদানের প্রতি ইঙ্গিত করে সাবেক মহাপরিচালক বলেন, সেনাবাহিনীর যোগ্য নেতৃত্বের কারণেই বিগত বছরগুলোতে বিডিআর এমন গৌরবজনক প্রশংসা অর্জন করে। বিডিআর এখন সুসংগঠিত সংস্থা, যা কমবেশী সেনাবাহিনীর মতোই। তাদের প্রশিক্ষণই এর যথার্থতা প্রমাণ করে। তাদেরকে সেনাবাহিনীর পোশাক পরানো হলে, কেউই বলবে না যে, তারা বিডিআর জোয়ান। তারা কেবল পোশাকেই বিডিআর। বস্তত: উভয় সংস্থার গুণগত মান প্রায়ই সমান সমান। বিডিআর জোয়ানদের দায়িত্ব সীমান্ত পাহারা দেয়া। অন্যদিকে কোন দেশের সাথে যুদ্ধ শুরু হলে বিডিআর জোয়ানরা সেনাবাহিনীর অংশ হিসেবেই কাজ করবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি দু:খ প্রকাশ করে বলেন, সেনা কর্মকর্তাদের প্রতি বিডিআর জোয়ানদের যে আস্থা বিদ্যমান ছিল তা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করে। তারা বারংবার দেশকে বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা করেছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ধ্বংস হলে কারা উপকৃত হবে? এ দুঃখজনক ঘটনায় কারা ক্ষতিগ্রস্ত এবং কারা লাভবান হবে?

---

[১] সাপ্তাহিক, ঢাকা, ৫ মার্চ, ২০০৯।

www.pathagar.com

বিডিআর মহাপরিচালকের সীমাবদ্ধতা ব্যাখা করে তিনি বলেন, বিডিআর প্রধান জোয়ানদের দাবী পূরনে যথাযথ কর্তৃপক্ষ নন। তাদের দাবী পূরণের দায়িত্ব সরকারের। মহাপরিচালকের দায়িত্ব হলো কোন দাবী থাকলে তা সরকারকে জানানো। প্রত্যেক সরকারই দাবীর পর দাবী পূরণ করে চলেছেন এবং বিডিআর জোয়ানদের সুযোগ- সুবিধা ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। প্রত্যেক মাসে বিডিআর'এর দরবার অনুষ্ঠিত হয়। যে কোন বিডিআর জোয়ান তার সমস্যাদি উত্থাপন করে মহাপচিলকের সাথে খোলামেলা কথা বলতে পারেন। সুতরাং দাবী পূরণের অজুহাতে হাতে অস্ত্র তুলে নেয়ার প্রয়োজন ও সুযোগ নেই। এই বিপর্যয়ের পেছনে অন্য আরো কারণ এবং শক্তি সক্রিয় ছিল।

বিডিআর'এর আরেক সাবেক মহাপরিচালক মেজর জেনারেল (অবসর প্রাপ্ত) আনোয়ার হোসেন বাংলাদেশের প্রভাবশালী দৈনিক পত্রিকা 'ইত্তেফাক' এর সাথে আলাপকালে এই হত্যাকান্ডকে বিশ্বের মধ্যে লোমহর্ষক জঘন্যতম হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এই হত্যাকান্ডের মূল উদ্দেশ্যে ছিল: সেনাবাহিনী ও বিডিআরকে সাংঘর্ষিক অবস্থায় মুখোমুখি দাঁড় করানো, বাংলাদেশের সমৃদ্ধি প্রতিহত এবং দেশের ভেতর নৈরাজ্য সৃষ্টি করা।[২]

তিনি বলেন, এই নির্মম হত্যাকান্ড কোনভাবেই বিডিআর জোয়ানদের মস্তিষ্ক থেকে আসেনি। এ ঘটনার পেছনে কোন বহির্শক্তি জড়িত ছিল। তাদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে দেশকে চরম সংকটে ঠেলে দেয়ার উদ্দেশ্যে স্বার্থন্বেষী মহল এ চক্রান্ত পাকিয়েছে।

উচ্চ পদস্থ সাবেক সেনা কর্মকর্তা ও প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকরা এই হত্যাকান্ডকে দীর্ঘদিনের গোপন চক্রান্তের প্রতিফলন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাদের মতে, এমন একটি বিপর্যয়ের নীল-নকশা প্রণয়ন বিডিআর জোয়ানদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। একটি শীর্ষ স্থানীয় বাংলা সাময়িকী 'সাপ্তাহিক ২০০০' এ ঘটনার ওপর সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গের মতামত তুলে ধরেছে।

সাবেক সেনাবাহিনী প্রধান লে. জেনারেল মাহাবুবুর রহমান বিডিআর এর সেনা কর্মকর্তাদের খুনের ব্যাপারে অত্যন্ত খোলামেলা মন্তব্য করেন।

---

[২] দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ৩ মার্চ, ২০০৯।

www.pathagar.com

বিডিআর জোয়ানদের ছদ্মাবরণে বহিরাগতরা এই অভিযানে অংশ নিয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। অবসরপ্রাপ্ত মেজর আকতার আহমেদ বলেন, বহির্শক্তির মদদ ব্যতীত বিডিআর জোয়ানরা এমন দু:সাহসিক প্রলয় ঘটাতে পারতনা। অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহিম মনে করেন, বিডিআর সেক্টরসমূহকে নেতৃত্ব শূন্য করার নীল-নকশা সাধারণ বিডিআর জোয়ানদের পক্ষে প্রস্তুত করা সম্ভব নয়। এই নীল-নকশার অন্যতম উদ্দেশ্যে ছিল বাংলাদেশকে সাময়িকভাবে বিশৃংখল করা। অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল আমিন আহমেদ মনে করেন, বিশেষ একটি চক্র এক টিলে দুই পাখী মারার চক্রান্ত করেছিল। তারা আমাদের সুশৃংখল সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে কলঙ্কতি, হেয়, ঘৃণিত ও দুর্বল করত: দেশে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটিযে বিডিআর ও সেনাবাহিনীকে মুখোমুখি অবস্থানে নিয়ে আসতে চেয়েছিল।

ড.ফখরুদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বধায়ক সরকারের অন্যতম উপদেষ্টা সুলতানা কামাল বলেন, ইহা সমগ্র দেশ এবং গণতন্ত্রের ওপর একটি মরণাঘাত বিশেষ। এই গণহত্যা কেবলমাত্র দাবী আদায়ের উদ্দেশ্যেই ঘটানো হয়নি, বরং গভীর ও সুসংবদ্ধ চক্রান্ত থেকেই সংঘটিত হয়েছে। খুন করার ধরন, লাশ গুম করা, রেকর্ড রুমে মালখানায় আগুন লাগানো, মহিলাদের ওপর অত্যচার এবং তাদের সর্বস্ব লুট করাকে কি দাবী আদায়ের পন্থা বলা যাবে।

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আনু আহমেদ বলেন, এই হৃদয়-বিদারক ঘটনা কেবল বর্তমানের জন্যই নয়, দেশের ভবিষ্যদের জন্যও ঝুঁকিপূর্ণ । এই ঘটনা বিডিআরকে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এটা আমদের মনস্তাত্বিকভাবে বিব্রত করেছে। এই গণহত্যার জন্য আমাদেরকে চরম মূল্য দিতে হবে। অধ্যাপক আনু আহমেদ মনে করেন, এই লোমহর্ষক ঘটনার মাধ্যমে জনগণের আত্নবিশ্বাসকেও বিলীন করা হয়েছে।

তিনি বলেন, বিডিআর জোয়ানদের বক্তব্য থেকে বুঝা যায়, তাদের কিছু সমস্যা ছিল, মানসিক যাতনাও ছিল। সেগুলো এই প্রতিক্রিয়ার অন্যতম কারণ হতে পারে। তার প্রশ্ন, কিন্তু এমন লোমহর্ষক ঘটনা ঘটানোর জন্য তাদের কোন আইনী বা নৈতিক যুক্তি আছে কি? এর পেছনে ইন্ধন প্রদানকারী একটি চক্র সক্রিয় ছিল, যারা চেয়েছিল বাংলাদেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি হোক।

www.pathagar.com

মেজর জেনারেল সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহীম বিডিআর'এর অতীত কার্যক্রমের প্রশংসা করে বলেন, প্রতিকূল পরিবেশেও বিডিআর জোয়ানরা সঠিকভাবে নেতৃত্ব ও পরিচালনার কারণে তাদের ভারতীয় প্রতিপক্ষ বিএসএফ এর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার সক্ষমতা দেখিয়েছে। সুতরাং কমান্ড চ্যানেল যদি দুর্বল হয়ে যায়, কোন কোন মহল তাতে অবশ্যই উপকৃত হবে। এই গণহত্যায় কোন চক্র ইন্ধন যুগিয়েছে, তা চিহ্নিত করা অত্যাবশক।

সামরিক বিশেষজ্ঞ অবসরপ্রাপ্ত বিগ্রেডিয়ার জেনারেল শহিদুল আলম বলেন, আমার বিশ্বাস এই গণহত্যার পেছনে জঘন্য অভিসন্ধি এবং সর্বনাশা চক্রান্ত সক্রিয় ছিল। এটা সহজেই বোধগম্য যে, এই গণহত্যা কোনভাবেই অপ্রাপ্তিজনিত মনোবেদনার বিস্ফোরণ কিংবা বহির্প্রকাশ নয়, এবং এ ধরনের উপসংহার গ্রহণযোগ্যও নয়। আমাদের ইতিহাসে এমন লোমহর্ষক গণহত্যার নজির নেই। এতো ব্যাপক সংখ্যক সেনা কর্মকর্তা এমনকি আমদের মুক্তিযুদ্ধের সময়েও শহীদ হননি।

তিনি বলেন, "আমি বিশ্বাস করতে পারছিনা যে, যাদের সাথে আমি দীর্ঘদিন কাজ করেছি সে বিডিআর জোয়ানরা আমার বুকে গুলি চালাবে। এর পিছনে নিশ্চয়ই ইন্ধন এবং পৃষ্টপোষকতা সক্রিয় ছিল।"[৩]

পিলখানার হত্যাকান্ড বাংলাদেশের ভাব-মর্যদারকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এই ঘটনা তাদের হাতকেই আরো শক্তিশালী করবে যারা দীর্ঘদিন যাবত বাংলাদেশকে একটি সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসেবে চিত্রিত এবং চিহ্নিত করতে চেষ্টা তদবির করে আসছে।[৪]*

---

[৩] বিস্তারিত তথ্যের জন্য 'সাপ্তাহিক ২০০০', ঢাকা, ৬ মার্চ, ২০০৯ দেখুন।

[৪] হায়দার আকবর খান রণো, উপসম্পাদকীয়, আমার দেশ, ঢাকা ১০ মার্চ ২০০৯।

www.pathagar.com

বিডিআর পুনর্গঠন

এটা বিস্ময়বিহ্বল ও ভাগ্যের পরিহাস যে, ভারত বিডিআর পুনর্গঠনের প্রস্তাব দেয়ামাত্র বাংলাদেশ সরকার তাৎক্ষণিক তা গ্রহণ করেছে। সরকার অবশ্য তার ভারতমুখী দুর্নাম ঢাকার জন্য চাতুর্যের সাথে এ ব্যাপারে মায়ানমারের নামও জুড়ে দিয়েছে। মায়ানমার এ ধরনের কোন প্রস্তাব না দেয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ সরকার এককভাবে বলেছে যে, বিডিআর পুনর্গঠনের মায়ানমারের সাহায্য চাওয়া হবে। উল্লেখ্য যে, বিডিআর জোয়ানরা কেবল ভারতীয় 'বিএসএফ'কেই নয় ২০০৩ সনে ৮ জুন নাফ সংঘর্ষে মায়ানমারের নাসাকা বাহিনীকেও পরাভূত করেছে।[১]

ভারত সরকার নিশ্চিত ছিল যে, বাংলাদেশের জন্য এ প্রস্তাব যতোই আত্মঘাতি হোক না কেন, ঢাকা তা গ্রহণ করবে। তৎকালীন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তানজিম আহমেদ সোহেল তাজ এবং আরো ক'জন মন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে, ভারতের সহযোগিতায় বিডিআর পুনর্গঠিত হবে। বিস্ময়েরর ব্যাপার হলো সীমান্তে যে বিডিআর ভারতের বিএসএফ'এর সাথে যুদ্ধ করবে তা (বিডিআর) বিএসএফ'এর প্রশিক্ষণের সহযোগিতায় পুনর্গঠিত করতে ভারত কোন বিবেচনায় প্রস্তাব রেখেছে, আবার বাংলাদেশ কেন ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। একটি শত্রুবাহিনী কি করে এবং কেন তার প্রতিপক্ষকে প্রশিক্ষণ দেবে কিংবা পুনর্গঠিত করবে? ভারত যদি কোন একটি ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের সাথে সৎপ্রতিবেশীসুলভ আচরণ করতো, তাহলেও ভারতীয় প্রস্তাব মেনে নেয়ার পেছনে কিছু যুক্তি থাকত। কিন্তু ১৯৭১ সন থেকে আজ পর্যন্ত ভারতের বাংলাদেশ-বিরোধী প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য কৌশল ও আচরণ এতোই স্পষ্ট যে, এ প্রস্তাব গ্রহণ করা তো দূরের কথা এর উত্তর দেয়ারই কোন সুযোগ নেই। অতি সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও অনুধাবন করেন যে, একটি শত্রু দেশের এ ধরনের প্রস্তাব কোনভাবেই আমাদের জাতীয় স্বার্থের জন্যই সহায়ক নয়, বরং ভারত কর্তৃক প্রশিক্ষিত একটি বাহিনী বাস্তবে ভারতেরই ছায়া বাহিনীতে পরিণত হবে। আমরা এই বাহিনীর জন্য অর্থ ব্যয় করব, আর ঐ বাহিনী প্রকৃত অর্থে ভারতের জন্যই কাজ করবে এটা কেমন কথা। আর 'বিএসএফ' তো বিডিআর থেকে কোনভাবেই শ্রেষ্ঠ নয়। ১৯৭১ সনে আমরা ভারতে গিয়ে

[১] আ.ল.ম ফজলুর রহমান, দৈনিক নয়া দিগন্ত, ঢাকা, ২২ মে, ২০০৯।

www.pathagar.com

ভারতের সহযোগিতায় যুদ্ধ করেছি বলেই মুক্তিযোদ্ধা, রাজনীতিক, আমলা, বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশ ভারতপ্রেমী হয়েছে, যদিও এদের পেছনে ভারত প্রচুর অর্থ ঢালছে। আর সে অর্থ ভারত আয় করছে বাংলাদেশ থেকে।

ভারত যদি বাংলাদেশের প্রতি এতোই দয়ালু হয়ে থাকে, তবে কেন ১৯৭১ সন হতে প্রতিটি ক্ষেত্রে অন্যায়ভাবে আমাদেরকে নাজেহাল করছে। বাংলাদেশকে দরিদ্র, অস্থিতিশীল, গোলযোগপূর্ণ ব্যর্থ রাষ্ট্র হিসেবে প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে একের পর এক চক্রান্তের শিকারে পরিণত করছে। ভারত আমাদের প্রকৃত বন্ধু হলে গঙ্গাসহ সব নদীর পানি ছেড়ে দিক। চোরাচালান, সীমান্ত-সংঘর্ষ, অন্তর্ঘাতমূলক সন্ত্রাসী কার্যক্রম, রাজনৈতিক হাঙ্গামা, সর্বোপরি বাংলাদেশ-বিরোধী আগ্রাসী প্রকাশ্য ও গোপন তৎপরতা বন্ধ করুক। বিডিআর এর মতো চক্ষুশূল বাহিনীকে প্রশিক্ষণ ও পুনর্গঠনে ভারতের ইচ্ছা ও উৎসাহের পেছনে কি উদ্দেশ্যে রয়েছে? এই প্রস্তাব কোনভাবেই উদ্দেশ্যেহীন এবং চলাকলাহীন নয়। এ প্রস্তাবের মাধ্যমে ভারত এই বাস্তবতাকে খোলাসা করলো যে, বিডিআরকে নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা ও প্রশিক্ষণ দেয়ার সুযোগ প্রাপ্তির জন্য ভারত বহুদিন যাবত অপেক্ষা করেছে। এমন সুযোগ হাতের নাগালে পাবার জন্যই পিলখানায় এমন মহাদুর্যোগ ঘটানো হয়েছে।

পিলখানা মহাপ্রলয়ের পরিকল্পনা ও ইন্ধনকারী যে ভারত সে বিষয়ে সন্দেহের কোন সুযোগ নেই। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতের বাংলাদেশ বিরোধী প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য কার্যক্রমের দীর্ঘ দিনের ঘটনাপুঞ্জি বলে দেয় বিডিআর পুনর্গঠনে ও পুন:নির্মাণে ভারতের সহযোগিতার প্রস্তাব গ্রহণ নিরেট আহাম্মকি ছাড়া আর কিছুই হবেনা। ভারতের আগ্রাসী হামলা প্রতিহত করার মতো তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য সীমান্তরক্ষা ও প্রতিরক্ষা বাহিনীর অধিকারী সার্বভৌম সমৃদ্ধ বাংলাদেশ কখনই ভারতের কাম্য নয়। ভারত চায় নাম মাত্র বাহিনী-সর্বস্ব নামমাত্র স্বাধীন ভারতাশ্রিত বাংলাদেশ যাকে ধমক দিয়ে কাজ বাগিয়ে দিল্লীর অধীনে রাখা যাবে।[২]

আমাদের সীমান্ত রক্ষার পবিত্র দায়িত্বে নিয়োজিত থাকায় বিডিআর'এর প্রধান প্রতিপক্ষ হলো বিএসএফ। এমন একটি দিন যায়নি, যেদিন বিএসএফ

[২] Dr. K. M. A Malik, The Sugar-coated Position : India's offer of 'help' to restructure BDR, Bangladesh Open Source Intelligence Monitors, April 6, 2009.

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ভূখন্ডে অনুপ্রবেশ করে নিরাপরাধ বাংলাদেশীদের হত্যা কিংবা তাদের মূল্যবান মালামাল লুণ্ঠন করেনি। অথবা ভারতীয় নিষিদ্ধ পণ্য ও মুসলিম নাগরিকদের বাংলাদেশে ঠেলে দিয়ে সীমান্তে অস্বাভাবিক যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেনি। বিডিআর তাদের সীমিত শক্তি ও সরঞ্জাম কিন্তু অদম্য সাহস ও স্বদেশ প্রেম দিয়ে বিএসএফ'এর সব ধরনের উস্কানীমূলক আগ্রাসী তৎপরতা প্রতিহত করেছে। বিএসএফ কখনই বিডিআরকে কাবু করতে পারেনি কিংবা ভারতের আর্থ-কৌশলগত ফন্দি বাস্তবায়নার্থে আন্তর্জাতিক সীমান্তে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ দেয়নি। যদি বিএসএফ বাংলাদেশের বন্ধুই হয়ে যায়, তাহলে তো বিডিআর পোষার কোন প্রয়োজনই থাকে না। ভারত ভেতর থেকে বিডিআর'কে ধংস করার ফন্দি নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। বিএসএফ বিডিআর'কে তেমন দীক্ষা ও প্রশিক্ষণই দেবে, যাতে বিডিআর-বিএসএফ'এর সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে।

বিডিআর পুনর্গঠনে ভারতীয় প্রস্তাব আমাদের গালে জুতা মারার ধৃষ্ঠতাপূর্ণ আচরণের মতোই অপমানজনক। আমরা আমাদের স্বদেশকে এমন শোচনীয় অবস্থায় নিয়ে যাচ্ছি যে, যে কেউ আমাদের লাথি-তাপ্পড় মারতে দ্বিধা করবে না। আমাদের সমুদ্র সীমায় ভারত মায়ানমারের জবর দখল, আমাদের সাথে যুদ্ধ বাঁধতে মায়ানমারের দু:সাহস, মায়ানমারের আক্রমণ ঠেকাতে ভারতের কোলে আশ্রয় নেয়ার জন্য তথাকথিত প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষরের তোড়জোড়, প্রভৃতি সে ইঙ্গিতই বহন করে। আমরা শত্রুর চক্রান্ত বুঝেও না বুঝার ভান করি। শত্রুকে বন্ধু বলে প্রশংসা করে দুর্নাম কুড়াই, দেশের মঙ্গল করছি না অমঙ্গল করছি, তা জেনেও কেবল ক্ষমতা ও স্বার্থের জন্য শত্রুর শর্তের কাছে নিজের অস্তিত্ব বিকিয়ে দিচ্ছি। আমাদের নেতৃত্ব কি এখনো শিশু – যে দূরে দেখেনা, তাৎক্ষণিক ব্যক্তি স্বার্থের বিনিময়ে দেশের স্বার্থ বিকিয়ে দেয়।

বিডিআর পুনর্গঠনে ভারতীয় প্রস্তাব কোনভাবেই মূল্যমুক্ত নয়। এ পুনর্গঠনে বিনিময়ে বাংলাদেশের কাছ থেকে ভারত এমন প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সুবিধা আদায় করে নেবে, যা বাংলাদেশের জন্য সুদূরপ্রসারী আত্মঘাতী অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এর উদ্দেশ্য হলো বিডিআর'এ ভারতপন্থী ব্যক্তিবর্গ, ভারতীয় চর, এমনকি ভারতীয় নাগরিকদের অনুপ্রবেশ ঘটানো। ভারতের পরামর্শে ও সহযোগিতায় ১৯৭২ সনে রক্ষী বাহিনী গঠন করার সময় ভারত এ কাজটিই করেছিল। পুনর্গঠনের আবরণে ভারত যে বিডিআর তৈরী

www.pathagar.com

করবে, তা হবে সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় বিএসএফ'এর অনুরূপ, যারা ভারতের প্রতি অনুগত থাকবে এবং বাংলাদেশের স্বার্থের বিপরীতে ভারতের হয়ে কাজ করবে। সে পরিস্থিতিতে বিডিআর কিভাবে তার প্রতিপক্ষ বিএসএফ'কে মোকাবেলা করবে। কৃতজ্ঞাবশতঃ কিংবা অবৈধভাবে ভারতীয় আনুকল্য পাবার জন্য বিডিআর সব সময় ভারতের প্রতি নমনীয় ও অনুগত থাকবে। তারা মনস্তাত্ত্বিক ও নৈতিকভাবে বাংলাদেশের স্বার্থ রক্ষায় ভারতের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মনোবল হারিয়ে ফেলবে। বাস্তব অর্থে বিডিআর ভারতীয় স্বার্থবাহী বাহিনীতে পরিণত হবে। তেমন অবস্থায় আমাদের সীমান্ত পুরোপুরি ভারতের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত মানচিত্রেই থাকবে, বাস্তবে তা হবে ভারতের জন্য সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। এতে আমাদের পৃথক স্বাতন্ত্র্য ও অস্তিত্ব ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যাবে। সীমান্তবাসী বাংলাদেশীসহ পুরো দেশবাসী প্রকৃত স্বাধীনতা এবং ভারত-নিয়ন্ত্রিত নামমাত্র স্বাধীনতার মধ্যকার পার্থক্য ভুলে যাবে। আর আমাদের শিল্প-কলকারখানা অর্থনীতি বিপর্যয়ের কোন গহ্বরে পতিত হবে তা অনুমান করাও কঠিন। আমাদের বিশ্বাস করার কোন সুযোগ নেই যে, ভারত বিডিআর'এ তার 'চর' ঢুকিয়ে একে ভারতের স্বার্থবাহী বাহিনীতে পরিণত করবেনা। বিডিআর পুনর্গঠনে ভারতীয় প্রস্তাব কিংবা সহযোগিতা আমাদের জন্য চরম আত্মঘাতি হবে। ভারতীয় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বিডিআর জোয়ানরা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রেষণে নিযুক্ত কর্মকর্তাদের নেতৃত্ব, নির্দেশ ও কর্তৃত্বের প্রতি সম্মান দেখাবেনা, কিংবা তাদের নির্দেশ পালন করবেনা।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ভারত বাংলাদেশের বিভিন্ন অঙ্গনে ব্যাপক সংখ্যক 'চর' সৃষ্টি করেছিল। সে 'চর'রা এখনো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভারতের স্বার্থ রক্ষা করে চলেছে। সে ধারাবাহিকতায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের সন্তানরাও ভারতীয় সেবাদাস হিসেবে ভারতের হয়ে কাজ করছে। ফলে এরা বাংলাদেশ থেকে সার্বিক সুবিধা ভোগ করেও ভারতের বাংলাদেশ-বিরোধী নীতি ও চক্রান্ত প্রতিহত না করে, বরং তা মেনে নিচ্ছে। তাদের মনস্তত্ত্বে এমন অনুভূতি জন্ম নিয়েছে যে, ক্ষমতায় আসতে হলে এবং ক্ষমতায় থাকতে হলে ভারতের আনুকল্য অপরিহার্য। এই মানসিকতা ও আনুগত্যের অবসান হওয়া জরুরী। বিডিআর পুনর্গঠনে ভারতীয় পরামর্শ ও সহযোগিতার প্রস্তাব গ্রহণ তেমন ভারতমুখী আনুগত্য ও পদক্ষেপ হিসেবেই বিবেচিত হবে।

www.pathagar.com

দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে বিডিআর ব্যতিক্রমধর্মী উচ্চ প্রশিক্ষিত সুশৃংখল বাহিনী হিসেবে পরিচিত। গুণগত মান, দক্ষতা, প্রশিক্ষণ, সাহসিকতা ও রণকৌশলে বিএসএফ কোনভাবেই বিডিআর এর সমপঙক্তীয় নয়। সর্ব বিবেচনায় বিএসএফ ও বাংলাদেশ পুলিশ একই পর্যায়ভুক্ত। পার্থক্য একটাই তা হলো বিএসএফ যে বিপুল অস্ত্র সম্ভারে সুসজ্জিত– বাংলাদেশ পুলিশ তেমনটি নয়। এই কারণেই বিএসএফ বিডিআর এর তুলনায় বিপুল অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত হওয়া সত্বেও কখনোই বিডিআর এর ওপর ছড়ি ঘুরাতে পারেনি। অন্যদিকে বিডিআর জোয়ানরা তাদের সীমিত সম্পদ ও শক্তি দিয়ে প্রতিনিয়ত বিএসএফ'এর আগ্রাসী তৎপরতা প্রতিহত করছে এবং একাধিকবার বিএসএফ'কে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছে। পদুয়া ও বড়ইবাড়ী সীমান্তে ভারত যে লজ্জাজনক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তার প্রতিশোধ নিয়ে বিডিআরকে দুর্বল ও অকেজো করার উদ্দেশ্যেই ভারত বিডিআর সদর দফতরে এই নারকীয় কান্ড ঘটানোর নীল-নকশা এঁটেছিল।

এতদসত্বেও অধিকাংশ দেশপ্রেমিক বিডিআর জোয়ান এই বাহিনীর মান-মর্যাদা পুনরুদ্ধারে বদ্ধপরিকর। ঢাকার ইংরেজী দৈনিক 'দ্য নিউ এজ' 'Border guards anxious about their job, future: Opposed to change its name, uniform, logo and motto' শিরোনামে যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে তাতে সীমান্তে মোতায়েনকৃত বিভিন্ন বিডিআর জোয়ানদের মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি বেরিয়ে এসেছে।

দৈনিকটির প্রতিনিধিরা বেশ কিছু বিডিআর জোয়ানের সাক্ষাতকার গ্রহণ করেছে, যারা বিডিআর পুনর্গঠনের নামে ভারতীয় সহযোগিতা নেয়ার প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেছে। পত্রিকাটি জানিয়েছে, ঢাকায় বিডিআর সদর দফতরে ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারী ঘটা বিদ্রোহের পর বিডিআর পুনর্গঠনে সরকারের উদ্যোগে সীমান্তে কর্মরত রক্ষীরা হতাশ ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে।

সাতক্ষীরার বৈকারি ভোমরা, যশোরের বেনাপোল, লালমনিরহাটের মোগলঘাট, দুর্গাপুর ও বানিয়াত্রি এবং সিলেটের শ্রীপুর ও জয়ন্তিয়াপুর সীমান্তে সরেজমিনে দেখা গেছে যে, সীমান্ত অঞ্চলের জওয়ানরা উদ্বিগ্ন ও নিরাশ অবস্থায় রয়েছে।

www.pathagar.com

সীমান্ত নিরাপদ রয়েছে, জোয়ানরা এমন দাবী করলেও স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ সাম্প্রতিক দিনগুলোতে আন্তঃসীমান্তে চোরাচালানী বেড়ে গেছে, যেহেতু বিডিআর জোয়ানরা দুশ্চিন্তার মধ্যে সীমান্তে পাহারা দিচ্ছে।

বিডিআর পুনর্গঠনে সরকারের উদ্যোগে হতাশা ব্যক্ত করে সীমান্ত রক্ষীরা বলেছে তারা সংবাদ মাধ্যমে এবং তাদের সহকর্মীদের কাছ থেকে সরকারের উদ্যোগের কথা শুনে তাদের চাকরী ও ভবিষ্যত নিয়ে উদ্বিগ্ন।

১৯৭১ সনে স্বাধীনতা যুদ্ধ থেকে শুরু করে জাতীয় নিরাপত্তা সংরক্ষণে বাংলাদেশ রাইফেলস এর কর্মতৎপরতাকে একটি গৌরবময় স্মারক হিসেবে বর্ণনা করে তারা বলেন, পুনর্গঠনের নামে এই চৌকস আধা-সামরিক বাহিনীকে ধ্বংস করা উচিত হবে না।

বাংলাদেশ রাইফেলস'এর পুনর্গঠনে প্রতিবেশী দেশসমূহের সহযোগিতা গ্রহণের প্রশ্নে কতিপয় মন্ত্রীর প্রকাশ্য মন্তব্যের সাথে তারা দ্বিমত প্রকাশ করেছেন। তাদের মতে, এ ধরনের সহযোগিতা জাতীয় নিরাপত্তার জন্য বিপর্যয়কর হবে। তারা বলেন, বিডিআর পুনর্গঠনে প্রতিবেশী দেশসমূহের কাছ থেকে সাহায্য নেয়া বুদ্ধিমত্তার কাজ হবেনা। কেননা তারা আমাদের প্রতিপক্ষ।

দৈনিকটির লালমনিরহাট প্রতিনিধি জানান, সীমান্ত জুড়ে সীমান্ত রক্ষীদের অধিকাংশই বিডিআর পুনর্গঠনের খবর শুনে মোটেই খুশী নয়।

'নিউ এজ' এর যশোর সংবাদদাতা জানান, বেনাপোল সীমান্ত চেকপোষ্টের জওয়ানরা তাদের ভবিষ্যত নিয়ে উদ্ধিগ্ন ও সন্ত্রস্ত অবস্থায় তাদের দায়িত্ব পালন করছে।

বেনাপোল বন্দরের কিছু পুলিশ জানিয়েছে, সম্ভাব্য গ্রেফতার হবার ভয়ে বিডিআর জোয়ানরা সন্ত্রস্ত্র, সীমান্তে মোতায়েনকৃত বিডিআর জোয়ানরা বিদ্রোহের সাথে জড়িত নয়। জোয়ানরা জানিয়েছে বিডিআর পুনর্গঠনে সরকারের উদ্যোগে তারা তাদের চাকরির ব্যাপারে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ।[৩]

বিডিআর'এর সাবেক মহাপরিচালক মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) ফজলুল রহমান বিডিআর'এর পুনর্গঠনের বিদেশী সাহায্য গ্রহণের প্রস্তাব প্রত্যাখান করে বলেছেন, ভারত ও মায়ানমার আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র। বিডিআর এর

---

[৩] The New Age, Dhaka, 24 May, 2009.

www.pathagar.com

সাহায্যে সীমান্তে আমরা তাদেরকে মোকাবেলা করি। এই বাহিনীর নিজস্ব পরিকল্পনা রয়েছে। এ পরিকল্পনা একান্তভাবেই আমাদের নিজস্ব অতি গোপনীয় দলিল। এই বাহিনীর পুনর্গঠনে বাইরের হস্তক্ষেপ কিছুতেই কাঙ্খিত ও প্রত্যাশিত নয়। আমরা এ ব্যাপারে কিছুতেই কোন ধরনের বাইরের সাহায্য নিতে পারিনা।

বিদ্যমান বিডিআর'কে পুনর্গঠনের আমরা কারো সহযোগিতা চাইনি। বিডিআর'এর পুনর্গঠনের ভারতের সহযোগিতা নেয়ার মানে হলো ভারতীয় টাটা কোম্পানীর গাড়ীতে চড়ে ভারতীয় সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াই করা।[৪]

বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতের বাংলাদেশে বিরোধী প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য কর্মকান্ড বিবেচনা করলে দেখা যায়, বিডিআর পুনর্গঠন ও পুন:নির্মাণে ভারতের সাহায্য প্রস্তাব গ্রহণ হবে চরম নির্বুদ্ধিতা। ভারতের দীর্ঘ মেয়াদী নীল-নকশা অনুধাবন করে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের উচিত ভারতের প্রস্তাব প্রত্যাখান করা। সর্বোপরি, মনে রাখতে হবে ভারত সরকারের নির্দেশে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' বিডিআর সদর দফতরে নারকীয় হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে।*

[৪] আ.ল.ম ফজলুজ রহমান, দৈনিক নয়া দিগন্ত, ঢাকা, ২২ মে, ২০০৯।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

তদন্ত কার্যক্রম

বিডিআর বিদ্রোহ তদন্তে সেনাবাহিনী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও সিআইডি পৃথক পৃথক তিনটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। গঠনকালে প্রতিটি তদন্ত কমিটিকে তাদের রিপোর্ট জমা দেয়ার সুনির্দিষ্ট সময়-সীমা বেঁধে দেয়া হয়। কিন্তু কোন কমিটিই প্রথমে বেঁধে দেয়া সময়ে প্রতিবেদন জমা দেয়নি।

সেনাবাহিনী নেতৃত্বাধীন তদন্ত প্রতিবেদন :

পিলখানায় নারকীয় হত্যাকান্ডের পর লে.জেনারেল জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর নেতৃত্বে ২০-সদস্য বিশিষ্ট সেনা তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। সর্বশ্রেণীর মানুষের প্রত্যাশা ছিল, এই তদন্ত কমিটি প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটন করবে : এই নারকীয় হত্যাকান্ডের নেপথ্য হোতা কারা ? কে কে এর সাথে জড়িত ছিল? তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্যে কি ছিল? এবং এতে কারা উপকৃত হয়েছিল? পিলখানা বিপর্যয়ের ব্যাপারে কতিপয় মন্ত্রীর বিভ্রান্তিকর নিজস্ব বক্তব্য শুনে সাধারণ জনগণ আরো বেশী কৌতুহলী হয়ে প্রকৃত তথ্য জানার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। তাদের বিশ্বাস ছিল, সেনা তদন্ত দল পুঙ্খানুপুঙ্খ যথার্থ তদন্তের মাধ্যমে অন্ততঃ পিলখানা মহাবিপর্যয়ের সত্যিকার চিত্র তুলে আনবে এবং সব ধরনের বিভ্রান্তি, দ্বিধা-দ্বন্ধ. এবং ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলসমূহের অভিযোগ ও পাল্টা-অভিযোগ, প্রভৃতি দূরীভূত করবে।

আড়াইমাসব্যাপী ব্যাপক তদন্তের পর সেনা তদন্ত দলের প্রতিবেদন তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান মঈন ইউ আহমেদের কাছে জমা দেয়া হয়। কিন্তু এ প্রতিবেদনের বিষয়বস্তুর কিছুই জনসমক্ষে প্রচার করা হয়নি। এর ফলে এক শ্রেণীর সংবাদপত্র বিভিন্ন সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে তদন্ত প্রতিবেদন প্রসঙ্গে কিছু মন্তব্য প্রকাশ করে। তাদের মতে, পিলখানা ঘটনার অনেক বিষয়ে তদন্ত চালানোর স্বাধীনতা সেনা তদন্ত কমিটির ছিল না। সরকার কর্তৃক বেঁধে দেয়া চৌহদ্দি ও সীমাবদ্ধতার মধ্যে সেনা তদন্ত দল সম্পূর্ণ ক্ষমতাহীনভাবে কেবলমাত্র সরকারী নির্দেশ মোতাবেক নামমাত্র তদন্ত চালাতে বাধ্য হয়েছে। পত্র-পত্রিকার এমন মন্তব্যে জনগণ মারাত্মকভাবে হতাশ ও উদ্বিগ্ন হয়েছে। কারণ এর ফলে এ হত্যাকান্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট বিদেশী হোতাদের এবং তাদের স্থানীয় 'চর'দের চিহ্নিতকরণসহ বহু স্পর্শকাতর বিষয়ে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্ত চালানো সম্ভব হয়নি।

www.pathagar.com

ঢাকার একটি নেতৃস্থানীয় বাংলা দৈনিক 'মানব জমিন' (১৩ মে, ২০০৯) অভিযোগ করেছে যে, সরকারী বাধ্যবাধকতা এবং গাইডলাইন মানতে বাধ্য থাকার প্রেক্ষিতে সেনা তদন্ত দল তদন্তে বেরিয়ে আসা অনেক স্পর্শকাতর বিষয় প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে পারেনি। যেসব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এ ঘটনার সাথে জড়িত ছিল, তাদের নামও তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়নি। তদন্ত দলের সে সব বিষয়ে তদন্ত করার কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা ছিল না। তদন্তে গুরত্বপূর্ন ব্যক্তিদের নাম বিভিন্নভাবে আসলেও তদন্ত প্রতিবেদন সে আলোকে প্রস্তত করা হয়নি। কারণ মদদদাতা ও উস্কানীদাতাদের অনুসন্ধান চালানোর অধিকার তদন্ত কমিটিকে দেয়া হয়নি। তদন্ত কমিটি তাদের ব্যাপারে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেছে। অন্য একটি বাংলা দৈনিক সুনির্দিষ্টভাবে লিখেছে, সরকারের চাহিদা মোতাবেক তদন্ত প্রতিবেদন তৈরী করা হয়। প্রতিবেদনে অনেক তথ্যই স্থান পায়নি, কেননা সেগুলো সেনা তদন্ত দলের চৌহদ্দির বাইরে ছিল।[১]

বিডিআর এর সাবেক মহাপরিচালক মেজর জেনারেল ফজলুর রহমানের মন্তব্য, সেনাবাহিনীর নেতৃত্বাধীন তদন্তের ক্ষেত্রে সরকার কিছু গাইডলাইন বেঁধে দিয়েছিল। তদন্ত দল সে গন্ডির বাইরে যেতে পারেনি।[২]

কমিটি বিডিআর জোয়ানদের দাবী-দাওয়ার প্রশ্নে তাদের সাথে শাসক দলের নেতৃবৃন্দের বৈঠকের সুস্পষ্ট প্রমাণ ও দলিল সংগ্রহ করেছে। বিডিআর'এর অবৈধ প্রতিনিধিরা কোথায়, কখন কার সাথে দেখা করেছে– সেসব তথ্যও সংগ্রহ করা হয়েছে। এসব তথ্যের কিছুই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়নি। এই হত্যাকান্ড সংঘটনে বাইরের কোন দেশ থেকে অর্থ এসেছে, তা উদ্‌ঘাটন করার ক্ষমতা তদন্ত দলকে দেয়া হয়নি।[৩]

বিডিআর জোয়ানদের অসন্তোষ ও দাবী সম্পর্কে প্রতিবেদনে বলা হয় যে, চক্রান্তকারীরা চাতুর্যের সাথে এগুলো সেনাবিরোধী আবহ সৃষ্টিতে ব্যবহার করেছে। সেনা তদন্ত দলের সদস্যরা এ ধরনের শপথে আবদ্ধ ছিলেন যে, তারা তদন্ত প্রতিবেদনের কোন তথ্য সংবাদ মাধ্যম কিংবা সেনাবাহিনীর

---

[১] দৈনিক আমার দেশ, ঢাকা, ১৪ মে, ২০০৯।

[২] Weekly Probe, Dhaka, 29 May, 2009.

[৩] মানব জমিন, ঢাকা, ১৩ মে, ২০০৯।

www.pathagar.com

বাইরের কারো কাছে প্রকাশ করতে পারবেন না। ১০ মে (২০০৯) এ ধরনের একটি হলফনামায় তাদেরকে সই করতে হয়।[৪]

এমন পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বাধীন তদন্ত দলকে পূর্বশর্ত দিয়ে মূলতঃ বেঁধে ফেলা হয়। ফলে এ বিপর্যয়ের পেছনের বহির্শক্তির ব্যাপারে তদন্ত করতঃ চিহ্নিত করার এখতিয়ার তদন্ত কমিটিকে দেয়া হয়নি।

সেনা তদন্ত দলের তদন্ত ও প্রতিবেদনকে কেন্দ্র করে কোন কোন দৈনিকের মন্তব্য ও অনুমান সরকারের ভাবমর্যাদাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে। সংবাদপত্রের মন্তব্য ও তথ্য বিকৃত ও অসত্য – এমন ধরনের কোন প্রতিবাদ তাৎক্ষণিক সেনাবাহিনীর কাছ থেকে আসেনি। এ অবস্থায় সংবাদপত্রের ঐ সব মন্তব্যকে কতিপয় মন্ত্রী কাল্পনিক উপাখ্যান বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। বাণিজ্যমন্ত্রী লে. কর্ণেল (অব.) ফারুক খানকে সাংবাদিকরা এ মর্মে প্রশ্ন করে যে, যদি পত্রিকায় প্রকাশিত ঐসব তথ্য ও মন্তব্য অসত্য ও ভিত্তিহীন গল্পই হয়ে থাকে, তবে সেনা তদন্ত দল কেন সেগুলো প্রত্যাখান করে প্রতিবাদ করছেনা। এ প্রশ্নের মুখে পড়ে গ্রহণযোগ্য কোন উত্তর না দিয়ে বাণিজ্যমন্ত্রীকে উঠে যেতে দেখা গেছে। এ অবস্থায় ক'দিন পরেই আইএসপিআর থেকে এক প্রেস নোটে দাবী করা হয় যে, কোন কোন দৈনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুমান নির্ভর ও ভিত্তিহীন। আইএসপিআর'এর এমন দাবী জনগণের কৌতুহল নিবৃত্ত করতে পারেনি।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তদন্ত কমিটিঃ বিডিআর সদর দফতরে সেনা কর্মকর্তা নিধনের বিষয়ে তদন্ত করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অবসর প্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব আনিসুজ্জামানের নেতৃত্বে ১২ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। অন্যান্যের মধ্যে বিডিআর'এর মহাপরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর প্রতিনিধি এবং এডভোকেট জেনারেল এ কমিটিতে অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।

উল্লেখ্য যে, এর আগে ২৬ ফেব্রুয়ারী (২০০৯) স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এডভোকেট সাহারা খাতুনের নেতৃত্বে ২৬-সদস্য বিশিষ্ট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তদন্ত কমিটি গঠন করা হলে বিভিন্ন মহল হতে প্রবল আপত্তি ও প্রতিবাদ উঠলে সে কমিটি বাতিল করে ০২ মার্চ আনিসুজ্জামানের নেতৃত্বে নতুন কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটিকে

[৪] মানব জমিন, ঢাকা, ১৩ মে, ২০০৯।

www.pathagar.com

সাত দিনের মধ্যে তদন্ত কাজ সম্পন্ন করে ৯ মার্চ তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে প্রতিবেদন তৈরী করতে ব্যর্থ হওয়ায় এর সময় সীমা মোট চারবার পরিবর্তিত ও পুন:নির্ধারিত হয়।[৫]

প্রতিবেদন জমা দেয়ার প্রথম সময়-সীমা ছিল ৯ মার্চ (২০০৯)। পরে কমিটিকে আরো সাত কার্যদিবস সময় দেয়া হয়। ২৩ মার্চ কমিটি আরো চারদিন সময় পায়। ৩০ মার্চ (২০০৯) কমিটিকে একমাস সময় বাড়িয়ে দেয়া হয়, যাতে কমিটি পিলখানা সেনা কর্মকর্তা নিধনের যথাযথ তদন্ত চালাতে পারে।[৬]

কমিটির চেয়ারম্যান সাবেক আমলা তদন্ত প্রতিবেদন প্রসঙ্গে বলেন, আমরা যা শুনেছি, যা দেখেছি এবং যা কিছু অনুধাবন করেছি, সে ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছি, এটা কোনভাবেই অনুমান কিংবা গুজব-ভিত্তিক নয়।

কমিটি প্রমাণ পেয়েছে, বিদ্রোহীরা বিডিআর'এর মহাপরিচালক ও উপ-মহাপরিচালকসহ ৫৭ জন সেনা কর্মকর্তাকে খুন করেছে, অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেছে, সেনা কর্মকর্তাদের মালিকানাধীন ১৬টি গাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে, অন্য ১৮টি গাড়ী ভাঙ্গচুর করেছে, কর্মকর্তাদের আবাসগৃহ লুণ্ঠন করেছে এবং তাদের স্ত্রী-কন্যাদের অত্যাচার করেছে।

তদন্ত প্রতিবেদনের মতে, বিদ্রোহের দিন ২৫ ফেব্রুয়ারী (২০০৯) ১৩৩ জন সেনা কর্মকর্তা আগে থেকেই সদর দফতরে নিয়োজিত ছিলেন। বাকী ৪৭ জন বিডিআর সপ্তাহ উপলক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে এসেছিলেন।

খুন হবার হাত থেকে রক্ষা পান তিনজন লে. কর্ণেল, ১৪ জন মেজর, আর্মি মেডিকল কোরের ১৫ জন কর্মকর্তা, ডাল-ভাত কর্মসূচীর পাঁচজন মেজর, বার্ষিক কুচকাওয়াজে অংশ নিতে আসা একজন মেজর, দাওয়াতপত্র বিতরণ করতে আসা পাঁচজন মেজর, পুরস্কার নিতে আসা সাতজন মেজর, আটজন আঞ্চলিক কর্মকর্তা এবং ১৪ জন বেসামরিক বিডিআর কর্মকর্তা।[৭]

---

[৫] The Bangladesh Today, Dhaka, 22 May, 2009.

[৬] The New Nation, Dhaka, 22 May, 2009.

[৭] Shahiduzzaman, BDR Massacre : Summery of the Government Investigation Report, Bangladesh Open Source Intelligence Monitors, 24 May, 2009.

www.pathagar.com

আনিসুজ্জামান দাবী করেছেন, সত্য ও বাস্তবের ওপর ভিত্তি করে আমরা প্রতিবেদন তৈরী করেছি অনুমান ভিত্তিক কিছুই নেই।[৮]

কমিটি মনে করে, বিদ্রোহের কারণ ও উদ্দেশ্য এবং এ ঘটনার পেছনের লোকদের চিহ্নিত করা কঠিন এবং সময় সাপেক্ষ ব্যাপার।

তদন্ত কমিটি একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় দেখতে পেয়েছে যে, বহু বিডিআর জোয়ান ও বেসামরিক ব্যক্তি ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারীর পিলখানা হত্যাকান্ড, লুণ্ঠন এবং অন্যান্য অপরাধের পরিকল্পনার সাথে জড়িত ছিল।[৯]

তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয় ,অতি সাধারণ দাবীকে সামনে রেখে পর্দার আড়ালে মুখ্য রূপকাররা দেশকে অস্থিতিশীল করার জন্য কলকাঠি নেড়েছিল। তদন্ত প্রতিবেদনে মন্ত্রণায়লয়ে জমা দেয়ার পর চারদিক থেকে সমালোচনা উঠতে থাকলে ২৭ মে (২০০৯) সরকার সাংবাদিক সম্মেলনে ৩০৯ পৃষ্ঠা-সম্বলিত তদন্ত প্রতিবেদনের সরকারের পছন্দকৃত মাত্র সাত পৃষ্ঠা প্রকাশ করে। এতে প্রমাণিত হয় যে, তদন্তে প্রাপ্ত অনেক তথ্যই সরকার গোপন রাখতে চায়। এতে সরকারের স্বচ্ছতা ও সততা অনেকাংশে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদনের আসল বিষয়গুলো গোপন রাখার চেষ্টা করা সত্বেও তথ্যানুসন্ধানী সাংবাদিকদের প্রচেষ্টায় এর অনেক কিছু ফাঁস হয়ে যায়। সেনা তদন্ত কমিটি এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তদন্ত কিমিটির প্রতিবেদনে নাকি বিদ্রোহের পেছনে বিদেশী চক্রান্তকারীরা সক্রিয় ছিল বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তদন্তের জন্য সুনির্দিষ্ট চৌহদ্দি বেঁধে দেয়ায় তদন্ত কমিটি সেসব বিষয়ে অনুসন্ধান চালাতে পারেনি।[১০]

কোন কোন বিরোধীদলীয় নেতা-নেত্রী আনিসুজ্জামান তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনকে একপেশে বলে অভিহিত করেছেন, যেহেতু বিদ্রোহে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের জড়িত থাকার প্রমাণ থাকা সত্বেও তা প্রকাশ করা হয়নি। সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তদন্ত প্রতিবেদনকে এ বলে প্রত্যাখান করেছেন যে, সরকার পছন্দমাফিক তদন্ত প্রতিবেদনের অংশ বিশেষ প্রকাশ করেছেন। এটা

---

[৮] The Bangladesh Today, Dhaka, 22 May, 2009.

[৯] Shahiduzzaman, BDR Massacre: Summery of the Government Investigation Report, Bangladesh Open Source Intelligence Monitors, 24 May, 2009.

[১০] The Holiday, Dhaka, 29 May, 2009.

www.pathagar.com

অগ্রণযোগ্য। সরকার সেনা তদন্ত প্রতিবেদনের ওপরে ঢাকনা দিয়েছে। তিনি সেনা তদন্ত দলের প্রতিবেদন জনসমক্ষে প্রকাশের দাবী জানান।

একটি বিতর্কিত প্রশ্ন হলো: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটি কি বিক্ষুব্ধ ও শোকাহত সেনা কর্মকর্তাদের, পরিবারবর্গ ও তাদের জীবিত সহকর্মীদের শান্তনা দিতে পাবে – যারা বিদ্রোহীদের সাথে সরকারের প্রশ্নবিদ্ধ আচরণে এবং অবহেলাজনিত দায়িত্বহীন পদক্ষেপে সেনা কর্মকর্তাদের প্রাণহানি ঘটেছে বলে মারাত্মক অভিযোগ এনেছিলেন? সামরিক বেসামরিক উভয় পক্ষের সহাবস্থান এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি সশস্ত্র বাহিনীর আনুগত্যকে প্রশ্নের উর্ধ্বে রাখার উদ্দেশ্যে এই স্পর্শকাতর বিষয় যথাযথ ঔদার্য ও দূরদর্শিতার সাথে এমনভাবে সমাধান করা উচিত যাতে কোন পক্ষের মনে সামান্যতম সন্দেহ জাগার সুযোগ না থাকে।[১১]

ঢাকা ইংরেজি দৈনিক 'দ্য নিউ এজ' সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলেছে তদন্ত কমিটি সম্পর্কে জনগণের মনে এমন প্রত্যাশা ছিল যে, এটা এ নারকীয় ঘটনায় জড়িতদের পরিচিতি উদঘাটন ছাড়াও প্রকৃত হোতাদের খুঁজে বের করবে।

এ হত্যাকান্ডের মূল পৃষ্ঠপোষকদের পরিচয় নির্ণয় করাও অতীব জরুরী, যাতে দেশবাসী অনাগত দিনেও এদের সম্বন্ধে সজাগ থাকতে পারে। এ লক্ষ্যে সরকারকে এ বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে হবে যে, তদন্ত সত্যিকার অর্থেই ফলপ্রসূ ও কার্যকর হচ্ছে। যতোই শক্তিধর বা প্রভাবশালী হোক না কেন তদন্তকে কোনভাবেই অদৃশ্য কোন মহলের চাপের কাছে আপোষ করতে দেয়া যাবে না।

ঢাকার আরেকটি শীর্ষ পর্যায়ের ইংরেজী দৈনিক 'দ্য ডেইলী স্টার' ২৯ মে, ২০০৯ সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখেছে, সাংবাদিকদের কাছে বিলিকৃত তদন্ত প্রতিবেদনের সাত পৃষ্ঠার সারর্মম দুর্ভাগ্যবশত: ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারীতে সংঘঠিত হত্যাকান্ডের পূর্ণাঙ্গ ঘটনার প্রকৃত চিত্র তুলে ধরতে পারেনি। সবচেয়ে আশ্চার্যজনক বিষয় হলো, তদন্ত কমিটি পিলখানায় দু:খজনক হত্যাকান্ডের পেছনের শক্তিধর অনুঘটকদের চিহ্নিত করার অক্ষমতা নিজেই স্বীকার করেছে। প্রতিবেদনে কিছু ইঙ্গিতবহ বিষয় থাকলেও সামগ্রিক অবস্থা এমন যে প্রতিবেদনটি মূলত: অপ্রামাণিক ও অনির্ণায়ক।

---

[১১] The Holiday, Ibid.

www.pathagar.com

এ প্রতিবেদনের নির্বাচিত অতি ক্ষুদ্রাংশ (২.৩%) প্রকাশ নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেপ্রণোদিত। এ চাতুর্যের মাধ্যমে সরকার দায়িত্ব পালনে স্বচ্ছতার প্রমাণ দিতে চাইছে। অথচ এ প্রতিবেদন জনগণের আশা-আকাঙ্খা প্রতিফলনে এবং রহস্য উদঘাটনে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। সরকার কর্তৃত বেঁধে দেয়া পূর্বশর্ত এ কমিটিকে হত্যাকান্ডের গুপ্ত মূল কুশলীদের মুখোশ উম্মোচনে ব্যর্থ করেছে। তদন্ত অনেকটা ছিল লোক দেখানো, যা প্রতারণা ও তামাশার শামিল।

এটা ছিল অর্থ ও সময়ের অপচয়। সরকার চায়নি প্রকৃত রহস্য উদঘাটিত হোক।

জনগণের এমন ধারণা পোষণ করার যথেষ্ঠ যুক্তি রয়েছে যে, সরকার নিশ্চিত ছিল যেকোন ধরনের স্বাধীন ও সঠিক তদন্ত পিলখানা হত্যাকান্ডের দেশী-বিদেশী অর্থায়নকারী উস্কানিদাতা ও সংগঠকদের চিহ্নিত করতে সক্ষম হবে। সরকার হয়তো জানত ঘাতকদের মূল শক্তির মুখোশ উম্মোচন সরকারের জন্যই শুভ হবে না। এ কারণেই সরকার স্বাধীন তদন্ত কমিটি গঠন না করে কেবলমাত্র হাত-পা বাঁধা তদন্ত কমিটি দিয়ে তদেন্তর নামে মূল নায়কদের ধরা–ছোঁয়ার বাইরে রেখেছে। কে জানে এমন ধরনের প্রতারণামূলক তদন্ত চালানোর নীল-নকশা হয়তো হত্যাকান্ডের আগেই প্রস্তুত ছিল।

এ ধরনের দায়-সারানো ধরনের অপূর্ণাঙ্গ তদন্ত, আবার তার আংশিক প্রকাশ, দুঃখভারাক্রান্ত বাংলাদেশের জনগণকে জানতে দেয়নি কারা কেন তাদের সোনার সন্তানদের এমন নির্মমভাবে খুন করেছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় জাননা কোন জানি-দুশমন বাংলাদেশের ওপর দুর্যোগের পর দুর্যোগ চাপিয়ে দিচ্ছে। এভাবে বাংলাদেশের দুশমনদের চিহ্নিতকরণের ও মুখোশ উম্মোচনের একটি সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেল।

তথ্যাভিজ্ঞমহলের মতে, সরকারের চাহিদা মোতাবেক সরকার নিয়ন্ত্রিত তদন্ত কমিটিগুলো তাদের সীমিত ক্ষমতা ব্যবহার করে যেসব সীমিত ও অপূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ করেছে, সরকারী চাপে সেগুলো পর্যন্ত নাকি তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা যায়নি। অভিযোগ রয়েছে যে, সরকার বিশেষভাবে সার্বক্ষণিক নজর রেখেছে যাতে তদন্ত কমিটিগুলো এ নির্মম হত্যাকান্ডের বহির্দেশীয় কুশলী ও পৃষ্ঠপোষক এবং তাদের স্থানীয় 'চর'দের চিহ্নিত করার চেষ্টা হতে সার্বিক অর্থে বিরত থাকে।

www.pathagar.com

ওয়াকার্স পার্টির (পুনর্গঠিত) নেতা হায়দার আকবর খান রণো সরাসরি সরকারকে অভিযুক্ত করে বলেন, তদন্ত প্রতিবেদন নিয়ে সরকার যা করছে তাতে বুঝা যায় যে, সরকার কোন কিছু যেন লুকানোর চেষ্টা করছে। অন্তত: জনগণ এখন সে রকমই ভাবছে।[১২]

রাষ্ট্র বিজ্ঞানী দিলারা চৌধুরী তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশের গুরুত্ব প্রসঙ্গে বলেন, এটা (পিলখানা হত্যাকান্ড) কোন সাধারণ ঘটনা নয়। সুতরাং সেনাবাহিনীর প্রতিবেদন সিআইডি'র প্রতিবেদন এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন জনসাধারণ্যে প্রকাশ করা উচিত। তাতে সব ধরনের সন্দেহ দূরীভূত হবে।[১৩]

এ বিষয়ে আলাপকালে ঢাকার প্রখ্যাত সাংবাদিক আবদুল হাই শিকদার আশংকা প্রকাশ করে প্রশ্ন রেখেছেন: তিনটি তদন্ত প্রতিবেদন অভিন্ন হবে কিনা। কাহার আখন্দের মতো একজন ব্যক্তিকে কেন এমন একটা লোমহর্ষক খুনের ঘটনার তদন্তকর্মে নিয়োগ করা হল। তিনি আরো জানতে চান, তিনটি তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন তিন প্রকার হলে সরকার কোনটিকে গ্রহণ করবেন। অন্যদিকে প্রতিবেদন জমাদানকারী দুটি তদন্ত কমিটি স্বীকার করেছে, তাদের তদন্ত অসম্পূর্ণ এবং ব্যাপক তদন্ত হওয়া দরকার।

অন্যদিকে পিলকানা হত্যাকান্ড ঘটার দশমাস পরেও সিআইডি'র তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন এখনো জমা দেয়া হয়নি। কবে প্রতিবেদন জমা দেয়া হবে, তাও সঠিক বলা যাচ্ছেনা। এই গ্রন্থের ইংরেজী সংস্করণে বাণিজ্যমন্ত্রীকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছিল জুলাই মাসের (২০০৯) শেষ দিকে ঐ প্রতিবেদন জমা দেয়া হবে। এর পর পাঁচ মাস কেটে গেল। তদন্ত কমিটিগুলোর সমন্বয়ক কি ধরনের সমন্বয় করলেন জাতি তা-ই বুঝতে পারল না।*

---

[১২] Weekly Probe, Dhaka, 29 May, 2009.

[১৩] Weekly Probe, Ibid.

www.pathagar.com

কিছু পরামর্শ

এ গ্রন্থে উপস্থাপিত বিভিন্ন ধরনের তথ্য-প্রমাণ আমাদের শিক্ষা দেয় যে, পিলখানায় নির্মম হত্যাকান্ড ভারতের বাংলাদেশ-বিরোধী নীল নকশার অংশ বিশেষ। ভারতের বহুমূখী আক্রমণাত্নক গোপন ও প্রকাশ্য তৎপরতার জন্য ভারতের কোন প্রতিবেশীই তাকে নিরাপদ মনে করে না। বাংলাদেশের মুক্তযুদ্ধে ভারতের সাহায্য-সহযোগিতা থাকা সত্বেও জনসাধারণ্যে এ বিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে যে, ভারত বাংলাদেশের অস্বিত্ববিরোধী প্রতিবেশী। যথার্থভাবেই ভারতের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ উঠেছে। রাজনৈকিত অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতা থেকে শুরু করে পিলখানা হত্যাকান্ডসহ বাংলাদেশে মানব-সৃষ্ট সব দুর্যোগের মূল হোতা হলো ভারত, কারণ বাংলাদেশকে লুণ্ঠন করা থেকে শুরু করে শিক্ষাঙ্গণ ও রাজপথে সহিংসতা, শ্রমিক অসন্তোষ থেকে শুরু করে অন্তঘার্তমূলক দুষ্কর্ম প্রভৃতি ভারতের নীল-নকশাও অর্থায়নে সংঘঠিত হয়, যার ফলশ্রুতিতে ভারত বাংলাদেশকে দরিদ্র, অস্থিতিশীল, বিশৃংখল রাখতে সক্ষম হয়েছে। তবে এসব অপকর্মের জন্য অধিকাংশ বাংলাদেশী ভারতকে তাদের জানি দুশমন মনে করে। এ মানসিকতা উদ্দেশ্যেমূলকভাবে নয়, বরং ভারতের অপকর্মের যথার্থ কারণে স্বত:স্ফুর্তভাবে সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৭১ সন হতে এ পর্যন্ত ভারতীয় নীতি নির্ধারকরা কোনভাবেই এমন একটি উদাহরণও সৃষ্টি করতে পারেনি যে, ভারত বাংলাদেশের বিশ্বাসযোগ্য নির্দোষ বন্ধু রাষ্ট্র। ভারতীয় নেতৃবৃন্দ তাদের কথায় ও কাজে প্রমাণ করেছে যে, বাংলাদেশীরা তাদের চক্ষুশূল। তবে তাদের এমন স্বপ্ন অবাস্তব যে, আগ্রাসী ও জঘন্য পন্থা অবলম্বন করে তারা বাংলাদেশকে চিরন্তনভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হবে। এমন দিন আসবে যখন বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ ভারতের সম্প্রসারণবাদী নীতি ও দুশমনির প্রত্যুত্তরে ভারতের বিরুদ্ধে ইস্পাত-কঠিন প্রতিরোধ গড়ে তুলবে, যা সমগ্র দক্ষিণ এশীয় অঞ্চল, বিশেষত ভারতের জন্য মরণবাণ হিসেবে আবির্ভূত হবে।

সুতরাং ভারতীয় নীতি-নির্ধারকদেরকে বাংলাদেশের সাথে আচরণে আরো শুভবুদ্ধি ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হতে হবে। বাংলাদেশসহ তাদের সব প্রতিবেশী দেশের ব্যাপারে তাদের সামগ্রিক নীতি ভারতের স্বার্থেই সংশোধিত ও পুন:নির্ধারিত হওয়া দরকার। ভারতীয়দের বাংলাদেশী জনগণের মনস্তত্ত্ব ও ইতিহাস আবারো পড়তে হবে। এই অঞ্চলের অন্যকোন জাতি একান্তভাবেই

www.pathagar.com

তাদের নিজস্ব স্বাধীন সার্বভৌম স্বদেশ গঠনের জন্য সশস্ত্র রক্তাক্ত যুদ্ধের মাধ্যমে তাদের পূর্ব-পুরুষদের সৃষ্ট দেশ ভেঙ্গে দেয়নি। ভারতীয় নীতি-নির্ধারকদেরকে ঐতিহাসিক বাধ্যবাধকতার দিকে ফিরে তাকাতে হবে কেন এবং কোন পরিবেশে উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলীয় মুসলমানরা একান্তভাবেই অপরিচিত পশ্চিমাংশের, মূলত বিদেশী মুসলমানদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পৃথক মুসলিম আবাস ভূমি পাকিস্তানে যোগ দিয়েছিল। কেবলমাত্র ধর্মীয় বন্ধনের কারণেই নয়, বরং পলাশী যুদ্ধ-পরবর্তী কালীন সমুদয় ইংরেজ শাসনামলে (১৭৫৭-১৯৪৭) মুসলমানদের সাথে হিন্দুদের দুর্ব্যবহার, শোষণ, নির্যাতন সর্বোপরি, প্রভু-সুলভ আচরণ আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে উপমহাদেশের পশ্চিমাঞ্চলের অচেনা মুসলমানদের সাথে হাত মেলাতে বাধ্য করেছিল। হিন্দুদের কর্তৃত্ব ও অত্যাচারের ইতি ঘটিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের দীর্ঘ সংগ্রামে আমাদের পূর্ব-পুরুষদের ঐ সিদ্ধান্ত ছিল যথোচিত এবং দূরদৃষ্টি সম্পন্ন। সে সময়ে ভারতের সাথে মিশে গেলে ১৯৭১ সনে স্বাধীন বাংলাদেশ কখনই বিশ্বমানচিত্রে আবির্ভূত হতো না। পাকিস্তানী শাসকদের শোষণ ও প্রভু-সুলভ আচরণ থেকে মাত্র ২৩ বছরের মাথায় সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে এসেছি। হৃদয়ঙ্গম করা অতি সহজ যে, যে জাতি হিন্দু কর্তৃত্ব ও শোষণ থেকে মুক্তি পেতে পাকিস্তান তৈরী করেছিল এবং পুনরায় যুদ্ধের মাধ্যমে সে পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে স্বাধীন স্বদেশ গড়েছে তারা আর কখনোই হিন্দু কর্তৃত্ব মেনে নিয়ে ভারতের অংশে পরিণত হতে রাজী হবে না। তা'ছাড়া বাংলাদেশীরা গভীরভাবে ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি ভারত সরকার ও ভারতীয় হিন্দুদের দুর্ব্যবহার, বৈষম্য, দাঙ্গা ও নাজেহাল হবার ঘটনাগুলো প্রত্যক্ষ করছে তারা কেমন অসহায় ও অমানবিক নিরাপত্তাহীন জীবন যাপন করছে। বনেদি ধনাঢ্য মুসলিম পরিবারগুলা ক্রমাগত বঞ্চনা, বৈষম্য, দাঙ্গা-হাঙ্গামার মুখে নিঃস্ব হয়ে গেছে। তারা এখন মুটে-মজুর, রাজমিস্ত্রী, রিক্সা চালক, দর্জি, ক্ষুদে দোকানী, একেবারে সৌভাগ্যবান হলে প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক সরকারী স্বীকৃতি অনুযায়ী পশ্চিম বাংলার মোট জনসংখ্যার ২৪ শতাংশ (বেসরকারী মতে ৩০ শতাংশের বেশী) মুসলমান। অথচ সরকারী চাকরিতে মুসলিম প্রতিনিধিত্ব এক শতাংশের নিচে। অন্য দিকে গত ৩৮ বছরে স্বাধীন বাংলাদেশের অতিসাধারণ মানুষও ভারতীয় মুসলমানদের তুলনায় কয়েক দশক এগিয়ে গেছে। বাংলাদেশের

www.pathagar.com

সাধারণ মানুষ এ বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করে। হিসেবে রাখে। সুতরাং ভারতের বাংলাদেশ দখলের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে। বাংলাদেশ দখল করলে ভারতই ভেঙ্গে যাবে। বাংলাদেশ জন্য অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা কিংবা আগ্রাসন ভারতের জন্য অবশ্যই একদিন বুমেরাং হয়ে দাঁড়াবে। বাংলাদেশ-বিরোধী নীতি এদেশের জনগণের মধ্যে ভারত-বিদ্বেষকেই সুদৃঢ় করবে। ভারত যে বাংলাদেশের চিরশত্রু সে বাস্তবতা জনগণের মনস্তত্ত্বে আরো শক্তভাবে দানা বাঁধবে।

সুতরাং ভারতের জন্য মঙ্গলজনক উপায় হচ্ছে বাংলাদেশ-বিরোধী আগ্রাসী নীতি পরিহার করে কথায় নয়, বাস্তবে প্রকৃত মৈত্রী ও সহযোগিতামূলক পন্থা অনুসরণ করা। বাংলাদেশ-বিরোধী প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য চক্রান্ত অথবা সংঘাত কিংবা আগ্রাসী নীতি ভারতের স্বার্থ তথা অস্তিত্বের জন্য প্রকিকূল ও হয়ে দাঁড়াবে। তথাকথিত 'অখন্ড ভারত' প্রতিষ্ঠার অলীক স্বপ্ন পরিহার করে 'বাঁচ এবং বাঁচতে দাও' তথা সহাবস্থানের নীতি অনুসরণই ভারতের জন্য অধিক কল্যাণকর হতে পারে।

ভারতের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাংলাদেশী নীতি-নির্ধারকদেরকে আরো কৌশলী, সাবধানী, বিচক্ষণ ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হতে হবে। '১৯৭১ সনে সাহায্য করেছে' এমন পুঁজি ব্যবহার করে আমাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের ওপর হাত বাড়ানোর ভারতীয় প্রবণতা রুখতে হবে। আমাদের নীতি-নির্ধারকদের কেবল কথায় নয়, কাজে এবং বাস্তবে আরো স্বদেশী এবং জনমুখী হতে হবে। তাদের অনেকেই ভারতপন্থী, পাকিস্তানপন্থী কিংবা আমেরিকাপন্থী হিসেবে চিহ্নিত। এ ধরনের অভিযোগ কেবল তাদের জন্যই অপমান ও দুর্ভাগ্যজনক নয়, বরং দেশ ও জাতির জন্য আত্মহত্যা বিশেষ। এ ধরনের লেজুড়বৃত্তিমূলক সম্পর্কের কারণে কোন কোন শক্তির কাছে আমাদের কৌশলগত দীর্ঘমেয়াদী জাতীয় স্বার্থ বিকিয়ে দিতে হচ্ছে।

পিলখানা হত্যাকান্ড সম্পর্কিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে পরোক্ষভাবে এমন ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, সরকার যেন কোন কিছু লুকাতে চাইছে, যে প্রেক্ষিতে তদন্ত কমিটিগুলো আরো তদন্ত চালানোর জন্য সরকারকে পরামর্শ দিয়েছে। দুটি তদন্ত কমিটি সরকারকে যে বার্তা দিয়েছে, সেটা সরকারকে অনুধাবন করতে হবে। আমাদের নীতি-নির্ধারকরা বহির্শক্তির লেজুড় হলে তারা মনস্তাত্ত্বিকভাবে তাদের প্রতি অনুগত ও দুর্বল থাকবেন বিধায় বন্ধুরূপী

www.pathagar.com

শত্রুদের বিরুদ্ধে দেশের স্বার্থ ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যথাযথ ও দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হবেন। আমাদের আসল শত্রু কে তা নির্ধারণ ও চিহ্নিত করে তাকে মোকাবেলা করতে নির্ভয়ে কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

পিলখানা হত্যাকান্ড আমাদের নীতি-নির্ধারকদের জন্য একটি মহাশিক্ষা রেখে গেছে। আমাদের শত্রুপক্ষ আমাদের স্বার্থ ও অস্তিত্বে আঘাত হানার জন্য মরণাঘাত হানতে কতদূরে যেতে পারে সে বাস্তবতা নীতি-নির্ধারকদের অনুধাবন করতে হবে। যে সব ভুল-ভ্রান্তি ও ব্যর্থতার সুযোগ নিয়ে আমাদের শত্রুরা এতো ক্ষতি করে গেল, সেগুলো শুধরে নিতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে তারা অন্য কোন ক্ষেত্রে এমন নারকীয় কান্ড ঘটাতে না পারে। তাদেরকে জাতীয় ঐক্যমত্য ও একতা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তাদের ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক ভিন্নতা ও সংঘাত এবং বৈরিতা পরিহার করতে হবে, যেন আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে শক্তভাবে যেকোন প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারি। সর্বোপরি, তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্দ্ধে জাতীয় স্বার্থকে স্থান দিতে হবে।

কেবলমাত্র বিডিআর নয়, দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী অন্যান্য বাহিনী এবং গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের সমস্যাদি দূরীভূতকরণে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আশু পদক্ষেপ নিতে হবে। পিলখানার মতো আর কোন বিয়োগান্তক ঘটনার পুনরাবৃত্তির সুযোগ দেয়া যাবে না। আমাদেরকে মেনে নিতে হবে, বিডিআর'এর আরো জনশক্তি, উন্নতর সরঞ্জাম, প্রশিক্ষণ ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি সময়ের দাবী। তাদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সম্মানজনক ও গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। সাথে সাথে বিডিআর জোয়ানদেরকেও সীমান্ত অঞ্চলে সংঘঠিত সব ধরনের অসাধু অপকর্ম ও অপরাধ থেকে মুক্ত থাকতে হবে। তাদেরকে অপকর্মের মাধ্যমে প্রাপ্ত ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে জাতীয় স্বার্থকে স্থান দিতে হবে। কোন অবস্থাতেই ভারতীয় বিএসএফ কিংবা নাগরিক অথবা গোয়েন্দা সংস্থা বা চোরাচালানীদের সাথে সখ্যতা গড়ে তোলা তাদের জন্য গ্রহণযোগ্য কিংবা শোভনীয় হবে না। বিডিআর'এ ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার 'চর'রা যাতে কোনভাবেই প্রভাব ফেলতে না পারে, সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে। আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনীর সব শাখাকেই শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য গড়ে তোলা হয়েছে, তারাই (শত্রুপক্ষ) পিলখানায় সেনা কর্মকর্তাদের খুন করেছে। পিলখানায় ঐ হত্যাকান্ড ছিল বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পরিচালিত অঘোষিত যুদ্ধ। বিডিআর ও

www.pathagar.com

সেনাবাহিনী একই অপশক্তির শিকার, যা উদ্দেশ্যেমূলকভাবে বিডিআর'কে সেনাবাহিনীর বিপক্ষে লেলিয়ে দিয়েছে।

পিলখানায় সংঘঠিত হত্যাকান্ডের স্মৃতি ও ক্ষতচিহ্ন সহজে মুছে ফেলার নয়। আরো রক্তপাত বা শোক বহনের আর কোন স্থান আমাদের হৃদয়ে নেই। তথাপি আমাদের স্মৃতিকে সজীব রেখে আমাদের নতুন উদ্যমে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। তদন্ত কমিটির উদ্ঘাটিত তথ্য ও পরামর্শের জন্য সময় নষ্ট না করে অনতিবিলম্বে সংশোধন ও প্রতিষেধকমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কেননা কোন কোন ক্ষেত্রে এমন ব্যাপক দুর্বলতা তথা ফাঁক রয়েছে, যার ত্বরিত সংশোধন জরুরী।[১]

সরকারকে সর্তক থাকতে হবে যাতে পিলখানা হত্যাকান্ডের জন্য কোন নিরাপরাধ বিডিআর জোয়ান অযথা হেনস্তা কিংবা শাস্তির শিকার না হয়। অন্যদিকে এই হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত কোন স্বদেশী কিংবা তাদের বিদেশী মদদদাতাদের স্থানীয় 'চর' কোনভাবে চিহ্নিত না হওয়া এবং শাস্তির হাত থেকে রেহাই না পায়। যথাযথ অপরাধীদের চিহ্নিতকরণ ও শাস্তি প্রদানে কোন ধরনের ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব বা সম্পর্ক, পক্ষপাতিত্ব ও স্বজনপ্রীতি কিংবা শত্রুতা ও ঈর্ষা যেন প্রশ্রয় না পায়। সরকারের ন্যায়-পরায়ণতা ও স্বচ্ছতা প্রমাণার্থে পিলখানা হত্যাকান্ডের প্রকৃত হোতা ও দোষীদের চিহ্নিত করতে অনিতবিলম্বে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ সামরিক ও বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করা উচিত, যাতে কমপক্ষে দেশের নীতি-নির্ধারকরা পিলখানা হত্যাকান্ডের স্বদেশী-বিদেশী রূপকারকদের জানতে ও চিনতে পারে।

বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করতে হবে। তাকে মানে রাখতে হবে কেন বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমান যে পাকিস্তানের জন্য ব্যক্তিগতভাবে আন্দোলন করেছিলেন সে দেশ ভেঙ্গে দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। তাকে অনুধাবন করতে হবে শেখ মুজিব এবং লাখ লাখ শহীদদের আত্মত্যাগ ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি বাংলাদেশ তার পৃথক স্বাতন্ত্র্য, সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা হারায়। তাঁকে বুঝতে হবে আমাদের দেশ ভারতের সাথে মিশে গেলে শেখ মুজিব এবং আমাদের সবার

---

[১] Brig. Gen, Shahedul Anam Khan, Forum --- a monthly publication of 'The Daily Star', Dhaka, April 2009.

www.pathagar.com

অবস্থান এবং আমাদের অনাগত সন্তানদের অবস্থান কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। নামমাত্র স্বাধীন থেকে পতাকা-সর্বস্ব দেশে পরিণত হবার জন্য আমরা পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে আসিনি। ভারতের বাংলাদেশ-বিরোধী প্রকাশ্য ও গোপন তৎপরতা ও চক্রান্ত এমন অশনি সংকেত দিচ্ছে যে, ভারত যে কোন মূল্যে জোর জবরদস্তিমূলকভাবে বাংলাদেশকে তার অঙ্গীভূত করতে চায়। এ কারণে শেখ হাসিনা সরকারকে ভারতের সাথে সম্পর্ক নির্ণয়ে অত্যন্ত সাবধানী পদক্ষেপ নিতে হবে। আমাদের উদারতা, অদূরদর্শিতা, ব্যর্থতা ও ভারতমুখী নীতির ফলে ইতোমধ্যে যে ক্ষতি হয়েছে সেখানে থেকে দেশ ও জাতিকে উদ্ধার করতে হবে। বিপুল সংখ্যাধিক্যে ক্ষমতা গ্রহণের মাধ্যমে দেশ উদ্ধারের ঐতিহাসিক দায়িত্ব শেখ হাসিনার ওপরই বর্তিয়েছে। অন্যকোন সরকার ভারতের নখর-দন্ত তথা খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইলে তাকে পাকিস্তানপন্থী এবং স্বাধীনতা-বিরোধী শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। সুতরাং শেখ হাসিনাকেই বাংলাদেশকে ভারতের খপ্পর থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব-বিরোধী ভারতের অমূলক প্রভাব থেকে দেশের অস্তিত্ব ও দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থরক্ষার জন্য বেরিয়ে আসার পদক্ষেপ নিতে হবে। কোন দেশের স্বাধীনতা সরকার, এমনকি পৃথক ভূখন্ড কিংবা পতাকার মধ্যেই সীমিত নয়। এর জন্য প্রয়োজন কার্যকর সার্বভৌমত্ব। সার্বভৌমত্ব বলতে অন্যকোন দেশের নির্দেশত কিংবা পরামর্শকৃত রোডম্যাপের অনুসরণ বুঝায়না। সার্বভৌমত্ব অর্থ হলো সব ধরনের বৈদেশিক প্রভাব, হস্তক্ষেপ, ভীতি ও অহেতুক নির্দেশ হতে মুক্ত থেকে স্বাধীন থাকা। এ ধরনের নীতি অনুসরণ করলেই আমাদের জাতীয় স্বার্থ, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নিরাপদ ও মজবুত হবে। শেখ হাসিনা এ বাস্তবতা অনুধাবন করে তদানুযায়ী নীতি গ্রহণ ও অনুসরণ করলেই দেশ ও জাতি সুরক্ষিত থাকবে।

স্বদেশে বিদেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ শেখ হাসিনা ও তার দল আওয়ামী লীগকে ভারতমুখী বলে মনে করে। ভারতীয় নীতি নির্ধারক এবং সংবাদ মাধ্যমও অনেকটা ইচ্ছাকৃতভাবে কথায় ও কাজে ইঙ্গিত দেয় যে, আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনা ভারতের বিশ্বস্ত মিত্র। এ বদনাম মোচনের দায়িত্ব শেখ হাসিনার। শেখ হাসিনা ব্যতীত অন্য কেউ এ বদনাম গোছাতে পারবেনা। ভারতের সাথে তাকে সাহস নিয়ে বোঝাপড়া করতে হবে। ২০০৮ সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রচারাভিযানের সময় শেখ হাসিনা তাকে আরো

www.pathagar.com

একবার প্রধানমন্ত্রী হবার সুযোগদানের জন্য জনগণকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। জনগণ তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় তাকে ক্ষমতায় পাঠিয়েছে। জনমনে প্রশ্ন ছিল শেখ হাসিনা কি তার ব্যক্তি কিংবা দলীয় স্বার্থেই ক্ষমতায় আসতে চেয়েছিলেন, নাকি বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে আরো শক্তিশালী করে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে বিদেশী শক্তির গোলাম হবার চক্রান্ত ব্যর্থ করে ইতিহাসে অমর হবার ইচ্ছে পোষণ করেন। বাংলাদেশের কৌশলগত ও অর্থনৈতিক স্বার্থ সুরক্ষিত রেখে আমাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে ভারতীয় ছোবল হতে মুক্ত রেখে শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করলে শেখ হাসিনা ইতিহাসে অমর আসনে অধিষ্ঠিত হবেন। তিনি ব্যর্থ হলে বাংলাদেশ তার কার্যকর স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব হারাবে, যা বাংলাদেশের জনগণের স্বপ্ন ও আশা-আখাঙ্খার পরিপন্থী। আর এর দায়ভার শেখ হাসিনাদেরকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বহন করতে হবে।*

www.pathagar.com

www.pathagar.com

উপসংহার

ভাগ্যের নির্মম পরিহাস এ যে, বিভিন্ন ধরনের সম্পদে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ উদ্ধত আগ্রাসী ভারতের একান্ত প্রতিবেশী। বিচ্ছিন্নতাবাদী ও মাওবাদী যুদ্ধ; বর্ণ ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা; দুর্বল অর্থনীতি এবং ভঙ্গুর সমাজ ব্যবস্থা সত্ত্বেও ভারত নিজেকে তথাকথিত পরাশক্তি হিসেবে জাহির করতে আদাজল খেয়ে নেমেছে। এ মর্যাদা অর্জনের উদ্দেশ্যে ভারত উন্মত্তের মতো তার প্রতিবেশী দেশসমূহের ওপর আধিপত্যবাদী থাবা বিস্তারের চেষ্টায় তাদেরকে নড়বড়ে অস্থিতিশীল ও বিবাদ-বিস্মবাদ-কবলিত অবস্থার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বর্তমানে বিশ্বে ভারত ছাড়া আর কোন দেশ নেই, যে তার প্রতিবেশী স্বাধীন দেশসমূহকে দখল কিংবা পদানত করতে চায়। এ ধরনের তস্করজনোচিত চক্রান্ত থেকেই পিলখানা হত্যাকান্ডের নীল-নকশা তৈরী হয়েছে।

পিলখানায় সংঘঠিত হত্যাকান্ড ছিল বাংলাদেশকে ভারতভূক্ত করার দীর্ঘমেয়াদী চক্রান্তের অংশ বিশেষ। যেমনটি ভারত ঘটিয়েছিল সিকিমের ক্ষেত্রে। কেমন কপটতা, প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে সিকিম ভারতভূক্ত হয়েছিল সে দু:খজনক ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণী আমি এখানে তুলে ধরতে চাই।

৭,১১০ বর্গকিলোমিটার আয়তন-বিশিষ্ট ক্ষুদ্র সিকিমকে ভারত-ভূক্ত করার উদ্দেশ্যে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ বহুদিন ধরে সিকিম কংগ্রেসের কর্ণধার লেন্দ্রুপ দর্জিসহ প্রায় সব নেতা-কর্মীকে অর্থায়নের মাধ্যমে লালন করে। বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকের প্রথম দিকে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলো সিকিম কংগ্রেসকে ব্যবহার করে সিকিমের রাজার (যার উপাধি 'চৌগিয়াল') বিরুদ্ধে গণতন্ত্রে নামে গণআন্দোলন শুরু করে। অন্য দিকে ভারত আইন-শৃংখলা, সর্বোপরি, রাজা ও রাজতন্ত্রকে রক্ষার উদ্দেশ্যে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে সিকিমে প্রবেশের অনুমতি দিতে রাজাকে বাধ্য করে। কিন্তু গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নামে রাজতন্ত্রবিরোধী আন্দোলন দমনে ভারতীয় সেনাবাহিনী মূলতঃ কোন ভূমিকাই রাখেনি। কেননা ঐ আন্দোলনের মূল প্রেরণাদায়ক ছিল ভারত এবং এর মূল লক্ষ্য ছিল সিকিমের ভারতভূক্তি। ভারতের চাপে ও পরামর্শে চৌগিয়াল শেষ পর্যন্ত সিকিমের গণতন্ত্রায়নে সম্মত হলেন। একটি লোক দেখানে পাতানো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ৩২ আসন-বিশিষ্ট সিকিম আইন পরিষদের সবকটি আসনই সিকিম কংগ্রেস লাভ করে।

www.pathagar.com

লেন্দ্রুপ দর্জি সিকিমের নির্বাচিত প্রথম প্রধানমন্ত্রী হয়। আইন পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে চৌগিয়ালকে ১৯৭৪ সনে সিংহাসনচ্যুত করে। পরবর্তীতে একটি প্রস্তাবের মাধ্যমে সিকিম আইন সভা সিকিমের ভারতভূক্তির পক্ষ্যে সিদ্ধান্ত নেয়। ভারত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে বোকা বানিয়ে সিকিমের ভারতভূক্তিকে জায়েজ করার উদ্দেশ্যে একটি প্রতারণামূলক ভূয়া গণভোটের ব্যবস্থা করে, যা ব্যাপকভাবে সিকিমের ভারতভূক্তির অনুকূলে রায় দেয়া হয় বলে ভারতের পক্ষ থেকে ঘোষণা দেয়া হয়। এভাবে ভারত ১৯৭৫ সনে সিকিমকে অধিভূক্ত করে নেয়।

ভারত বাংলাদেশে একই ধরনের নাটক অন্য আঙ্গিকে মঞ্চস্থ করতে চায়। দুর্ভাগ্যবশতঃ বাংলাদেশের সর্বস্তরে এমন একশ্রেণীর অদূরদর্শি মানুষ রয়েছে, যারা দাবী করে যে, ভারত কখনই সমস্যা-সংকুল বাংলাদেশ দখল করবে না। দু:খের সাথে বলতে হচ্ছে তারা সম্ভবতঃ ইতিহাস এবং বাস্তবতা সম্পর্কে সজাগ নন। সিকিম কখনো কোনভাবেই ভারতের জন্য ভীতিকর ছিলনা। এই ক্ষুদ্র দেশটির সবকিছুই ভারত নিয়ন্ত্রণ করত। এতদসত্বেও এ পাথর-সর্বস্ব দেশটি গিলে ফেলতে ভারত দ্বিধা করেনি। সে ক্ষেত্রে ভারত কিভাবে বাংলাদেশকে পৃথক স্বত্ত্বা নিয়ে টিকে থাকতে দিবে, যেখানে ভারতের স্থপতিরা বারংবার এ অঞ্চলের ভারতভূক্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন।

১৯৭১ সনে বাংলাদেশকে ভারতের আশ্রিত রাজ্যে পরিণত করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পর ভারত থেকে বাংলাদেশে সে নাটক অনুষ্ঠানের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

'বাংলাদেশ কোনভাবেই ভারতকে আঘাত করছে না। তথাপি বাংলাদেশের সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা অর্জনের প্রতিটি প্রচেষ্টাকে ভারত বিভিন্নভাবে বাধাগ্রস্থ করে চলেছে। ভারতের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ যেসব ক্ষেত্রে বিপর্যয় মোকাবেলা করছে তাদের অন্যতম হলো: পানি অবরোধ, পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করার চক্রান্ত. গুপ্ত হত্যা, অগ্নিসংযোগ ও ভাঙ্গচুর, অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা, অভ্যুত্থান ও পাল্টা-অভ্যুত্থান, শিল্পাঞ্চল ও শিক্ষাঙ্গনে অস্থিতিশীলতা, সীমান্ত হামলা, চোরাচালান প্রভৃতি। এসব কিছুই ঘটানো হচ্ছে বাংলাদেশকে আশ্রিত রাজ্যে পরিণত করার উদ্দেশ্যে। পিলখানা হত্যাকান্ড সে লক্ষার্জনে সর্বশেষ দুষ্কর্ম। এখন ভারত বলছে শেখ হাসিনাকে বিব্রত করলে ভারত চুপচাপ বসে থাকবেনা। বরং শেখ হাসিনাকে রক্ষার অজুহাতে ভারতীয়

www.pathagar.com

সৈন্য বাংলাদেশে প্রবেশ করবে। এ ধরনের ঘোষণা শেখ হাসিনার প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য কিংবা ভালবাসা থেকে আসেনি, বরং ইহা বাংলাদেশে ভারতীয় সৈন্য মোতায়োন করে এক সময়ে কুক্ষিগত করার চক্রান্ত থেকেই এসেছে।

এ লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য ভারত বাংলাদেশের সর্বক্ষেত্রে কৌশলী চক্রান্ত অনুসরণ করে চলেছে। অসহনীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করে বাংলাদেশকে নামমাত্র স্বাধীন রাখার মধ্যেই ভারতীয় চক্রান্ত সীমিত নয়। ১৯৭২ হতে ভারত বাংলাদেশী জনগণের মন ও মনস্তত্বকে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মাধ্যমে ভারতীয়করণের উদ্দেশ্যে কোটি কোটি ডলার ছাড়ছে। বাংলাদেশের শিল্পকলা, সাহিত্য, সংগীত তথা সাংস্কৃতিক অঙ্গনে কথিত বাঙালী সংস্কৃতির আড়ালে হিন্দুয়ানী সংস্কৃতির বেপরোয়া চর্চার পেছনে ভারতীয় অর্থায়ন মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। এ ছাড়া তথাকথিত আধুনকি শিক্ষা কার্যক্রম, বিশেষতঃ সামাজিক বিজ্ঞান, এমনভাবে প্রস্তুত করা হচ্ছে যাতে ইসলামী শিক্ষা ও মূল্যাবোধকে পাশ কাটিয়ে হিন্দু বৈদিক দর্শন-কেন্দ্রিক শিক্ষা প্রাধান্য পাচ্ছে। এ ছাড়া বাংলাদেশে মাদকদব্য এমনভাবে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে যা 'র ' কর্তৃক সৃষ্ট শিক্ষাঙ্গনে বিদ্যমান সন্ত্রাসের চেয়েও ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করছে। সবচেয়ে ভীতিকর বাস্তবতা হচ্ছে সাম্প্রতিকতম পিলখানা হত্যাকান্ডের মাধ্যমে 'র' দেখিয়ে দিয়েছে ভারতীর 'চর'রা বাংলাদেশ সমাজের কত ভেতরে ঢুকেছে এবং এদেশের কোন প্রতিষ্ঠানই 'র' চর মুক্ত নয়।

ভারত উদ্দেশ্যমূলকভাবে পিলখানা বিপর্যয় ঘটিয়েছে। সংগৃহীত নির্ভরযোগ্য তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় বিডিআর'এ প্রেষণে নিযুক্ত সেনা কর্মকর্তাদের নিধনের জন্য ভারত তার তথাকথিত 'ব্ল্যাক ক্যাট' খুনীদের বাংলাদেশে পাঠায়। পিলখানা হত্যাকান্ড ছিল বাংলাদেশ এবং এর স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বিরোধী ক্রমাগত চক্রান্তের অংশ বিশেষ। এ বিপর্যয়ের ফলে বাংলাদেশ সামরিকভাবে দুর্বল হয়ে যায় এবং সীমান্ত দিনে পর দিন অরক্ষিত ও নজরদারিবিহীন থাকে। বিডিআর ও সেনাবাহিনীর তেজস্বিতা ও মনোবল মারাত্নকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এটা বলা কঠিন পিলখানা হত্যাকান্ডের কারণে সৃষ্ট গভীর মনস্তাত্ত্বিক ক্ষত কবে দূরীভূত হবে। এমন আশংকা সৃষ্টি হয়েছে যে, পিলখানা বিপর্যয়ের পর সেনাবাহিনী ও বিডিআর আমাদের প্রতিপক্ষকে কার্যকরভাবে মোকাবেলা করতে পারবে কি? আর প্রশ্ন উঠেছে বিডিআর ও সেনাবাহিনীর মধ্যে সৃষ্ট মনস্তাত্ত্বিক দূরত্ব আদৌ বিলীন হবে কি?

www.pathagar.com

পিলখানা বিপর্যয়ের নেতিবাচক পরিণাম সম্পর্কে ভারত আগে থেকেই ওয়াকিবহাল ছিল। এ কারণেই ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী কালবিলম্ব না করে একগুচ্ছ অনভিপ্রেত ও অনাকাঙ্খিত স্বেচ্ছাপ্রণোদিত প্রস্তাব উপস্থাপন করে। এর মধ্যে জঘন্যতম প্রস্তাব ছিল তথাকথিত শান্তি মিশনের নামে বাংলাদেশে ভারতীয় সৈন্য পাঠানো। ভারতের ধারণা ছিল সেনা কর্মকর্তাদের হত্যা করার পর বাংলাদেশে হানাহানি শুরু হলে, ভারতীয় সেনাবাহিনীকে আমন্ত্রণ না জানিয়ে গত্যন্তর থাকবেনা। কিন্তু ভারত হিসেবে কষতে ভুল করেছে। যে অজুহাতের আড়ালেই বাংলাদেশের মাটিতে ভারতীয় সৈন্য আসুক না কেন তাদের উপস্থিতিকে এদেশের জনগণ কোন দিনই মেনে নেবেনা। এবং এ ধরনের যেকোন প্রচেষ্টা (এমনকি ভারতপন্থী কোন পুতুল সরকারের আমন্ত্রণ সত্বেও) অত্যন্ত শক্তভাবে প্রতিহত করা হবে। পাকিস্তানীদের চেয়ে ভারতীয় সৈন্যদের বাংলাদেশে আরো শত গুণ বেশী গণরোষের মুখে পড়তে হবে, যে ভয়ঙ্কর ও দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধে ভারত টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

কোটি কোটি ডলার ব্যয়ে বাংলাদেশে 'চর' পোষণ করে অন্তর্ঘাতমূলক সন্ত্রাসী তৎপরতার তথা ভারতের অসৌজন্যমূলক আগ্রাসী উচ্চাভিলাষ প্রতিহত করতে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। পিলখানায় রক্তাক্ত বিপর্যয়ের কারণে সৃষ্ট ক্ষত ও ভুল বুঝাবুঝি দূরীকরণে অনতিবিলম্বে জরুরী পদক্ষেপ নিতে হবে। আমার একান্ত আরজ বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের সার্বভৌম অস্তিত্ববিরোধী সর্ব ধরনের চক্রান্তের বিরুদ্ধে পূর্ণাঙ্গ তথ্যানুসন্ধ্যান চালিয়ে এগুলো প্রতিহত ও নির্মূলকরণে যথাযথ পদক্ষেপ নিন। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক কিংবা পেশাজীবী সংগঠনের আবরণে দেশের স্বার্থ ও অস্তিত্ববিরোধী যে চক্রান্ত চলছে, তা এক্ষুণে নির্মূল না করলে পিলখানার চেয়ে নারকীয় ঘটনা ভারত বার বার ঘটাবে। পিলখানা হত্যাকান্ডের মূল রূপকার এবং তার বাংলাদেশী 'চর'দের চিহ্নিত করে শাস্তি প্রদানে বাহিরে চাপ ও পরামর্শ কিংবা সুপারিশমুক্ত নির্মোহ পদক্ষেপ নেয়া জরুরী। কোন ধরনের লোক দেখানো বিচার প্রহসনে পরিণত হবে। মনে রাখতে হবে, এ হত্যাকান্ড কোন ব্যক্তি বা দল বিশেষের বিরুদ্ধে নয়, বরং দেশর স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও অস্তিত্বের বিরুদ্ধে। সুতরাং এখানে আপোসের কোন সুযোগ নেই। কোন কিছুই যেন আমাদেরকে ভয় পাইয়ে না দেয়। আমাদেরকে আপন পায়ে ভর করে দাঁড়াতেই হবে। বাইরের পরামর্শ কিংবা চাপের কাছে নতি স্বীকার না

www.pathagar.com

করে সহযোগিতা নেয়ার আগে সাহায্যদাতার অদৃশ্য লক্ষ্য সম্পর্কে আমাদের সচেতন ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হতে হবে। তাছাড়া সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক দেশসমূহের অতীত আচরণ ও উদ্দেশ্যে সম্পর্কে আমাদের সম্যক ধারণা থাকতে হবে। দেখতে হবে ঐসব দেশের সহযোগিতার মধ্যে আধিপত্যমূলক কোন কুমতলব রয়েছে কিনা, যা আমাদের স্বার্থ ও অস্তিত্বের জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে।

বিডিআর পুনর্গঠনের প্রস্তাব বিবেচনার কোন যোগ্যতাই রাখেনা। এ প্রস্তাব সরাসরি এবং প্রকাশ্যে অগ্রাহ্য ও প্রত্যাখান করা উচিত। এই প্রস্তাবের মাধ্যমে ভারতের কুৎসিত চেহারা আরো বিকটভাবে উন্মোচিত হলো। বিডিআর'কে বিএসএফ'এর ছায়াবাহিনীতে পরিণত করার উদ্দেশ্যেই ভারত পিলখানা হত্যাকান্ড ঘটিয়ে আবার বিডিআর পুনর্গঠনের নির্লজ্জ প্রস্তাব দিয়েছে। এতে ভারতের পরস্পর বিরোধী দ্বিমুখী নির্লজ্জ চেহারা উৎকটভাবে ধরা পড়েছে, যেন সে সাপ হয়ে দংশন করে ওঝা হয়ে সাপের বিষ নামাতে চায়।

তবে এ বিপর্যয় দেখিয়ে দিয়েছে আমাদের নীতি-নির্ধারকরা পরিস্থিতি মোকাবেলায় কেমন অপরিপক্ক এবং দৌদল্যমান। তারা সেনা কর্মকর্তাদের জীবন রক্ষায় কিংবা পরিস্থিতি মোকাবেলায় সর্ববিবেচনায় সফল হয়েছেন এমন দাবী করার কোন সুযোগ ও যৌক্তিকতা তাদের থলিতে নেই। তাদের দুর্বলতা ও অদুরদর্শিতা বিকটভাবে প্রমাণিত হয় যখন তারা সীমান্তে প্রতিদিন বিএসএফ'র মোকাবেলাকারী বিডিআর'এর পুনর্গঠনে ভারতীয় প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছেন। এ কথা নিরেট নির্বোধরাও বুঝে যে, একটি আগ্রাসী দেশের সীমান্ত রক্ষীরা কি কখনো তাদের প্রতিপক্ষকে তাদের মতো যোগ্যতাসম্পন্ন করে তাদের সাথে যুদ্ধ করার সুযোগ করে দেবে। ভারত কিংবা বিএসএফ'এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিডিআর নামমাত্র বাহিনীতে পরিণত হবে, যারা বাংলাদেশ থেকে বেতন ও অন্যান্য সুবিধা ভোগ করে ভারতের হয়ে কাজ করবে। ভারত মূলতঃ বাংলাদেশর সাথে কোন সীমান্ত রাখতে চায়না।

আমাদের অনাগত বংশধরদের জন্য একটি সমৃদ্ধ স্থিতিশীল নিরাপদ স্বদেশ রেখে যাবার জন্য আমাদের ইস্পাত-কঠিন ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। পিলখানা হত্যাকান্ড থেকে আমাদের সবারই বিশেষতঃ নীতি-নির্ধারকদের, শিক্ষা নেয়া উচিত। দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে কোন ধরনের আপোষ না করে

www.pathagar.com

আকস্মিক যেকোন ধরনের আপদ মোকবেলা করার মত সাহস অর্জন এবং উপায় উদ্ভাবনে আমাদেরকে এক্ষুণি উদ্যেগ নিতে হবে। ভীতসন্তস্ত্র হয়ে কিংবা আমাদের শত্রুদের দিকে ঝুঁকে তাদের করুণা প্রার্থনা না করে পরিস্থিতি মোকাবেলায় যোগ্যতা, ধৈর্য্য ও সাহস অর্জন করতে হবে। স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে ক্ষতিগ্রস্থ না করেই শত্রুপক্ষের প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য চক্রান্ত প্রতিহত করতে হবে।

ভারতের অংশ হবার জন্য আমরা পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশকে স্বাধীন করেনি। যার নেতৃত্বেই দেশ স্বাধীন হোক না কেন এদেশ রক্ষার দায়িত্ব সবার। আমরা এমন সমৃদ্ধ স্বদেশ গড়তে চাই, যা সব ধরনের বিদেশী হস্তক্ষেপ ভীতি ও খবরদারিমুক্ত থাকবে। প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য অগণিত চক্রান্ত সত্বেও আমরা ধীরে ধীরে আমাদের সমৃদ্ধি অর্জন ও স্বপ্ন বাস্তবায়নে এগিয়ে যাচ্ছি। ১৯৭২-৭৩ আর্থিক বর্ষে আমাদের বাজেট ছিল ৭ কোটি ৫২ লাখ টাকা। আর ২০০৯-১০ সনে এ বাজেট এক লাখ ১৩ হাজার ৮১৩ কোটি টাকায় এসে পৌঁছেছে। ঢাকা-চট্টগ্রামসহ এমনকি মফ:স্বল শহরে গাড়ীর বহর, সুউচ্চ দালান, গ্রামাঞ্চলে টিনের ঘর, পাকা সড়ক, বড় বড় সেতু, স্বাচ্ছন্দ্য জীবন সবই স্বাধীনতার ফসল । ভারতের অব্যাহত হাজারো চক্রান্ত এবং চাপিয়ে দেয়া বিপর্যয় না থাকলে বাংলাদেশ এতোদিন মালয়েশিয়া-সিঙ্গাপুরকে ছাড়িয়ে যেত। আন্তর্জাতিক নদীতে বাঁধ দিয়ে শীতকালে পানি আটকে রেখে আবার বর্ষা মওসুমে পানি জমিয়ে রেখে হঠাৎ পানি ছেড়ে বন্যা সৃষ্টি করে প্রতি বছর ভারত বাংলাদেশের ফসল, ঘরবাড়ী, সড়ক, সেতু, কলকারখানার অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করে হাজার হাজার কোটি ডলার মূল্যের সম্পদ ধবংস করছে। অন্যদিকে পাট, তৈরী পোশাক, চিংড়ি, চা, জনশক্তি প্রভৃতি রপ্তানীকারক খাতের আন্তর্জাতিক বাজার নানা ধবংসাত্নক তৎপরতার মাধ্যমে নষ্ট করে ভারত সেগুলো দখল করে বাংলাদেশের সমৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্থ করছে।

সুতরাং অপশক্তির মোকাবেলায় সবার ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস অপরিহার্য। এ অপশক্তি মুজিব, জিয়া, এরশাদ, খালেদা, হাসিনা কাউকে শান্তিতে দেশ শাসন করতে দেয়নি। এ অপশক্তি আমাদের পারস্পারিক রেষারেষিকে কাজে লাগিয়ে দেশকে পেছনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। ক্ষমতার জন্য আমাদের মোহ থাকতে পারে, পারস্পরিক মতভেদ থাকতে পারে – কিন্তু দেশের স্বার্থ,

www.pathagar.com

স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে সবাইকে এক ও অভিন্ন ভূমিকা রাখতে হবে। এ প্রশ্নে ভিন্নতা ও বিরোধের কোন অবকাশ নেই। দেশ সবার। কোন ব্যক্তি বা দলের একক সম্পত্তি নয়। তাই দেশকে রক্ষার দায়িত্বও সবার। এমন মানসিকতা ও আন্তরিকতা থাকলে কোন শক্তির কোন চক্রান্ত আমাদেরকে ব্যর্থ করতে পারবেনা। আমাদেরকে আরো সাহসী সুবিবেচক দূরদর্শি স্বদেশমুখী হতে হবে। আমরা আমাদের সোনালী ভবিষ্যতে প্রবেশদ্বার ব্যক্তিগত স্বার্থ ও কোন্দল এবং বিদেশী চক্রান্তের কাছে বন্ধক রাখতে পারিনা।*

www.pathagar.com

www.pathagar.com

৪ পরিশিষ্ট

- নেহেরু'র চিঠি
- গণহত্যার কিছু ছবি

www.pathagar.com

MR NEHRU'S LETTER TO ASHRAFUDDIN AHMAD CHOWDHRY.

Mussoorie

As at: 17 York Road,
New Delhi.

23 May 1947

My dear Mr. Ashrafuddin Ahmad Chowdhry,

I am sorry for the delay in answering your letter of April 30th. I can hardly discuss the vital questions you refer to at length in a letter. I do not think we have given up any fundamental principle for which we stood. But it is true that the events that have taken place during the last nine months have made us think realistically of the problems before us. It is no good talking in terms of slogans when decisions have to be made.

The Congress has stood for the Union of India and still stands for it. But we have previously stated that we are not going to compel any part against its will. If that unfortunately leads to a division, then we accept it. But inevitably such a division must mean a division also of Bengal and Punjab. That is the only way to have a united India soon after. If we can have a united India straight-away without such division, that will, of course, be very welcome.

I do not quite understand what you mean by saying that I should direct the members of our organisation to face all eventualities in a courageous manner. Indeed I have tried to do so to the best of my ability. I might inform you that I do not spend very much time with day to day files. I am much more concerned with the present and the future of the country.

Yours sincerely,

Jawaharlal Nehru

Ashrafuddin Ahmad Chowdhry Esq.,
P.O. Suaganj,
Tippera (Bengal)

তৎকালীন ত্রিপুরা (বর্তমান কুমিল্লা) জেলা কংগ্রেস সভাপতি আশরাফ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরীকে লেখা নেহেরু'র চিঠি

www.pathagar.com

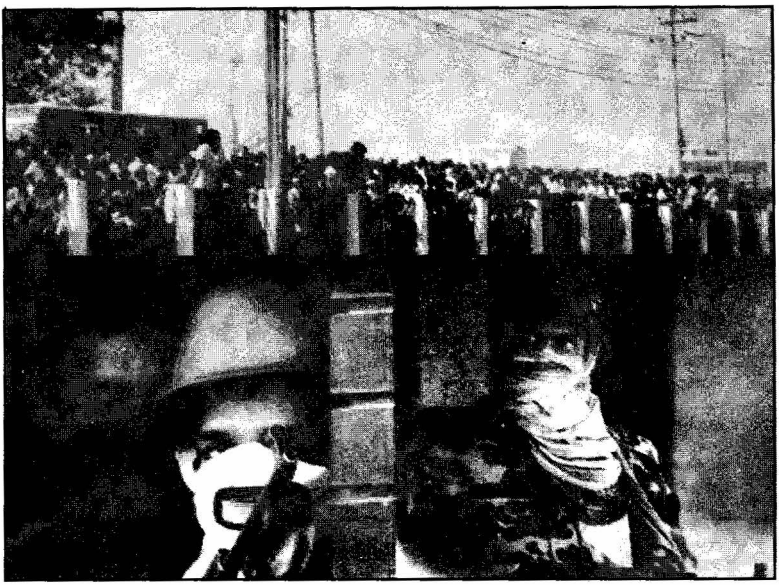

Who were they?

BDR jawans fled away leaving their official uniforms

www.pathagar.com

1. Army officers killed at Peelkhana and recovered at Kamrangirchar. 2. Their killers must be punished. 3. Dead bodies of the Army officers were being recovered from mass graves.

Body of the dead Army officers were being recovered from sewerage line.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন স্কুল ও কলেজ ম্যাগাজিন এবং দেয়াল পত্রিকায় গল্প-কবিতা লিখে যাত্রা শুরু করলেও সার্থক লেখক হিসেবে তার আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৯৭১ সনে একেবারে ২০ বছর বয়সে আসামের হাফলং-এ মুজিব বাহিনীর প্রশিক্ষণ শিবিরে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ মঞ্চ নাটক 'এক নদী রক্ত' রচনার মাধ্যমে– যা হাফলং-এ-ই মঞ্চস্থ হয়। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো ঐ নাটকে যেভাবে দেখানো হয়েছে, ঠিক সেভাবেই বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতেই দেশ স্বাধীন হয়েছে। এই সফল নাটকটির পাণ্ডুলিপি প্রশিক্ষণকেন্দ্র কর্তৃপক্ষ মুজিব বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় অধিনায়ক মরহুম শেখ ফজলুল হক মনির কাছে দেয়ার কথা থাকলেও দেশ স্বাধীন হবার পর তার কাছ থেকে তা পাওয়া যায়নি। হাফলং-এ চিঠি মারফত যোগাযোগ করা হলে প্রশিক্ষণ শিবিরের প্রশিক্ষক এবং ঐ নাটকের পরিচালক বি এম (বিমল মুখার্জী) পাণ্ডুলিপিটি তাদের কাছে নেই বলে নিশ্চিত করেছেন। এদিকে নাটকে অভিনয়কারী কলাকুশলী এবং জীবিত মুক্তিযোদ্ধা-দর্শকরা নাটকটির মুদ্রিত কপি পাওয়ার জন্য চিঠির পর চিঠি লিখতে থাকে। ঐসব চিঠির ক'টি হাফলং-এ পাঠালে বিমল মুখার্জী আবেদীনকে নাটকটি পুনর্লিখনের পরামর্শ দেন। কিন্তু যে পরিবেশ পরিস্থিতিতে যে ভাবাবেগ ও উচ্ছ্বাস নিয়ে হাফলং-এ ঐ নাটকটি লেখা হয় স্বাধীন বাংলাদেশে সেগুলো বদলে যায়। এভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধের সম্ভবতঃ প্রথম পূর্ণাঙ্গ মঞ্চ নাটকটি হারিয়ে যায়।

ঐ নাটকে আবেদীন সাংবাদিকের ভূমিকায় অভিনয় করেন। আজকে তিনি কেবল প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিকই নন, স্বীকৃত সফল গবেষকও। ১৯৭২ সনের একেবারে শুরুতে নোয়াখালী থেকে প্রকাশিত প্রখ্যাত সাংবাদিক মরহুম নাজিম উদ্দিন মানিক কর্তৃক সম্পাদিত 'দৈনিক বাংলাদেশ' এর মাধ্যমে তিনি সাংবাদিক হিসেবে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করেন। তৎকালীন গণকণ্ঠ ও সাপ্তাহিক ইত্তেহাদ-এর নোয়াখালী প্রতিনিধি মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীনের অনুসিন্ধুৎসু দুঃসাহসী ক্ষুরধার কলম পরবর্তীতে বৈশ্বিক, আঞ্চলিক বিশেষতঃ বাংলাদেশের স্বার্থ ও সার্বভৌমত্বের সাথে সম্পৃক্ত এমন কোন বিষয় নেই যেখানে প্রবেশ করেনি।

ঢাকার অনেকগুলো দৈনিক ও সাপ্তাহিকে এবং অধুনা ওয়েব সাইটে তিনি মানবাধিকার, গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতার স্বপক্ষে এবং স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব- বিরোধী সম্প্রসারণবাদী অপশক্তির মুখোশ উন্মোচন করে ইংরেজি-বাংলায় অসংখ্য গবেষণাধর্মী নিবন্ধ লিখেছেন। এছাড়া সৌদি আরব, ব্রিটেন, ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশের সংবাদপত্রেও তার নিবন্ধ স্থান পেয়েছে।

তিনি ১৯৯৫ সনে পাকিস্তানের সরকারি সংবাদ সংস্থা এপিপি'র ঢাকা প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দেন। অভিবাসী হিসেবে আমেরিকায় যাবার কারণে ২০০৮ সনে তিনি এপিপি হতে পদত্যাগ করেন। ঢাকা থেকে প্রকাশিত ও তার সম্পাদিত পাঠকপ্রিয় সাপ্তাহিকী 'একালের কথা' তার আমেরিকায় যাবার কারণে বন্ধ হয়ে যায়। দ্বিতীয় ফ্ল্যাপে দেখুন

প্রচ্ছদ চিত্রণ : আক্কাস খান

www.pathagar.com

পিলখানায় ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি (২০০৯) সংঘটিত সমসাময়িক ইতিহাসের নজিরবিহীন ভয়াবহতম হত্যাকাণ্ড বাংলাদেশের অস্তিত্ববিরোধী শক্তিই ঘটিয়েছে, যা বাংলাদেশের ভিত্তিমূলে চরম ঝাকুনি দিয়ে এর সীমান্ত পাহারা এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাপনাকে নড়বড়ে করেছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্বকে অকেজো করা। এ বিপর্যয় আপোসহীন ও অনমনীয় 'লিসা' (লন্ডন ইন্সটিটিউট অব সাউথ এশিয়া) পুরস্কারপ্রাপ্ত সাংবাদিক ও গবেষক মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীনকে যারপরনাই ব্যথিত ও আতঙ্কিত করে। আত্মতাড়িত হয়ে তিনি নিতান্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে আমাদের ইতিহাসের সর্বাধিক মর্মান্তিক একটি অধ্যায় লিপিবদ্ধকরণে উদ্যোগী হন। তিনি পিলখানার এই নিন্দনীয় ভয়াবহতম হত্যাকাণ্ডের মধ্যে আমাদের জন্মভূমির স্বাতন্ত্র্য, সীমান্ত ও মানচিত্র তুলে দেয়ার এক মহাচক্রান্ত দেখতে পান।

গ্রন্থকার তার অনুসিদ্ধৎসু দৃষ্টি, তথ্য ও যুক্তির মাধ্যমে বিডিআর সদর দফতরে অমানবিক হত্যাকাণ্ডের আড়ালে থাকা রূপকারের মুখোশ উন্মোচন করেছেন। আনুষঙ্গিক প্রমাণাদি, বাস্তব পরিস্থিতি, ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ ও ধারাবাহিক পটভূমি, ভারতীয় প্রস্তাব, উদ্ভূত পরিস্থিতি থেকে ভারতের প্রাপ্তি, বিশেষত: এ হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে ভারতের অকারণ যুদ্ধ-প্রস্তুতি প্রভৃতি বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন– ভারতই এই নারকীয় ঘটনার নেপথ্য রূপকার।

সামান্য কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এ গ্রন্থ আমাদের প্রিয় মেধাবী ও চৌকস সেনা কর্মকর্তাদের নারকীয়ভাবে খুনের ইতিবৃত্ত নথিভুক্তকরণে সময়োচিত অনন্য উদ্যোগের দলিল। এটা নিঃসন্দেহে গ্রন্থকারের অনন্য অবদান, যা অনাগতকালের গবেষক ও ঐতিহাসিকদের কাছে 'রেফারেন্স' হিসেবে সমাদৃত হবে। জনসাধারণ্যে পাঠক ছাড়াও এই গ্রন্থ বিডিআর, সেনাবাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থাসহ রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদদের মাঝে ভীষণভাবে আদৃত হবে। এ গ্রন্থ বাংলাদেশের শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সবার কাছে কিছু বার্তা পৌঁছে দেবে। এ ধরনের একটি তথ্য-সমৃদ্ধ প্রামাণ্য গ্রন্থের রচয়িতা মানবতা, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সর্বমহলের স্বীকৃতি ও প্রশংসার দাবী রাখেন।